ইতিহাস

দ্বি বার্ষিক **সেমেস্টার ভিত্তিক** স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

এম এ চতুর্থ সেমেস্টার

ঐচ্ছিক পাঠ -৪০৪

DSE-404

Rural Bengal and its Folk Tradition

সহায়ক গ্রন্থ

Directorate of Open and Distance Learning (DODL),

University of Kalyani,

Kalyani, Nadia.

বিষয় সমিতিঃ

১) শ্রী অলোক কুমার ঘোষ (প্রধান, ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়) – সভাপতি।

২) ডঃ সুতপা সেনগুপ্ত (ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)- সদস্য।

৩) অধ্যাপক অনিল কুমার সরকার (ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)-সদস্য।

৪) অধ্যাপক রূপকুমার বর্মণ (ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)- সদস্য।

৫) অধ্যাপক মনশান্ত বিশ্বাস (ইতিহাস বিভাগ, সিধু-কানহু-বিরশা বিশ্ববিদ্যালয়)-সদস্য।

৬) শ্রী সুকৃত মুখাজ্জী (চুক্তিভিত্তিক সহকারী অধ্যাপক, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)-সদস্য।

৭) শ্রীমতী পুবালি সরকার (চুক্তিভিত্তিক সহকারী অধ্যাপক, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)-সদস্য।

৮) অধিকর্তা, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়) - আহ্বায়ক।

- মুদ্রণ জুন ২০২৩ ।
- গ্রন্থটি বিভিন্ন বই ও ইন্টারনেট সূত্র থেকে তথ্য একত্র করে নির্মিত।
- প্রণেতাগণ এর মৌলিকত্ব দাবী করেন না।

Director's Note

Open and Distance Learning (ODL) systems play a threefold role- satisfying distance learners' needs of varying kinds and magnitudes, overcoming the hurdle of distance and reaching the unreached. Nevertheless, this robustness places challenges in front of the ODL systems managers, curriculum designers, Self Learning Materials (SLMs) writers, editors, production professionals and other personnel involved in them. A dedicated team of the University of Kalyani under the leadership of Hon'ble Vice-Chancellor has put its best efforts, professionally and in unison to promote Post Graduate Programmes in distance mode offered by the University of Kalyani. Developing quality printed SLMs for students under DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2020 had been our endeavour and we are happy to have achieved our goal.

Utmost care has been taken to develop the SLMs useful to the learners and to avoid errors as far as possible. Further suggestions from the learners' end would be gracefully admitted and to be appreciated.

During the academic productions of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor (Dr.) Amalendu Bhunia, Hon'ble Vice- Chancellor, University of Kalyani, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it within proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Due sincere thanks are being expressed to all the Members of PGBOS (DODL), University of Kalyani, Course Writers- who are serving subject experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have been utilized to develop these SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I would like to convey thanks to all other University dignitaries and personnel who have been involved either at a conceptual level or at the operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their concerted efforts have culminated in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyright reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials are self writing and collected from e-book, journals and websites.

Date: 24.06.2023

Director
Directorate of Open & Distance Learning
University of Kalyani,
Kalyani, Nadia,
West Bengal

DSE 404

Rural Bengal and its Folk Tradition

Block- 1: Rural landscape and Rural society

Unit-1: Rural landscape and rural society of Bengal through the ages

Unit-2: Anthropological and sociological theories of folk tradition

Unit-3: Theory of multi linear evolution of folk culture.

Block- 2: Folk customs and tradition in rural Bengal

Unit-4: Puranas and folktales

Unit-5: Folk literature

Unit-6: Folk festivals.

Block- 3: Popular folk music, dance and drama

Unit-7: Baul, Bhawaiya, Bhadu, Tusu, Jhumur

Unit-8: Manasamangal, Bolan and Leto Jhapan, Gambhira, Banbibi pala,

Unit-9: Putulnach, Alkaap and Jatra-social and religious aspects.

Block-4: Belief in magic and religion

Unit-10: Belief in magic and religion

Unit-11: The brata culture

Unit-12: Folk deities - Shitala, Manasa, Banbibi, Shashthi and Olaichandi.

Block- 5: Folk arts and crafts

Unit-13: Nakshikantha, Patchitra, Alpana and Shola

Unit-14: Clay doll, Pottery, Terracotta, Conch shell and Dokra.

Block- 6: Colonial & Post colonial impact on folk tradition and culture

Unit-15: Colonial impact on folk tradition and culture

Unit-16: Postcolonial phase and globalization - continuity and change in the rural and folk tradition of Bengal.

ACKNOWLEDGEMENT

Content	page
BLOCK 1: Rural landscape and Rural society	
BLOCK-2: Folk customs and tradition in rural Bengal	
BLOCK 3: Popular folk music, dance and drama	
BLOCK 4: Belief in magic and religion	
BLOCK 5: Folk arts and crafts	
BLOCK 6: Colonial & Post colonial impact on folk tradition and culture	

Block 1

Rural Bengal and its Folk Tradition

Unit-1: Rural landscape and rural society of Bengal through the ages

Unit-2: Anthropological and sociological theories of folk tradition

Unit-3: Theory of multi linear evolution of folk culture.

উদ্দেশ্য:

এই পর্যায়টি পাঠ করে জানতে পারবেন:

১. গ্রাম বাংলার সমাজ সম্পর্কে

২. লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন তত্ত্ব সম্পর্কে

৩. Multilinear Evolution সম্পর্কে

Unit-1: Rural landscape and rural society of Bengal through the ages

ইতিহাস ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক পরিবেশ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। তাই প্রকৃতি ও ভূগোলের সাথে ইতিহাসের একটি নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে। প্রকৃতি হচ্ছে ইতিহাসের ভিত্তি। যুগে যুগে বাংলার প্রাকৃতিক পরিবেশ সমকালীন মানুষের জীবনে গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছে। প্রকৃতি বাংলার ইতিহাসের গতিধারাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। বাংলার প্রধান প্রধান নদীগুলো গতিপথ পরিবর্তন করার ফলে বহু সমৃদ্ধ নগর-বন্দর, রাজধানী ও জনপদ নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে অথবা বিরানভূমিতে হয়েছে পরিণত। নদীর নতুন গতিধারার তীরে নতুন নতুন শহর-বন্দর গড়ে ওঠার তথ্যও কম নেই। এভাবে বাংলার ইতিহাসের গতিধারায়ও পুরনো অধ্যায়ের সমাপ্তি শেষে নতুন অধ্যায়ের সংযোজন ঘটেছে। যেমন পুন্ড্র নগর, ময়নামতি, দেবপর্বত, বিক্রমপুর ও সোনারগাঁ নগরগুলোর কথা বলা যায়। এসব নগর এক সময় গড়ে উঠেছিল এবং সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল। বাংলার একটা বিরাট অংশ এক সময় গভীর সমুদ্রে নিমজ্জিত ছিল বলে মনে করা হয়। গঙ্গা-ভাগীরথী, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্রসহ অসংখ্য নদ-নদী এদেশের বুক চিরে প্রবাহিত। এসব নদীর পলি দ্বারা গঠিত সমভূমি অঞ্চলে প্রচুর শস্য উৎপাদিত হয়। এই সমভূমি দক্ষিণ দিকে ক্রমশ ঢালু এবং সাগরের সঙ্গে ক্রমশ মিশে গেছে। সমুদ্র উপকূলবর্তী নিম্নভূমি মূলত জঙ্গলাকীর্ণ যা সুন্দরবন নামে পরিচিত। সুন্দরবন পৃথিবীর বৃহত্তম স্রোতজ বন। বাংলার ভৌগোলিক পরিচয় দিতে গিয়ে ইতিহাসবিদ নীহাররঞ্জন রায় বলেন, ‘এই প্রাকৃতিক সীমা বিস্তৃত ভূমিখন্ডের মধ্যেই প্রাচীন বাংলার গৌড়- পুন্ড্র-বরেন্দ্রী-রাঢ়- সুহ্ম, তাম্রলিপি-সমতট-বঙ্গ-বঙ্গাল-হরিকেল প্রভৃতি জনপদ, ভাগীরথী-করতোয়া-ব্রহ্মপুত্র পদ্মা-মেঘনা এবং আরও অসংখ্য নদ-নদীবিধৌত বাংলার গ্রাম, নগর, প্রান্তর পাহাড়-কান্ডার। এই ভূখন্ডই ঐতিহাসিক কালের বাঙালীর কর্মকৃতির উৎস এবং ধর্ম-কর্ম-নর্ম ভূমি। একদিকে সুউচ্চ পর্বত, দুই দিকে কঠিন শৈলভূমি আর একদিকে বিস্তীর্ণ সমুদ্র, মাঝখানে সমভূমির সাম্য এটিই বাঙালীর ভৌগোলিক ভাগ্য।’ সপ্তম শতকে রাজা শশাঙ্ক প্রাচীন বঙ্গদেশের সিংহভাগই অর্থাৎ পুন্ড্রবর্ধন, প্রাচীন গৌড়, দক্ষিণবঙ্গ, উৎকল এবং হয়ত বঙ্গেরও বেশ কিছু অঞ্চল তাঁর শাসনাধীনে এনে গৌড় নামে একটি একক রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। হর্ষচরিতে শশাঙ্ককে গৌড়েশ্বর নামে

অভিহিত করা হয়েছে, এরপর থেকেই বঙ্গদেশ বলতে প্রধানত তিনটি জনপদকে বোঝানো হতো। এগুলো হলো- পৌন্ড্র, গৌড় এবং বঙ্গ। ক্রমবিবর্তনে পৌন্ড্র নামটিও গৌড় ও বঙ্গের মধ্যে একীভূত হয়ে যায়। জনপদ হিসেবে বঙ্গ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব দীর্ঘদিন ধরে রাখলেও প্রাচীন বঙ্গদেশ গৌড় দেশ নামে একক সত্তায় বিকশিত হয়েছিল। পুন্ড্র থেকে সমতটবাসীর সবার পরিচিতি ছিল গৌড়বাসী বা গৌড়ীয় হিসেবে। পাল ও সেন নৃপতিগণ সমগ্র বঙ্গদেশে শাসন পরিচালনা করলেও নিজেদের গৌড়েশ্বর ভাবতেই বেশি গর্ববোধ করতেন। এমনকি প্রকৃত গৌড় অঞ্চল থেকে বিতাড়িত হয়েও পূর্ববঙ্গে একটি সীমিত অঞ্চলে রাজত্বকারী সেন রাজারা গৌড়েশ্বর উপাধি পরিত্যাগ করেননি। কিন্তু পরবর্তীতে বঙ্গ নামটি গৌড়ের চেয়ে বেশি প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। মুসলিম যুগের প্রারম্ভিক স্তরে অর্থাৎ ইখতিয়ার আল-দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজির বঙ্গ বিজয়ের অব্যবহিত পরে মুসলিম বঙ্গের প্রশাসনিক বিভাগ ছিল- বঙ্গ, রাঢ়, বাগড়ী ও বরেন্দ্র (বরিন্দ)। উল্লেখ্য, 'পুন্ড্র জনপদ' ক্রমশ শাসনতান্ত্রিক বিভাগে পরিণত হয় এবং এর উত্তরোত্তর সীমা বৃদ্ধির ফলে সম্ভবত গুপ্ত আমলেই এর প্রশাসনিক একক হিসেবে নাম হয় পৌন্ড্রবর্ধন। প্রাচীন পুন্ড্র জনপদটি ক্রমে পাল আমল থেকে বরেন্দ্রী নামে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।পাল আমলে দশম শতাব্দীতে বরেন্দ্র নামক জনপদের উল্লেখ দেখা যায় কবি সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত রামচরিতাম নামক কাব্যগ্রন্থে। সেখানে কবি প্রশস্তিতে আছে, বসুধা শিরো বরেন্দ্রীমন্ডল চূড়ামনি : কুল স্থানম। শ্রী পৌন্ড্রবর্ধনপুর প্রতিব : পুণ্য ভব্বহদ্বটু। রামচরিত কাব্যে ও কমৌল তাম্রশাসনে বরেন্দ্রীকে পালদের 'জনকভু' অর্থাৎ পিতৃভূমি রূপে অভিহিত করা হয়েছে। সেন ও পাল রাজাদের বিভিন্ন তাম্রশাসন ও উৎকীর্ণ থেকে যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তা থেকে মনে হয় যে, বর্তমান দিনাজপুর, বগুড়া, রাজশাহী ও পাবনার কিয়দংশ নিয়ে প্রাচীন বরেন্দ্রভূমি গড়ে উঠেছিল। আর মুসলিম শাসনে এই বরেন্দ্রী মধ্যযুগীয় 'বরেন্দ্র' জনপদে পরিণত হয়। তাবাকাত-ই-নাসিরীতেও দেখা যাচ্ছে, এমনকি এয়োদশ শতকেও বাংলার বিভাগ হচ্ছে- রাঢ়, বরেন্দ্র, সনকনাট বা সমতট এবং বঙ্গ। ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থে সর্বপ্রথম বঙ্গ নামের উল্লেখ দেখা যায়। প্রাচীনকাল থেকে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত প্রাচীন বঙ্গভূমি বঙ্গ, পুন্ড্র, গৌড় রাঢ়, সুহ্ম, তাম্রলিপ্তি, সমতট প্রভৃতি জনপদে বিভক্ত ছিল। উক্ত জনপদগুলোর প্রশাসনিক কেন্দ্রবিন্দুকে শহর বা নগর উল্লেখ করা যেতে পারে। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে রাজা শশাঙ্ক কর্তৃক জনপদগুলোকে একত্রিত করে গৌড় নাম দেয়া হয়। শশাঙ্কের পর হতে পুন্ড্র, গৌড় ও বঙ্গ এই তিনটি জনপদ মিলিতভাবে বঙ্গ বা বাংলা অঞ্চল হিসেবে মনে করা যায়। প্রাক মুসলিম আমলে মৌর্য ও গুপ্তদের অধীনতা মেনে নিলেও অন্য সময় বাংলা স্বাধীন ছিল। মুসলমান আমলে সমগ্র বাংলায় স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠিত হয়, যা প্রায় তিন শ' বছর অক্ষুণ্ন থাকে। এই স্বাধীনতার যুগগুলোতে বাঙালীর জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলো বিকশিত হয়েছে। বাংলা দক্ষিণ এশিয়া তথা ভারতবর্ষের একটি স্বতন্ত্র অঞ্চল। প্রাকৃতিক কারণেই ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চল থেকে বাংলা আলাদা, তবে একেবারে বিচ্ছিন্ন নয়। বাংলার গ্রামীণ জীবন ছিল একান্তই কৃষিভিত্তিক। এ সময়ের বাংলার গ্রামগুলো ছিল কৃষিনির্ভর এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পনির্ভর। এগুলোর সংখ্যা খুব বেশি ছিল না এবং আয়তনেও এগুলো ছিল ছোট। কৃষিজীবী গ্রামীণ মানুষের চাহিদাও অনেক কম ছিল। এদের উৎপাদনের জন্য সুপ্রচুর ভূমি থাকলেও খুব বেশি প্রয়োজন গ্রামবাসীর ছিল না। পক্ষান্তরে শহরের প্রয়োজন মেটাবার মতো সাধারণত সুবিশাল আয়তনের কৃষিক্ষেত্র থাকে না। প্রদোষকালীন বাংলায় শহরের আওতার বাইরে বৃহত্তর জনপদবিস্তৃত কৃষিক্ষেত্র ছিল। সেই কৃষিক্ষেত্রকে আশ্রয় করে গ্রামীণ মানুষদের নিকটেই বসতি গড়ে নিতে হতো। এগুলোই গ্রাম হিসেবে চিহ্নিত হতো। তাই কৃষিনির্ভর সভ্যতাকে গ্রামকেন্দ্রিক সভ্যতা বলা হয়ে থাকে। কৃষিকর্মের জন্য প্রধান ও প্রথম প্রয়োজন হচ্ছে জল। বাংলায় দেখা গেছে যেখানে নদী-নালা, খাল-বিল অর্থাৎ জল সহজলভ্য সেখানেই সমৃদ্ধ গ্রাম গড়ে উঠেছে। এই কারণেই কৃষি সভ্যতার বিকাশ হয়েছে নদী-নালা, খাল-বিল অর্থাৎ জলকে আশ্রয় করে।

সে সময়ে যারা গ্রামে বাস করত তারা সাধারণত কৃষিনির্ভর ভূম্যধিকারী, কৃষক, শ্রমিক, ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকের সংখ্যাই প্রধান। এদের জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা, ধ্যান-ধারণা সমস্ত কিছুই ছিল কৃষি ও এতদসংক্রান্ত বিষয়াবলীকে আশ্রয় করে। গ্রামের মধ্যেও কম গুরুত্বপূর্ণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হতো গ্রামের অবস্থান ও সুযোগ-সুবিধার ওপর ভিত্তি করে। যে সকল গ্রামের অবস্থান জলাভূমি ও স্থলপথের ওপর, লোকালয় ও কৃষিজ ভূমি

যেখানে সহজপ্রাপ্য ও প্রচুর কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ যেখানে রয়েছে, শিল্পোৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে অথবা শাসনকার্য পরিচালনার কোন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত থাকত এবং শিক্ষা, সংস্কৃতি বা ধর্মকর্মের কেন্দ্রভূমি হিসেবে পরিচিতি পেত এই সমস্ত গ্রামগুলোই বেশি গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেত। এসব গ্রামে লোকসংখ্যা বেশি থাকত, আয়তন বেড়ে যেত এবং মর্যাদার দিক দিয়েও এই সকল সুবিধাবঞ্চিত গ্রামের চেয়ে বেশি মর্যাদাসম্পন্ন হিসেবে পরিগণিত হতো। এই রকম কিছু কিছু গ্রামের খবর লিপিমালা ও সমসাময়িক সাহিত্যে পাওয়া যায়। বলাল সেনের নৈহাটি লিপিতে দেখা যায়, বালহিটঠা একটি এ রকম বৃহৎ গ্রাম। এটি ছিল বর্ধমানভুক্তির উত্তরাঢ় ম-লের স্বল্প দক্ষিণবীথির অন্তর্ভুক্ত। লক্ষণসেনের গোবিন্দপুর লিপিতে বর্ধমানভুক্তির পশ্চিম খাটিকার অন্তর্ভুক্ত বেতট্টচতুরকের অন্তর্গত বিড্ডারশাসন গ্রাম। লক্ষ্মণসেনেরই তর্পণদীঘিলিপিতে উল্লিখিত অন্য গ্রামটি হচ্ছে বিক্রমপুরের অন্তর্গত বেলহিষ্ঠী গ্রাম। এই তিনটি গ্রাম বিভিন্ন আয়তনের এবং বিভিন্ন বিশেষণবিজড়িত। এভাবে দেখা যাচ্ছে, প্রাচীন বাংলার এই গ্রামগুলোতে ঊষরভূমি, মালভূমি, গর্ত, গোচারণভূমি, খাল-বিল, পুষ্করিণী, নদী, নদীর খাত ইত্যাদি রয়েছে। এ গ্রামগুলোর মানুষ বন-জঙ্গল হতে জ্বালানি কাঠ, ঘরবাড়ি নির্মাণ করার জন্য বাঁশ, খুঁটি ইত্যাদি সংগ্রহ করত। গ্রামকে কেন্দ্র করে বিশেষ বিশেষ শিল্পীরা বসবাস করত। বাঁশ ও বেতের শিল্প, কাষ্ঠশিল্প, মৃৎ শিল্প, কার্পাস ও অন্যান্য বস্ত্রশিল্প, লৌহ শিল্প ইত্যাদির কেন্দ্রও গ্রামে ছিল বলে অনুমান করা যায়। কৃষিকাজের জন্য প্রয়োজনীয় বাঁশ ও বেতের নানা প্রকার পাত্র, ঘরবাড়ি, নৌকা, মাটি নির্মিত হাঁড়িপাতিল, লোহার দা-কুড়াল, কোদাল, লাঙ্গলের ফলা, খন্তা ইত্যাদি নিত্য ব্যবহার্য কৃষি যন্ত্রাদির প্রয়োজন ছিল গ্রামে। কার্পাস ফুল ও বিচি, তাঁত, তুলা, তুলাধুনো ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রামেই বেশি ছিল যা সহজেই ধারণা করা যায়। সুতাকাটা দরিদ্র ব্রাহ্মণ গৃহস্থবাড়ির মেয়েদেরও কর্ম ছিল। তাঁরা কাপড় বুনত। গোবিন্দকেশবের লিপি হতে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় কাঁসারি শিল্প ও হাতির দাঁতের শিল্প গ্রামে বেশ চালু ছিল। এই সকল কার্যক্রমের সূত্রে কোন কোন ব্যবসায়ীরাও গ্রামে বসবাস করতেন। তাঁরা শহরের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যে মধ্যসত্তার দায়িত্ব পালন করতেন। গ্রামে বসবাসকারী প্রধান প্রধান পেশাজীবী ও শ্রেণীর মধ্যে ছিল ব্রাহ্মক্ষণ, ভূমির মালিকগণ, ক্ষেত্রকর, ভূমিহীন কৃষিশ্রমিক, কর্মকার, কুম্ভকার, মালাকার, চিত্রকর, তৈলকার, সূত্রধর প্রভৃতি শিল্পীরা। এ ছাড়া কিছু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং গোপ, নাপিত, রজক, নর্তক-নর্তকী ইত্যাদি এবং এ ছাড়াও নিম্নশ্রেণীর মানুষ। কৃষিপ্রধান প্রাচীন ও প্রদোষকালীন সভ্যতা এবং সংস্কৃতি যেমন বাংলার গ্রামীণ জীবনকে প্রভাবিত করেছে তেমনি নাগরিক সভ্যতাকেও করেছে চাকচিক্য ও বৈচিত্র্যময়। গ্রামীণ সমাজ বহুলাংশে অস্ট্রিক ভাষাভাষী আদিবাসীদের দানকে স্বীকার করে অপরপক্ষে নাগরিক সভ্যতায় দ্রাবিড় ভাষাভাষী মানুষের অবদান রয়েছে।

Rural society of Bengal through the ages

প্রাগৈতিহাসিক যুগে আদিবাসীরা আজকের উপজাতির মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'গোষ্ঠী জীবনে' (triballife) অভ্যস্ত ছিল। এরা অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, মোঙ্গলীয় প্রভৃতি অনার্য গোষ্ঠীভুক্ত ছিল। সব আদিম লোকের মত বস্তুপূজা ছিল এদের ধর্ম। এর পর একই প্রকৃতি-পরিবেশে একই উৎপাদনব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে এক এক অঞ্চলে এক একটি 'জনপদ' গড়ে উঠতে থাকে। প্রাক-মুসলিম যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সূত্রে বঙ্গ, পুণ্ড্র, রাঢ়, সুহ্ম, বঙ্গাল, সমতট, হরিকেল, তাম্রলিপ্তি প্রভৃতি জনপদের নাম পাওয়া যায়। এই জনপদগুলি অনার্যরাই গড়ে তুলেছিল। 'রাঢ়' শব্দ অস্ট্রিক 'লাড়' বা 'লাচ' শব্দজাত। প্রাকৃত জৈনগ্রন্থ 'আয়ারাঙ্গসুত্তে' রাঢ় বুঝাতে লাড় শব্দের প্রয়োগ আছে। অস্ট্রিক লাড় শব্দের অর্থ 'সাপ'। 'পুণ্ড্র' বা 'পৌণ্ড্র' শব্দটি দ্রাবিড় ভাষা- জাত। পুত্র শব্দের অর্থ ইক্ষু। 'তাম্রলিপ্তি' অথবা 'দাবলিত্তি' অনার্য ভাষার শব্দ। আর্যকৃত সংস্কৃত গ্রন্থ থেকেও প্রমাণিত হয়, ঐসব জনপদ অনার্যদের দ্বারাই গড়ে উঠেছিল। 'আর্যময়ুশ্রীবুলকন' গ্রন্থে গৌড়, পুণ্ড্র, সমতট ও হরিকেলের ভাষাকে 'অসুর ভাষ।' বলা হয়েছে। 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ' গ্রন্থে পুণ্ড্রদের 'দস্থা' বলা হয়েছে। ঐ গ্রন্থেই আছে, দস্যুরা অনার্য শ্রেণীভুক্ত। 'বোধায়নধর্মসূত্র' গ্রন্থে আছে, অনার্য অধ্যুষিত সংস্কারবঞ্চিত দেশ বঙ্গ-পুণ্ডে কেউ গেলে তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। 'ভাগবতে' সুম্মদের 'পাপ' বলা হয়েছে। বলা বাহুল্য, অসুর, দস্য, পাপ প্রভৃতি শব্দ অনার্যদের প্রতি প্রযোজ্য ছিল। আর্য কর্তৃক বিজিত ও প্রভাবিত হওয়ার পর কোন কোন শক্তিশালী শাসনকর্তার নিয়ন্ত্রণে

দুএকটি জনপদ একই স্বার্থের অধীনে একত্র ও সম্মিলিত হতে থাকে। বিভিন্ন জন- পদের মিলন ও একত্রীকরণের একটা গতিও পাওয়া যায়। শেষের দিকে যেখা যায়, রাঢ়, পুণ্ড, বজ এই তিনটি জনপদ অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে। রাঢ় জনপদের সঙ্গে মিশেছে সুক্ষ, বস্তু, তমলুক, দণ্ডভুক্তি প্রস্তুতি। যজ জনপদের সঙ্গে মিশেছে বঙ্গ, সমতট, হরিকেল প্রভৃতি। মুসলমান আমলের গোড়াতে গৌড় ও বঙ্গ নামই অধিক প্রচলিত ছিল। আকবরের আমলে দুটিতে মিলে 'সুবাহ-ই-বাঙ্গালাহ্'তে পরিণত হয়। মৌর্যযুগ (খ্রীস্ট-পূর্ব তিন শতক) থেকে আর্থীকরণ শুরু হয়, গুপ্তযুগে (খ্রীস্টীয় পাঁচ-ছয় শতক) তা পূর্ণতা লাভ করে। মৌর্বসম্রাট অশোকের ক্ষমতা তাম্রলিপ্ত ও পুণ্ড্রবর্ধনে প্রসারিত হয়েছিল। তিনি বৌদ্ধধর্মের অনুসারী ছিলেন। সমতট পর্যন্ত গুপ্তসাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। গুপ্তরাজারা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ধারক ছিলেন। আর্যরা এশিয়া মাইনর থেকে এসেছিল। তারা মূলে ছিল শক্তির উপাসক। সাত শতকের গোড়ায় শশাঙ্ক 'গৌড়েপুর' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। তিনি স্বাধীন বঙ্গরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেন। আট শতকে পালদের অভ্যুদয় হয়। সামন্তগণের মনোনয়নে গোপালদেব সিংহাসন পান। গৌড়বাসী যে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সংহতি লাভ করেছিল, এতে তারই প্রমাণ পাওয়া যায়। একশো বছরের 'মাৎস্যন্যায়ে'র পর তারা যখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে এক জন রাজার নেতৃত্ব স্বীকার করছে তখন তা জীবনের নিরাপত্তা ও শান্তি-শৃঙ্খলার অভিপ্রায় মাত্র নয়, তাতে সম্মিলিত রাষ্ট্রচিন্তাও ক্রিয়া করেছে, বলতে হয়। পালদের রাষ্ট্রীয় সীমান। বাংলার বাইরেও প্রসারিত ছিল। পালরাজগণ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁরা অনেকে দক্ষ সুশাসকও ছিলেন। তথাগতের মৈত্রীবাণী ও অহিংস আদর্শে উদ্বুদ্ধ জনগণ সহাবস্থানের নীতিতে অভ্যস্ত হয়েছিল। এযুগে রাজা- প্রজার সম্পর্ক দূরের ছিল ন। বলে রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় লৌকিক সংস্কৃতির বিকাশ ও সমৃদ্ধি ঘটেছে। ময়নামতি-মহাস্থানগড়ের 'টেরাকোটা' শিল্পকলা এর একটি প্রামাণিক নিদর্শন। শেষের দিকে লৌকিক ভাষায় সাহিত্যচর্চাও হয়েছে, যেমন চর্যাপদ সুতরাং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনের যত গৌড়বাসীর সাংস্কৃতিক জীবনও দানা বেঁধে উঠেছিল পালযুগে। বলা যায়, তখনই একটা আগৌড় স্থিতিশীল লোকসমাজ গড়ে উঠেছিল। বার শতকে গৌড়বঙ্গে সেনরাজারা অধিষ্ঠিত হন। সেনদের ক্ষমতা কলিজ ও কামরূপ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁরা ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ব্রাহ্মণ্যবাদ মুখ্যত রক্ষণশীল। সেনরা এদেশে পুরোপুরি রাজতন্ত্র কায়েম করেন। ব্রাহ্মণ্যবাদ রক্ষায় তাঁরা খড়গহস্ত ছিলেন। তাঁদের রুদ্ররোষে বৌদ্ধরা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়। ধ্রুপদী ভাষা-শিল্প-সাহিত্য ছিল তাঁদের লক্ষ্য। বিষিধ ধর্মানুশাসন ও কঠোর সমাজবিধি প্রবর্তন করে তাঁরা রাজ্য শাসন করতেন। ফলে রাজা-প্রজার সম্পর্ক প্রভু-ভূত্যের রূপ নেয়। বস্তুতঃ কর্ণাট দেশীয় সেনয়াজার। এদেশে ঔপনিবেশিক শাসন চালাতেন।

তথাপি এদেশের গ্রামীণ সমাজের মূল কাঠামোটি নষ্ট হয়নি। বরং রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক শাসন-শোষণ, তর্জন-গর্জনকে স্বীকার করে বাঙালী নিজেদের বিভিন্ন বৃত্তি, জীবিকা, ধর্মকর্ম নিয়ে নিজস্ব স্মৃতিটি রক্ষ। কবে চলেছিল। লৌকিক জীবন ধারা যে নষ্ট হয়নি, তার প্রমাণ পাই মুসলিম বিজয়ের অব্যবহিত পরে হিন্দু সমাজের রূপ দেখে। উচ্চ সম্প্রদায়ের লোকের। সাধারণ লোকের সাথে সহাবস্থানের নীতিতে মিশে যাচ্ছেন আর জীবনের নানা ক্ষেত্রে তাঁদের সাথে একারতা স্বাপন করছেন। বিশেষ করে, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে উচ্চশিক্ষিত লোকের। অবাধে লৌকিক উপাদান গ্রহণ করেছেন। লৌকিক দেবদেবী অভিজাত লোকের পূজা পেয়েছেন। তাঁদের মাহায্য ও পূজা প্রচার করে ভদ্রসাহিত্য রচিত হয়েছে। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, শিবমঙ্গল ব্রাহ্মাণ কবিপণ্ডিতরাই রচনা করেছেন। স্বর্গের দেবকুমার ও দেবকুমারী অভিশাপগ্রস্ত হয়ে মর্ত্যে জন্ম গ্রহণ করেছেন অস্পৃশ্য ব্যাধ গৃহে ও দরিদ্র পল্লীগৃহে। ব্রাহ্মণ কবিরা এসব কাহিনী লিখতে মোটেই কুণ্ঠাবোধ করেননি। এতে লোকসমাজের দাবী ও শক্তির পরিচয় নিহিত আছে। মুসলিম বিজয়ের পর বাঙালী সমাজ আরও সংহত ও শক্তিশালী হয়ে উঠে। জনশক্তি রাজস্বার্থে লাগতে পারে, মুসলমান সুলতানেরা স্বাধীন বঙ্গদেশের পত্তন করে এ বিষয়ে জনগণকে সচেতন করে দেন। চৌদ্দ শতকের মধ্যভাগে পাঠান সুলতান শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ এটি করেছিলেন। ঘোল শতকে মুষলদের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে পর্যন্ত পাঠানর। স্বাধীন ভাবে এদেশ শাসন করেন। গৌড় ছিল তাঁদের রাজধানী। পাঠান আমলে বাংলাদেশ একটা রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা পেলেও দেশের জনগণের যে রাষ্ট্রীয় চেতনা জেগেছিল, তা বলা যায় না। মুঘল আক্রমণের প্রাক্কালে বারো ভূঁইয়াদের প্রচেষ্টায় জনগণের জাতীয়তাবোধ জেগে উঠতে পারত; কোন কোন সামন্ত ভূঁইয়ার স্বার্থ, আত্মমর্যাদা এবং স্বাধীনতাবোধ তীব্রই ছিল; তাঁরা কেউ কেউ

এক সময় মিলিত স্বার্থে একের (যেমন ঈশা খানের) কর্তৃত্ব মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু তা ছিল একান্ত ভাবে সামন্তস্বার্থ, এতে প্রজাস্বার্থ যুক্ত হয়নি। ফলে তাঁদের প্রয়াস সফল হয়নি। মুঘল বিজয়ে বাংলা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হল বটে, কিন্তু বৃহৎ বাংলার (বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা) আঞ্চলিক রাষ্ট্রীয় সীমানা তিরোহিত হল না। বরং রাজকার্যের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য আকবর বাদশাহ মুঘল সাম্রাজ্যকে কতকগুলি সুবায় বিভক্ত করলেন। বস্তুতঃ আকবরের আমলেই বাংলা প্রথম প্রাদেশিক নাম পায়- 'সুবাহ-ই-বাঙ্গালাহ'। ভারতরাষ্ট্রের পটভূমিতে নির্দিষ্ট দেশ ও জাতি হিসেবে বাংলা ও বাঙালী স্বীকৃতি পায়। আরবভূমি ছিল ইসলাম ধর্মের উৎপত্তি স্থল । তারা মুখ্যতঃ ধর্মভিত্তিক মুসলমান সম্প্রদায় গড়ে তোলে যা ক্রমশঃই সংখ্যাগরিষ্ঠ ও শক্তিশালী হয়ে উঠে। মুঘল আমলে বাংলার রাজধানী ছিল ঢাকা; শেষের দিকে স্বাধীন নবাবেরা মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থাপন করেন।

আঠার শতকের মধ্যভাগে ইংরেজ এদেশে আধিপত্য বিস্তার করে। ইংল্যান্ড তাদের মাতৃভূমি; এবং তারা ছিলেন খ্রীস্টধর্মের অনুসারী। শ্বেতকায় ইংল্যান্ডবাসী নিজেদের রাজার জাত মনে করত; তাদের কাছে ভারতীয়রা ছিল 'নেটিভ'। নেটিভদের শাসন করা যায়, শোষণ করা যায়। এই নীতিতে তারা এদেশে পুরোপুরি ঔপনিবেশিক শাসন চালিয়েছে। ইংরেজরা ভারতকে কখনও মাতৃভূমি ভাবেনি। প্রায় দুশো বছর তাদের শাসন-শোষণ চলে। এক সময় ইংরেজরাই বর্তমান বাংলার প্রাদেশিক সীমানা নিদিষ্ট করে দেয়। বিহার ও উড়িষ্যা বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা প্রদেশ রূপে চিহ্নিত হয়। প্রধানতঃ ভাষার ভিত্তিতে এরূপ বিভাগ হয়। মোটামুটি বাংলায় ভৌগোলিক সীমানা দাঁড়ায় এরূপ: উত্তরে হিমালয়ের অরণ্যবেষ্টিত পাদদেশ ও আসামভূমি, পূর্বে-খাসিয়া- জৈন্তিয়া-পার্বত্যচট্টগ্রামের শৈলশ্রেণী, পশ্চিমে রাজমহল ছোট নাগপুরের মালভূমি, দক্ষিণে বিশাল বঙ্গোপসাগর। এর মধ্যবর্তী নদনদী, বিল-হাওর, ঢিবি-টিলা, বন-বাদাড়, পথ-ঘাট, গ্রাম-গঞ্জ, শহর-নগর আর্কী বিস্তীর্ণ পাললিক সমতল ভূমি নিয়েই বাংলার দেহ গঠিত। কলিকাতা হয় রাজধানী। ইংরেজদের দ্বারাই আধুনিক যুগের সূচনা হয়। রাজপ্রাসাদ কেন্দ্রিক রাজধানী নয়, সকলের বাসোপযোগী নগরের পত্তন হয়। নতুন নতুন শিল্প-কারখানা গড়ে উঠে। আধুনিক শিক্ষার প্রবর্তন হয়। পত্র- পত্রিকার মুদ্রণ ও প্রচারের ফলে জ্ঞানের প্রসার বেড়ে যায়। বাঙালীর বহিজীবনের পরিবর্তনের সাথে সাথে অন্তজীবনের নানা বৃত্তি ও বুদ্ধির বিকাশ ঘটতে থাকে। পাশ্চাত্যের প্রভাবেই বাঙালীর স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়। সংহত ও সংগঠিত জাতি হিসেবে বাঙালীর পরিচয় সুচিহ্নিত ও সুনিরূপিত হয়ে যায়। আধুনিক শিক্ষার বিস্তার প্রবর্তন হয়। পত্র- পত্রিকার মুদ্রণ ও প্রচারের ফলে জ্ঞানের প্রসার বেড়ে যায়। বাঙালীর বহিজীবনের পরিবর্তনের সাথে সাথে অন্তজীবনের নানা বৃত্তি ও বুদ্ধির বিকাশ ঘটতে থাকে। পাশ্চাত্যের প্রভাবেই বাঙালীর স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়। সংহত ও সংগঠিত জাতি হিসেবে বাঙালীর পরিচয় সুচিহ্নিত ও সুনিরূপিত হয়ে যায়। আধুনিক শিক্ষার বিস্তার, যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসার ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ফলে ইংরেজ আমলে লোকসমাজেও পরিবর্তন শুরু হয়, তবে আমুল পরিবর্তন কখনও হয়নি। ইংরেজ শাসনমুক্তির কালে বাংলা দ্বিখণ্ডিত হয়। ভাষা নয়, সংস্কৃতি নয়, হিন্দু এবং মুসলমান দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে এ বিভাগ নিরূপিত হয়েছে।

Unit-2: Anthropological and sociological theories of folk tradition

নৃবিজ্ঞান (Anthropology) আক্ষরিক অর্থে মানুষ বিষয়ক বিজ্ঞান। এট লক্ষ্য হলো অতীত ও বর্তমানের মানব সমাজ ও মানব আচরণকে অধ্যয়ণ করা । কিন্তু মানুষ বিষয়ক অন্যান্য বিজ্ঞানগুলির চেয়ে এটির পরিধি ব্যাপকতর। বিশ্বের সকল অঞ্চলের, সংস্কৃতির মানুষকে নিয়ে এই বিজ্ঞানে গবেষণা করা হয়। লক্ষ কোটি বছর ধরে মানুষের বিবর্তন এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের গবেষণাও নৃবিজ্ঞানের আওতায় পড়ে। নৃবিজ্ঞানে মানুষকে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গবেষণা করা হয়। বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ ও তাদের সব রকমের অভিজ্ঞতা নৃবিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয়। নৃবিজ্ঞানীরা কোন একটি বিশেষ মানব

সম্প্রদায়ের সাধারণ বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে ও সেগুলি ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেন। এই বৈশিষ্ট্যগুলি মানুষের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বা সামাজিক রীতিনীতি হতে পারে।

সাধারণভাবে সাহিত্য, সংগীত, চিত্র, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও কারু শিল্পকলাকে সংস্কৃতি আখ্যা দেওয়া হয়। এগুলি রূপায়ণে শুধু সংস্কৃতিই নয়, সংস্কৃতির বাহনও বটে। মানুষের চিন্তা, কল্পনা, ধ্যান, ধারণা, ভাবানুভূতির অভিব্যক্তি হিসেবে শিল্পকলা সংস্কৃতির অঙ্গ, কিন্তু সংস্কৃতির বাহনরূপে যে জগৎ ও জীবনের পরিচয় ফুটে উঠে- সংস্কৃতির উপকরণ সেখানেও বিদ্যমান।

সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে বৈচিত্র্যতা এবং সাদৃশ্যতা অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করে থাকে। সংস্কৃতি হলো একটি মানবগোষ্ঠীর ধর্ম, সামজিক রীতিনীতি, খাবার, আচার ও শিল্পের বৈশিষ্ট্য। ফলে, সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানে মানুষ কীভাবে সংস্কৃতির অংশ হয়ে জীবন-যাপন করে, সেটা অন্যতম আলোচ্য বিষয়। সংস্কৃতির পরিবর্তনের ব্যাপারগুলোও এইক্ষেত্রে আলোচিত হয়। সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান সামাজিক কাঠামোর উন্মোচন,প্রতীকের ব্যাখ্যা প্রদানের কাজও করে থাকে। সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য অধ্যয়ন ও ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীরা মাঠকর্ম অথবা সংস্কৃতির তুলনামূলক অধ্যয়নের মাধ্যমে করে থাকেন। মাঠকর্মে নৃবিজ্ঞানীরা যে সমাজ, সংস্কৃতি ও জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করেন তারা সেই জনগোষ্ঠীর সাথে বসবাস করে এসকল তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করেন। প্রথাগতভাবে নৃবিজ্ঞানীরা ছোট কোন জনগোষ্ঠীতে থেকে ঐ জনগোষ্ঠীর আচার, রীতিনীতি, প্রথা, বিশ্বাস, সামাজিক রীতি, ধর্ম, অর্থনীতি ও রাজনীতি পর্যবেক্ষণ এবং অধ্যয়ন করেন। নৃবৈজ্ঞানিক চিন্তাসূত্র নৃতাত্ত্বিক মাঠকর্ম থেকে উদ্ভূত হয় বলে তা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিজ্ঞান থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সংস্কৃতির আড়াআড়ি পাঠের ক্ষেত্রে নৃবিজ্ঞানীরা মাঠকর্ম থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ করে থাকে। সাংস্কৃতিক তুলনা, বৈচিত্র্য নির্ণয় ও সাধারণীকরণ করতে এথনোলজি (Ethnology) অনুসরণ করা হয়। অনুমান নিরীক্ষা, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত তত্ত্ব নির্মাণে এথনোলজি সাহায্য করে।

বাংলার বর্তমান সংস্কৃতি তিন শ্রেণীর- নগর-সংস্কৃতি, লোক-সংস্কৃতি ও আদিম-সংস্কৃতি। নগর-সংস্কৃতি ও লোক-সংস্কৃতির উপাদান-প্রকরণ সমান অর্থাৎ উভয়েই ত্রিসঞ্চয়ের সমন্বয়। তবে উভয়ের মানের ভেদ আছে। নগর-সংস্কৃতি সূক্ষ্ম, জটিল, বিচিত্র, বিমিশ্র, যাজিত, শোভনীয় ও মননাশ্রিত। সমাগম, যোগাযোগ, সংমিশ্রণ, সাঙ্গীকরণ ইত্যাদি কারণে নগর-সংস্কৃতি দ্রুত পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়। অর্থাৎ সংস্কৃতির বিকাশের শর্ত যে 'মবিলিটি' এখানে তার সুযোগ-সুবিধা যেশী। যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসার এবং শিক্ষার বিস্তারের জন্য আধুনিক নগর-সংস্কৃতি আন্তর্জাতিক ভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে।

লোক-সংস্কৃতিতে এসব গুণের অভাব আছে। লোক-সংস্কৃতি স্থুল, সরল, অমার্জিত, গতানুগতিক ও বৈচিত্র্যহীন। যথাযথো শিক্ষা ও অনুশীলনের অভাব এর অন্যতম কারণ। লোকচর্চায় যত্ন ও শ্রম কম। লোকে সহজ প্রবৃত্তির বশে উত্তরাধিকারসূত্রে অথবা পারিপার্শ্বিক প্রভাবে অনায়াসে যা পায় তাই গ্রহণ করে। লোকে আগ্রহাতিশয্যে নতুনকে বরণ করে কিন্তু অবিকলভাবে তা ধাতস্থ করতে পারে না। উপজাতি লোকেরা বিদেশী উপকরণ সহজে গ্রহণ করে না; বিদেশী উপকরণ গ্রহণে লোকমনে বাধা নেই, কিন্তু সীমিত বোধশক্তিতে সর্বাংশে তা আয়ত্ত করতে পারে না। যেটুকু তার চৈতন্য ও বুদ্ধিতে ধরা পড়ে, সেটুকু গ্রহণ করে সন্তুষ্ট হয়। বিদেশী ভাববস্তুকে নিজ অভিরুচি ও অভিলাষ অনুযায়ী সাঙ্গীকরণের চেষ্টা করে। দেশাচার, লোকপ্রথা, প্রচলিত বিধিব্যবস্থা যা তারা পূর্বপুরুষের কাছ থেকে দেখে ও শুনে লাভ করে, তাই লোক-সংস্কৃতির সম্পদ। অর্থাৎ লোক-সংস্কৃতি প্রধানতঃ ঐতিহ্যনির্ভর। পৈতৃক সম্পত্তির মত এগুলি বিনা দ্বিধায়, বিনা

বিচারে গ্রহণ করে ও পালন করে। গভীর অনুধ্যান ও অনুশীলন নেই বলে লোকভাবনার দ্বারা নতুন উদ্ভাবন সম্ভব হয় না। লোক-সংস্কৃতি স্থুল ও জটিলতাহীন। স্থরতা ও অশালীনতার কারণে এর নন্দনতত্ত্বের আবেদন তেমন হৃদয়গ্রাহী হয় না। এজন্য লোক-সংস্কৃতি অকৃত্রিম। সরলতা ও স্বাভাবিকতা লোক-সংস্কৃতির ভূষণ। জনসাধারণের অক্ষর- জ্ঞান নেই বলে তারা কোন কিছু গ্রন্থিবদ্ধ বা নথিবদ্ধ করে রাখে না। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই লোকজ্ঞানের প্রধান উৎস। লোক মুখে তা প্রচারিত হয়, লোকশ্রুতিতে গৃহীত ও লোকস্মৃতিতে রক্ষিত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব তথা জাতিতত্ত্বের প্রকৃত উপাদান লোক-সংস্কৃতিতে প্রবহমান থাকে। সুতরাং একটি দেশের একটি জাতির মৌলিকতা ও স্বকীয়তার পরিচয় তার লোক-সংস্কৃতির দ্বারাই সম্ভব।

কোনো জাতির সংস্কৃতি ভুঁইফোড়ের মত অকস্মাৎ গজিয়ে উঠে না; জাতীয়জীবনের দীর্ঘকালের সাধনা ও সৃষ্টির সংরক্ষণ দ্বারা এর স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ রূপ গড়ে তোলা সম্ভব। বাঙালীর নিজস্ব সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। জাতির উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠা লাভের সূচনা থেকে এদেশের নির্দিষ্ট পরিবেষ্টনে পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে যুগে যুগে জীবনধারার অনুবর্তন-বিবর্তন দ্বারা আপন মানসিকতার আদর্শে একটি অনন্যসদৃশ অখণ্ড রূপ পরিগ্রহ করেছে। নৃতত্ত্ববিদ, পুরাতত্ত্ববিদ, ভাষাবিদ, সমাজতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে এ বিষয়ে আলোকপাত করে থাকেন।

Cultural Anthropology এর সাথে লোকসংস্কৃতির অনেকাংশে মিল বর্তমান রয়েছে। নৃতত্ত্ববিদ্যা এবং লোকসংস্কৃতি উভয় বিষয়ই চার্লস ডারউইনের বিবর্তনবাদ তত্ত্বকে এবং social Darwinism কে গুরুত্ব দিয়েছে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, মানুষ এবং সমগ্র মানবসমাজ ক্রম পরিবর্তন এবং বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যায়। উভয় বিষয় একটা নির্দিষ্ট ক্ষেত্র থেকে মানব সভ্যতার বিবর্তনের বিষয়টিকে স্বীকৃতি প্রদান করে।

তবে একথা উল্লেখ্য, উভয় বিষয়ের আলোচ্য বিষয় আলাদা। নৃতত্ত্ববিদ্যা বর্তমান সময় এর মানুষদের জীবনযাপন নিয়ে ভাবিত। যেখানে Folklore লোকসংস্কৃতির ইতিহাস খুঁজতে উদ্যত। লোকসংস্কৃতি বিষয়ক অনেক তত্ত্বকেই আন্তঃসাংস্কৃতিক (Cross - Cultural) হিসাবে দেখা হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, প্রতিটি সংস্কৃতিরই অন্য সংস্কৃতির উপর কিছু প্রভাব রয়েছে এবং প্রত্যেকের মধ্যেই কিছু সাদৃশ্য বিদ্যমান। উনিশ শতকের নৃতত্ত্ববিদদের সাধারণীকরণ প্রচেষ্টা (Generalization) বিংশ এবং একবিংশ শতকে সমালোচিত হয়েছে।

সমাজ নৃতত্ত্ববিদ রুথ বেনেডিক্ট, লোকসংস্কৃতি এবং নৃতত্ত্ববিদ্যা নিয়ে গবেষণার কাজ করেছেন এবং তাঁর মতে, সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয় একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত, কেবল বিভিন্ন ক্ষেত্রে এটি বিভিন্ন নামে পরিচিত এবং তার মতে, লোকগাথা এবং লোকসংস্কৃতি হল সংস্কৃতিকে বোঝার দ্বার।

সংস্কৃতির যে বিস্তৃততর সংজ্ঞা নৃবিজ্ঞানীরা যে নতুন সংজ্ঞা ব্যবহার করেছেন, তা শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত-নৃত্য-নাটক প্রভৃতি বিষয়কে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে দেখতে সহায়তা করেছে। অর্থাৎ শুধু এসব বিষয় নিয়েই যে সংস্কৃতি নয়, বরং সংস্কৃতির সামগ্রিক রূপ যে সমাজের সকল ধরনের মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার মধ্যেই নিহিত রয়েছে, নৃবিজ্ঞানীদের এই দৃষ্টিভঙ্গী নিঃসন্দেহে মানবিক শাস্ত্রসমূহের চর্চায় নূতন মাত্রা যোগ করতে সহায়তা করেছে।

অন্যদিকে শিল্প-সাহিত্যের জগতে উত্তর-আধুনিকতাবাদের যে ঢেউ সাম্প্রতিক দশকগুলোতে উঠেছে, তা নৃবিজ্ঞানেও এসে লেগেছে। যেমন, সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিভিন্ন সমকালীন তত্ত্ব ও পদ্ধতি ব্যবহার করে নৃবিজ্ঞানের অনেক ধ্রুপদী গ্রন্থকে এখন 'বিনির্মাণ' (deconstruct) করা হচ্ছে। নৃবিজ্ঞানীরা যে সব এথনোগ্রাফি রচনা করেছেন,

সেগুলোকে এক একটা সংস্কৃতির বিবরণ হিসাবে গণ্য করা হত। কিন্তু এরকম কোন বিবরণই কখনও পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। কাজেই সংস্কৃতির লিখিত বিবরণ তুলে ধরার ক্ষেত্রে নৃবিজ্ঞানীরা কোন উদ্দেশ্যে কি ধরনের রচনাশৈলী অনুসরণ করেছেন, কতটুকু তাঁরা তুলে ধরেছেন এবং কেন, কি তাঁরা তুলে ধরেন নি, কোন ধরনের পাঠকের জন্য তাঁরা এসব গ্রন্থ রচনা করেছেন, ইত্যাদি প্রশ্নের আলোকে নৃবৈজ্ঞানিক সাহিত্যের পুনঃপরীক্ষণের কাজ চলছে।

নৃতত্ত্বের বিচারে বাঙালির দেহে অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, নেগ্রিটো, মোঙ্গলীয় প্রভৃতি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর রক্তধারা প্রবাহিত; এর সঙ্গে পরবর্তীকালে অ্যালপানীয়, পলিনীয়, সেমিটিক প্রভৃতি জাতির রক্তও মিশেছে। বাংলার অনার্যসমাজে মূলতঃ অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, মোজলীয় ও নেগ্রিটোর মিশ্রণ আছে। এদের মধ্যে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়ের সংখ্যা বেশী। অস্ট্রিক- গোষ্ঠীর লোকেরা কৃষিকাজ জানত, দ্রাবিড়রা নগরজীবনেও অভ্যস্ত ছিল। মধ্য এশিয়ার যাযাবর আর্যরা কর্মঠ, বলিষ্ঠ ও তীরুধীসম্পন্ন ছিল। অনার্য-আর্যের মিশ্রণেই ভারতে হিন্দুত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। অনার্যের বস্ত ও প্রতীক পূজা এবং আর্যের শক্তি উপাসনা একত্রে প্রতিমা পূজার জন্ম দেয়। বস্তুর অথবা প্রতীকমূর্তিতে শক্তির অধিষ্ঠান, এটাই হল, সমন্বয়ের ধরন ও প্রকৃতি। অনার্যের স্থুল বস্তুবর্ষের উপর আর্যর মননশীলতা ও স্বজন- শীলতার এক অতি সূক্ষ্ম শিল্পকর্ম এবং এটাই বহুদেবতাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত সাধারণ হিন্দুধর্ম। ভারত উপমহাদেশের মাটিতেই জড়বস্তুপূজা, প্রাণী পুজো, প্রতিমাপূজার উদ্ভব, প্রতিষ্ঠা, প্রচার ও প্রচলন। পরবর্তীকালে হিন্দুধর্মের ক্রিয়াকাণ্ডের বিরোধিতা করে ভারতবর্ষেই বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব। বৌদ্ধধর্ম শূন্যবাদী; বৌদ্ধরা ঈশ্বর সম্বন্ধে নীরব। আরব পারস্যের মুসলমানরা সঙ্গে ইসলামধর্ম নিয়ে আসে। নিরাকার একেশ্বর আল্লাহ্ তাদের উপাস্য, আরাধ্য। শারীয়তপন্থীরা উপাসনা করে, বাঙালীর লোক-জীবনে ও লোক-সংস্কৃতিতে এসবের বিবিধ উপাদানের সমন্বয় ঘটেছে। মানবসংস্কৃতির প্রায় সকল ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, আদিম স্তরে দৈব-নির্ভরতা, কুসংস্কার এবং আচারবিধি অধিক প্রভাব বিস্তাব করে। এটা জগৎ-নিয়মের কার্যকারণবিধি সম্পর্কে ভাল জ্ঞান নেই অথচ জীবনের প্রতি গভীর মমত্ববোধ আছে, এমন অবস্থা থেকে আসে। বাঙালীর লোকজীবনে ধর্মের অনুশাসন বরাবর প্রবল ছিল। বিশেষতঃ হিন্দুর জীবন ধর্মের নিগড়ে বাঁধা। একেশ্বরবাদী ইসলামধর্ম স্বচ্ছ ও মুক্ত জীবনের আদর্শ বহন করলেও দীর্ঘদিনের একত্রবাস এবং মজ্জাগত সংস্কারবশতঃ মুসলমানের জীবন প্রকৃতিতে অনৈসর্গিক আচরণ প্রভাব বিস্তার করে। বাঙালীর সংস্কৃতির বৃহত্তম অংশের বিকাশ ধর্মকেই আশ্রয় করে। অপ্রাকৃত দৈবশক্তিতে বিশ্বাস থেকেই নানা ধর্মসংস্কারের উদ্ভব। দৈবনির্ভরতার বশবর্তী হয়ে স্মরণাতীত যুগ থেকে বাঙালী কত পথ, তত্ত্ব, নীতি, শাস্ত্র, বিশ্বাস, সংস্কার গড়ে তুলেছে তার ইয়ত্তা নেই। ধর্মের প্রতি ঐকান্তিক আনুগত্য থেকে নির্জীব জড়বস্তু- পুজা, দেবমূর্তিপুজা, উদ্ভিদপূজা, প্রাণীপুজো, নিরাকার ঈশ্বর উপাসনা বাঙালীর জীবন ও সংস্কৃতির বিকাশে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছে। বাঙালীর লোকমানসিকতা রক্তমাংসের মানবকেও দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে যথাবিধি পূজা করেছে। আবার শাস্ত্রীয় দেবতাকে স্বর্গের আসন থেকে টেনে এনে মাটির পৃথিবীতে ভজনা করেছে। ধর্মভিত্তিক সাহিত্য সঙ্গীত শিল্পকলার কথা ছেড়ে দিয়ে দৈনন্দিন জীবনের নিত্য-নৈমিত্তিকতার আচরণবিধির মধ্যেও বাঙালীর ধর্মীয় মানসিকতার প্রাধান্য ঘটেছে। হাতে শাঁখা, সিঁথিতে সিঁদুর, চোখে সুরমা, করতলে মেহেদি ধারণ ও রঞ্জনে বাঙালী রমণীর প্রসাধনচর্চার আন্তরবাসনাই একমাত্র লক্ষ্য নয়, এতে শুভাশুভ সংস্কারও জড়িয়ে আছে। জারি, সারি, মুশিদী, মসিয়া, গজল, বাউল, কীর্তন, ব্রত, পট, প্রতিমা, অলপনা, অন্নপ্রাশন, বিবাহ, আনন্দ-উৎসব, বস্ত্রালঙ্কার, আহারবিহার সর্বত্রই ধর্মের চিহ্ন, অবর্ষ কোথাও নেই।

বাঙালীর ধর্ম-প্রাণতার অন্যতম কারণ, শ্রমকাতর ও সংগ্রামবিমুখ জনজীবনে ও জীবিকার্জনে অতিমাত্রিক প্রকৃতিনির্ভরতা। বাঙালীর কৃষিনির্ভর জীবনে প্রাকৃতিক নিয়মের কাছে আত্মসমর্পণ অনিবার্য ছিল। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যা, ঝঞ্জা, কীটদংশন, পক্ষাঘাত, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ব্যাধি, মৃত্যু প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলি বাঙালীর দুর্বল মনে এক একটি ভীরু, অন্ধ, অশাস্ত্রীয় আচার ও কুপ্রথার জন্ম দিয়েছে। জীবনকে সে ভালবাসে কিন্তু জীবন রক্ষার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি তার আয়ত্ত হয়নি। এজন্য জীবন-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিকূল প্রাকৃতিক শক্তির অনুগ্রহ ও অনুকম্পা লাভের জন্য সে কেবল চেষ্টা করেছে,

প্রতিরোধের জন্য বাস্তব পরিকল্পনা গ্রহণ করেনি। কর্মহীন জীবন ও ভাবালুতা বাঙালীর ধর্মভীরুতার আর একটি উল্লেখ-যোগ্য কারণ। বাংলায় উর্বর মাটি , জীবিকার্জনের অফুরন্ত সুযোগ দিয়ে তার সন্তানকে কেবল অকর্মণ্য, অপদার্থ করে তোলেনি, বাংলার নদীনালা, খালবিল, শ্যামল প্রান্তর, সবুজ বনানী, স্নিগ্ধ বাতাস, নীল আকাশ তার অবসর যাপনকে অলস চিন্তায় ভারাজুর করে তুলেছে। কোন বলিষ্ঠ জীবনবেদ, কর্মনিষ্ঠা, জাতীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম সামনে ছিল না বলে বাঙালীমানস সংস্কার ও বিশ্বাস ভাবে প্রণত হয়েছে, প্রেম- ভক্তিরসে অবগাহন করেছে। সে স্বর্গের দেবতা আয় মর্ত্যেয় মানুষ ছাড়া কিছুই দেখিনি। প্রাচীন ও মধ্যযুগ ধরে বাঙালীর কর্মে, শিল্পে, সাহিত্যে, সামাজিকতায়, আচার-আচরণে এই একই অভীপ্সা সক্রিয় ছিল।

বাংলার লোকজীবনের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, রাজনীতির প্রভাব থেকে মুক্তি। প্রভুত্ব, শাসন, নিয়ন্ত্রণ, পালন ইত্যাদির মিলিত চক্রকে 'রাজনীতি' নাম দেওয়া যেতে পারে। শব্দতাত্ত্বিকের মতে রাজনীতি হল একটা কর্মরত শক্তিবিশেষ যার দ্বারা রাষ্ট্রদেহ গঠিত হয় এবং তার শারীর বৃত্তি নিরূপিত হয়। অর্থাৎ রাজনীতি হল কতকগুলি মতাদর্শের সমন্বয়। সে আদর্শ অনুযায়ী একটি রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র গঠিত হয় এবং তদ্দ্বারা রাষ্ট্রের সমস্ত কার্য পরিচালিত হয়।

অধুনা রাজনীতির ব্যবহার ও প্রচার যত সহজ হয়েছে, পূর্বকালে যেরূপ ছিল না। রাজনৈতিক চেতনা সম্পূর্ণ সমাজজীবনের উপরি মহলের মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল; নীচের তলার বৃহত্তম অংশ এর আওতার বাইরে ছিল। প্রাচীন ও মধ্যযুগের রাজতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের ফলে রাজনীতির হাওয়া কেবল রাজধানী বা রাজসভার সীমিত ক্ষেত্রেই গণ্ডিবদ্ধ ছিল। এ ছিল প্রাসাদের রাজনীতি, দেশের জনগণের নয়। জনগণের সাথে এর একটা যোগাযোগ ছিল তা কেবল রাজস্ব-সংক্রান্ত (fiscal) আর বিচার- সংক্রান্ত (Judicial)। কর পেলেই রাজা খুশি: শাসক-শাসিতের সম্পর্কে সম্পদের মালিকানা ও ভোগস্বত্ব নিয়ে জটিলতা ছিল না। সামন্তপতিরা প্রজার উপর কর্তৃত্ব ফলানোর চেয়ে প্রজার কাছ থেকে কর আদায়ের দিকে নজর রাখতেন। ইউরোপে এ সংগ্রাম ছিল। এখানে রাজার বদল হলেও প্রজারা ছিল অবিচল। জনসাধারণ হতে বিচ্ছিন্ন থেকে রাজা বা সামন্তপতিরা সম্পূর্ণ সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করতেন। দেশের যুবক সম্প্রদায় নিয়ে সেনাবাহিনী গঠিত হলেও তারা প্রধানতঃ ভাড়াটে সেনার কাজ করত। দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবোধ বলতে তেমন কিছু ছিল না। দেশের অন্তবিপ্লব দমন, বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ এবং পররাজ্য আক্রমণ ইত্যাদি কাজে রাজা সৈন্যদের ব্যবহার করতেন। অর্থাৎ তারা পুরোপুরি রাজস্বার্থেই ব্যবহৃত হত। যথা, প্লাবন, মহামারী ইত্যাদি দুর্দিনে প্রজার পাশে তারা দাঁড়াত না। সুতরাং এও ছিল রাজপ্রাসাদেরই একটা যন্ত্র। প্রজার সাথে সামরিক (martial) সম্পর্ক বিচ্ছিন্নই ছিল। রাজনীতির এসব জটিল আবর্তের বাইরে নিশ্চিন্ত জীবনযাপনের আয়োজন করে সেকালের বাঙালী আপন চেতনার পরিবেষ্টনে ছোটবড় সুখদুঃখ, আনন্দ-বেদনার মাঝে স্বীয় ভাবনা-কল্পনাকে নিয়োজিত করেছে। রাজধানীর বুকে একের পর এক সামন্তপতি, রাজা, সুলতান, সুবেদার, নবাবের বদল হয়েছে কখন নির্বিঘ্নে, কখন রক্তাক্ত বিদ্রোহের ভেতর দিয়ে, তবু বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিশেষ আলোড়ন জাগেনি। এর মূলীভূত কারণ হিসেবে সুধীজন বাংলার গ্রামজীবনের স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও আত্মনির্ভরতার উল্লেখ করেছেন। অর্থনৈতিক ও ব্যবহারিক জীবনের স্বয়ংসম্পূর্ণতার ফলে আত্মকেন্দ্রিক মনোভঙ্গি বাঙালীর জীবনদৃষ্টিকে বহির্জগৎ থেকে টেনে এনে সীমিত পরিমণ্ডলের মধ্যে রেখে দিয়েছে। স্যার মেটকাফ স্বনির্ভর বাংলার গ্রাম্যসমাজকে 'ছোট ছোট গণরাষ্ট্র' বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর অভিমত- 'তাদের যা প্রয়োজন সবই তারা নিজেরাই সরবরাহ করে, বাইয়ের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে হয় না। তারা সম্পূর্ণ স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তা বিশিষ্ট। রাজ্য ভাঙে গড়ে, বিপ্লবের পর বিপ্লব আসে, হিন্দু, পাঠান, মোগল, ইংরেজ সফলের প্রস্তুত্ব একে একে প্রতিষ্ঠিত হয়, চারিদিকেই পরিবর্তনের স্রোত বয়ে যায়, কিন্তু গ্রাম্য সমাজের কোন পরিবর্তনই হয় না।' কার্ল মার্কস্ এশিয়ার সমাজের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সাধারণভাবে যে সন্তব্য করেছেন, বাংলার গ্রাম্যসমাজ সম্বন্ধেও তা সম্পূর্ণ খাটে। তিনি লিখেছেন- 'ভেঙ্গে গেলেও এই গ্রাম্যসমাজ আবার ঠিক একই জায়গায় একই বৈশিষ্ট্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। মেঘাচ্ছন্ন রাজনৈতিক আকাশের ঝড়ঝঞ্ঝার নীচে এশিয়াটিক সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো অসাড় অচেতন হয়ে থাকে।' ইংরেজ প্রতুত্ব সম্বন্ধে

বিনয় ঘোষ বলেছেন, ভারতীয় সভ্যতার তুলনায় ইউরোপীয় সভ্যতার মান উন্নত ছিল বলে এযুগে বাঙালীষ আর্থনীতিক ও সামাজিক জীবনে পরিবর্তন এসেছিল। কিন্তু এটি বাংণিক সত্য, সমগ্র বাংলার গ্রামজীবন ও সমাজের ক্ষেত্রে সত্য নয়। কারণ ইংরেজের অপরিমিত শোষণনীতির ফলে গ্রামশিল্পের এবং কৃষিজীবনের মারাত্মক ক্ষতি হয়েছিল। রাজধানী ও কতিপয় শিল্পকেন্দ্র ছাড়া দেশের সর্বত্র শোচনীয় দূৰবস্থা অব্যাহত ছিল। ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাব কৃষক সমাজের প্রতিনিধি হাশেম শেখ ও রামা কৈবর্তের কে নগ্ন চিত্র তুলে ধরেছেন,ও তার একশো বছব পরেও তাদের বংশধরের যে বেশী পরিবর্তন হয়নি তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। হাঁটু অবধি কাদামাটিতে হীনবল দুটি গরু নিয়ে হিন্দু নমঃশূদ্র ও মুসলমান কৃষক আজও লাঙল ঠেলে শস্য ফলায়, কিন্তু দুবেলা পেট ভরে খেতে পায় না। গ্রাম্যচাধীর কৃষিপদ্ধতিতেও বড় রকমের পরিবর্তন সাধিত হয়নি। অধুনা সার, সেচের ব্যবস্থা হয়েছে বটে, কিন্তু তার সুযোগ দেশের ক'জনে পায়। অধিকাংশ স্কুলে আগের নিয়মেই চাষাবাদ চলে আসছে। বাংলার কুটিরশিল্প বা হস্তশিল্প ছিল নিজস্ব প্রয়োজনের জন্য। কুটীর শিল্পী বলতে যাদের বুঝায় অর্থাৎ তাঁতী, জোলা, কামার, কুমার, ছুতার, চাঁমার, সেকরা প্রভৃতি সকলেই সরাসরি কৃষকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। চাষী ক্ষেতের তুলা দিয়ে জোলার কাছ থেকে বস্ত্র নিয়েছে, ফসলের বিনিময়ে কামারের কাছ থেকে চাষের যন্ত্রপাতি, কুমারের কাছে হাঁড়িপাতিল, ছুতারের কাছে গাড়ি-পাপ্তি, যেকরার কাছে গহনাপত্র নিয়েছে। এক কথার, তারা পরস্পর পরস্পরের উৎপাদন বিনিময়ে জীবন নির্বাহ করত। এর ফলে গ্রামজীবনের সীমানা প্রায় নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল, যার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং আয়কেন্দ্রিকতা।

বৃত্তির দিক দিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক আছে। কৃষিজীবী জনগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ। অন্যান্য পেশাজীবীর মধ্যে আছে মাঝিমাল্লা, জেলে, জোনা, ফামায়, কুমার, চুতার, সেকরা, কাঁসারী, চুনারী, তেলী, বালী, গোয়ালা, বয়রা, ফাছায়, কাঠুরে, ঘরামী, পটুয়া, বারুই, বেদে, দজি, কবিরাজ, কসাই, যোপা, নাপিত, ডোম, চামার ইত্যাদি। এরা নিজ নিজ ভূমিকা পালন করে সমধ্য সমাজদেহকে সজীব ও সচল করে রেখেছে। এদের সকলের জীবনের মান, রুচি, ভাব-ভাবনা, আচার-আচরণ এক নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে বেশ পার্থক্য আছে। বিশেষতঃ সাংস্কৃতিক জীবনে পার্থক্য রেখাটি বেশ স্পষ্ট। সকলের সামাজিক মর্যাদা সমান নয়। বৈবাহিক সম্পর্কে তার। বিচ্ছিন্ন। কৃষক-মজুর ক্ষেতে কাজ করতে করতে যে সারি গায়, তার সুরু ও ভাব এবং মাঝিমাল্লা দাঁড় টানার সময় যে সারি গায়, তার সুর ও ভাষা এক নয়। অথচ উভয়ই কর্মসংগীত। গাড়োয়ানের ভাওয়াইয়ার সুর ও ভাব এবং নৌকা-মাঝির ভাটিয়ালীর সুর ও ভাব এক নয়। গাড়োয়ান ভাটিয়ালী গায় না, মাঝি ভাওয়াইয়া গায় না। বৈষ্ণব বৈবাগীর ভজনগান, মুসলমান ফকিরের মারফতী গান, বাউলের মরমীগান এক শ্রেণীর নয়। অথচ তার। সবাই ভিক্ষোপজীবী। জেলের যন্ত্রপাতি-সাজসরঞ্জাম ও জোলার যন্ত্রপাতি-সাজসরঞ্জাম এক নয়। তাদের তুলনায় কৃষকের ব্যবহারিক যন্ত্র- পাতি ও সাজসরঞ্জাম আবার সম্পূর্ণ ভিন্ন। কামার, কুমার, ছুতার, সেকর। এরা সকলেই কারিগর, এদের ব্যবহারিক যন্ত্রপাতি এবং শিল্পবস্তু ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য বহন করে। তেলীর সমস্যা ও মালীর সমসা এক নয়। সুতরাং জীবিকার এক এক ধারা অনুযায়ী সংস্কৃতির ভিন্ন ভিন্ন উপাদান। অবশ্য গ্রামবাংলায় সামাজিক জীবনে এ বিভেদ থাকলেও কোখাও বিরোধ নেই। ব্যবহারিক জীবনে তার। পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে জড়িত, স্বার্থসংশ্লিষ্ট। একের আনন্দ সমাজের আনন্দ, একের অভাব সমাজের অভাব। সমন্বয়ের ধর্ম বাংলার লোকজীবন ও লোক-সংস্কৃতির ধর্ম। দেশের জীবন, জীবিকা ও জলবায়ুতে এ সমন্বয় ও স্বচ্ছন্দতার গুণ আছে।

এই আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে বাংলার লোকসংস্কৃতিতেও বিভিন্ন সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটেছে। বিশেষ করে কৃষিকাজ ও কৃষকজীবনের ক্ষেত্রেই মিশ্রণ বেশি হয়েছে। ধর্ম, মত ও পথ নির্বিশেষে যুগযুগ ধরে বিভিন্ন বর্ণ ও পেশার মানুষের একত্র বসবাস ও পরস্পর ভাবের আদান-প্রদানের ফলে গ্রামীণ জীবনে বিরোধ অপেক্ষা ঐক্যের সুরই বেশি ধ্বনিত হয়েছে। এজন্য ভারতীয় সংস্কৃতির মতো বাংলার লোকসংস্কৃতিতেও বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের প্রতিফলন ঘটেছে এবং এর মধ্যেই বাঙালির জাতিগত পরিচয় নিহিত রয়েছে।

লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যের আলোচনায় এ সামগ্রিকতাও একটা বিষয় স্পষ্ট যে এর সঙ্গে সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, ভূগোল, নৃতত্ত্ব, সাহিত্য ইত্যাদি বিভিন্ন বিদ্যাশৃঙ্খলার সরাসরি যোগ রয়েছে। এককথায় বলা যায়, লোকসংস্কিতি ও লোকসাহিত্য একটি জাতির সামগ্রিক ইতিহাসকে নিজের মধ্যে ধারণ করে রাখে। সুতরাং এর অধ্যয়ন প্রক্রিয়াটাও বিজ্ঞানসম্মত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। লোকসংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও অধ্যয়ণ যথাযথ ও বিজ্ঞানসম্মত হলে তবেই লোকসংস্কৃতি চর্চার মূল উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে। এর জন্য লোকসংস্কৃতির গবেষককে ক্ষেত্রসমীক্ষা ও লোকসংস্কৃতি অধ্যয়নের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলোর সম্যক ধারণা থাকা খুবই জরুরী।

নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতি: লোকসংস্কৃতির বিচার বিশ্লেষণে উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হচ্ছে নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতি। কারণ নৃতাত্ত্বের সঙ্গে লোকসংস্কৃতির একটা বিশেষ যোগ রয়েছে। মানবগোষ্ঠীর বিবর্তন নৃতাত্ত্বিক বিষয়। আর এই বিবর্তনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন পর্যায়। অর্থাৎ যে পদ্ধতিতে নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে লোকসংস্কৃতির বিশ্লেষণ করা হয় তাকেই নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতি বলা যায়। সার্বিক আলোচনায় দেখা যায় লোকসংস্কৃতি এমন একটা বিষয় যার সঙ্গে আমাদের বিদ্যায়তনিক ও অবিদ্যায়তনিক প্রায় সব বিষয়েরই যোগ রয়েছে। লোকসংস্কৃতির অধ্যয়ন আমাদের একটা সমাজ সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ ধারণা গড়ে তুলতে সাহায্য করে। লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞা ও স্বরূপ নিয়ে যেমন মতানৈক্যের শেষ নেই; তেমন এর শাখা প্রশাখায়ও বৈচিত্রের শেষ নেই। এই বৈচিত্রময় বিষয়ের অধ্যয়ন যে সাদামাটা হবে না তা বলাই বাহুল্য- তাই এর অধ্যয়নেও রয়েছে বিচিত্র সব তত্ত্ব ও পদ্ধতি এককথায় বলা যায়, সমাজকে নিবিড়ভাবে আত্মস্থ করতে হলে যে বিষয়ের অধ্যয়ন প্রয়োজন তা হচ্ছে লোকসংস্কৃতি।

"Tradition as a general term refers to the customs, rituals, belief, folklore, habits in a given ethnic group. When we speak about culture, the usual key concept is still on tradition because of the universality of the concept on the social experiences derive from that community."

একথা অবশ্যই উল্লেখ্য 'Folk' একটি সমাজতাত্ত্বিক ভাবনা (Sociological কনসেপ্ট) । সহজ ভাষায় Folk tradition বলতে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর চিন্তাভাবনা, আদর্শ, অভ্যাস, কার্যকলাপ সবকিছুকে একত্রে বোঝানো হয়ে থাকে। অ্যালেন ডান্ডেস এর মতে দুই বা তার বেশী মানুষ যখন কোনো অভ্যাস বা রীতি অনুসরণ করে তখনই গোষ্ঠীগত মনোভাব সৃষ্টি হয়ে থাকে। খুব স্পষ্টত না হলেও Folk অনেকক্ষেত্রেই রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিষয়গুলির দিকেও ইঙ্গিত করে থাকে। যেমন অনেকসময় বিভিন্ন লোকরীতির আলোচনায় আমরা কৃষিজীবনের উল্লেখ পেয়ে থাকি। আবার সংস্কৃতিকে অনেকসময় দুভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে যথা: elite culture এবং folk culture। তো বলাবাহুল্য, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বিষয় লোকসংস্কৃতির আলোচনায় চলেই আসে।

কোনো একটি লোকসংস্কৃতিকে বোঝার ক্ষেত্রে সেখানকার আর্থ-সামাজিক পরিবেশকে বোঝাটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। জাতিগত সম্প্রদায়ের সামাজিক কার্যকলাপ এবং অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে তাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব। সামাজিক সত্তা সামাজিক মডেল প্রদান করে যা মূলত পরিবার এবং পারিপার্শ্বিক সমাজ দ্বারা নির্ধারিত হয়। ব্যক্তি তার সামাজিক কার্যকলাপ এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তার ভাষা, রীতিনীতি, ঐতিহ্য, আচার-আচরণ এবং অন্যান্য ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখে।

Unit-3: Theory of multi linear evolution of folk culture.

Multi Linear Evolution হল সমাজ ও সংস্কৃতির বিবর্তন সম্পর্কে বিংশ শতকে প্রচলিত একটি সামাজিক তত্ত্ব। এটি বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী এবং নৃতাত্ত্বিকদের দ্বারা বিভিন্ন তত্ত্বের সমন্বয়ে গঠিত। এই তত্ত্বটি উনিশ শতকের পুরানো Unilineal Evolution কে প্রতিস্থাপন করেছে, যেখানে বিবর্তনবাদীরা সাধারণীকরণ (Generalization) করতে গভীরভাবে আগ্রহী ছিলেন।

যখন ধ্রুপদী সামাজিক বিবর্তনবাদ সমালোচিত হয়, তখন আধুনিক নৃতাত্ত্বিক এবং সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতিগুলি ধ্রুপদী সামাজিক বিবর্তনবাদের সমালোচনায় রত হয়। উল্লেখ্য, আধুনিক তত্ত্বগুলি উৎস বা source কে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে এবং তথ্যহীন জাতিকেন্দ্রিক অনুমান, তুলনা বা মূল্যায়ন করা থেকে বিরত থাকে। কমবেশি ব্যক্তি সমাজকে তাদের নিজস্ব ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের মধ্যে বিদ্যমান হিসাবে বিবেচনা করে। এই শর্তগুলি সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতা (cultural relativism) এবং Multilinear Evolution এর মতো নতুন তত্ত্বগুলির জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করে, যা সংস্কৃতির সাধারণীকরণ (Generalization) এবং বিবর্তনের অনুমানমূলক পর্যায়গুলির সমালোচনা করে।

1940 সালের দিকে, বেশ কিছু আমেরিকান নৃতত্ত্ববিদ একটি সংখ্যা একরৈখিক বিবর্তনবাদ (Unilinear Evolution) এবং সর্বজনীন বিবর্তনবাদের (Universal Evolutionism) ধারণাগুলি প্রত্যাখ্যান করতে শুরু করে এবং বহুরৈখিক বিবর্তনবাদের (Multilinear Evolution) ধারণার দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী সংস্কৃতি কোনো নির্দিষ্ট একটা পথ নয় বরং একাধিক ভিন্ন ভিন্ন পথের সমন্বয়ে গঠিত হয়।

বিংশ শতকের মধ্য থেকেই নৃতত্ত্ববিদরা সংস্কৃতির সাধারণীকরণ (সকল জনগোষ্ঠীর একধরণের সংস্কৃতি বিদ্যমান) এর তীব্র বিরোধীতা এবং সমালোচনা করতে শুরু করেন। উল্লেখ্য, নৃতত্ত্ববিদরা জায়গা এবং সময়ের বিচারে এককীট সংস্কৃতিকে পর্যবেক্ষণ করার কথা বলেন। লেসলি হোয়াইট "আদিম" এবং "আধুনিক" সমাজের মধ্যে বিরোধিতাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। হোয়াইট বিশ্বব্যাপী চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করলেও জুলিয়ান স্টুয়ার্ডের মতো নৃবিজ্ঞানীরা আরও সীমিত, বহুরৈখিক কৌশল ব্যবহার করতে পছন্দ করেছিলেন। স্টুয়ার্ড উনিশ শতকের অগ্রগতির ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং এর পরিবর্তে ডারউইনের "অভিযোজন" ধারণার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন, এই যুক্তি দিয়ে যে সমস্ত সমাজকে তাদের পরিবেশের সাথে কোনো না কোনোভাবে মানিয়ে নিতে হবে, কিন্তু প্রক্রিয়াটি বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে ভিন্ন হতে পারে। জুলিয়ান স্টুয়ার্ড এভাবে বহুরৈখিক বিবর্তনকে সাংস্কৃতিক বাস্তুশাস্ত্রের ধারণার সাথে যুক্ত করেছেন।

নৃতাত্ত্বিক মার্শাল সাহলিনস এবং এলম্যান সার্ভিস একটি বই লিখেছেন, *Evolution and Culture* , যেখানে তারা হোয়াইটস এবং স্টুয়ার্ডের পদ্ধতির সংশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছিলেন। সাহলিন এবং সার্ভিস এর মতে একটি সমাজ তার habitus, পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি এবং পারিপার্শ্বিক সমাজ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। বলাবাহুল্য, এই পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি এবং সমাজের বিভিন্নতার জন্যই আমরা বিভিন্ন রকম সংস্কৃতির অস্তিত্বও লক্ষ্য করে থাকি।

সাংস্কৃতিক বিবর্তনকে পূর্বে জৈবিক বিবর্তনের (Biological Evolution) মতোই বিবেচনা করা হয়েছিল, কিন্তু অনেক নৃবিজ্ঞানী এই তুলনাটি দ্রুত বাতিল করে দিয়েছিলেন। স্টুয়ার্ড লিখেছেন যে জৈবিক বিবর্তনের বিপরীতে, সাংস্কৃতিক বিবর্তনে এটা ধরে নেওয়া হয় যে বিশ্বের বিভিন্ন অংশের সাংস্কৃতিক নিদর্শনগুলি জেনেটিক্যালি সম্পর্কহীন, অর্থাৎ একটার সাথে অন্যটার হয়তো তেমন কোনো সম্পর্ক নেই কিন্তু প্রতিটি সংস্কৃতিই সমান্তরালভাবে বিবর্তিত হয়ে চলেছে। সাহলিনস এবং সার্ভিসও এই তুলনাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, উল্লেখ করেছেন যে সাংস্কৃতিক ভিন্নতা বিভিন্ন রেখার মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে, যেখানে জৈবিক বিবর্তন হতে পারে না।

Multilinear Evolution তত্ত্ব অনুযায়ী প্রযুক্তিগত উন্নয়নের প্রভাব অনেকাংশেই সাংস্কৃতিক বিকাশকে প্রভাবিত করেছে। এছাড়াও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে অবশ্যই ভিন্ন সংস্কৃতির প্রভাব এর কথাও উল্লেখ করতে হয়। এই অভিযোজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, সংস্কৃতিগুলি "উদ্ভাবন" (Inventions) নামে নতুন বৈশিষ্ট্য তৈরি করে এবং "প্রসারণের" (Diffusion) মাধ্যমে বাইরের সংস্কৃতি থেকে নতুন বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতেও লক্ষ্য করা যায়। একথা অবশ্যই বলতে হয় যে, সমগ্র বিশ্বব্যাপী সকল সংস্কৃতি যে একসাথে পরিবর্তন এবং বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যায় এমন নয় তবে সমগ্র বিশ্বজুড়ে মানুষ বিভিন্ন পরিবর্তন এবং বিবর্তনের সম্মুখীন হয়। 1950 এর দশকের শেষের দিকে, এরিক উলফ এবং সিডনি মিন্টজের মতো স্টুয়ার্ডের ছাত্ররা সাংস্কৃতিক বাস্তুশাস্ত্র থেকে মার্কসবাদ, বিশ্ব সিস্টেম তত্ত্ব, নির্ভরতা তত্ত্ব এবং মারভিন হ্যারিসের সাংস্কৃতিক বস্তুবাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতে প্রায় সকল নৃতত্ত্ববিদরাই উনিশ শতকের unilineal evolution এর তত্ত্বকে অস্বীকার করেছেন। বরং নৃতত্ত্ববিদ, সমাজবিদরা বর্তমানে পারিপার্শ্বিক সমাজ, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং তার প্রভাবকেই গুরুত্ব দিয়েছেন সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে। ফলস্বরূপ, বর্তমানে 'সাংস্কৃতিক বিবর্তন'-এর সরল ধারণাটি কম উপযোগী হয়ে উঠেছে এবং সংস্কৃতি ও পরিবেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আরও সূক্ষ্ম পদ্ধতির একটি সম্পূর্ণ সিরিজের পথ দিয়েছে। উন্নয়ন অধ্যয়নের ক্ষেত্রে, অমর্ত্য সেনের মতো লেখকরা 'উন্নয়ন' এবং 'মানব বিকাশ' সম্পর্কে একটি বোঝাপড়া তৈরি করেছেন যা উন্নয়নের সরল ধারণাকেও সমালোচনার সম্মুখীন করেছে।

বার্মিংহাম স্কুল এর মতে, উচ্চ-সম্ভ্রান্ত সংস্কৃতির (Elite Culture) এর পরিবর্তে দেশের জনসাধারণ লোকসংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে এবং লোক সংস্কৃতি ও সাধারণ মানুষের মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে তা অনেকসময় বৈদেশিক কোনো সংস্কৃতিকেও উদ্বুদ্ধ এবং তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেশের লোক সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার জন্য।

2000 সাল থেকে লোকসংস্কৃতিতে নিয়ে একাধিক গবেষণা হয়েছে এবং সংগৃহিত ৮৩ টি নিবন্ধের মধ্যে প্রায় প্রতিটিতেই রন্ধনপ্রণালী, উপভাষা, বিবাহ, লোক উৎসব সম্পর্কে বিস্তারে আলোচনা করেছে। । এটা বোধগম্য যে বেশিরভাগ গবেষণা হয়েছে এই শতাব্দীর প্রথম দশকেও লোকসংস্কৃতির সুরক্ষা ও বিকাশের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। তবে বর্তমানের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, বিশ্বায়নের যুগে লক্ষ্য রাখা উচিত কীভাবে অন্য সংস্কৃতি একটি সংস্কৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

An Introduction to Anthropology
Dr Priobroto Nath Lokosongoskriti o Lokosahityo: Songya o Sworup: Tottwo o Poddhoti

Dr Wakil Ahmed, Banglar Lok Songroskriti

SU Rui, ZHAO Yingdi, The Multilinear Evolution of Folk Culture: Rendition and Diffusion

The Sociological Perspective of Tradition, Folkways, Beliefs, and Transculturalism

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

1. Asutosh Bhattachryya, Banglar Lok Sanskriti
2. Barun Chakraborty, Lok Sankskriti Kosh
3. Dr Priobroto Nath Lokosongoskriti o Lokosahityo: Songya o Sworup: Tottwo o Poddhoti
4.Dr Wakil Ahmed, Banglar Lok Songroskriti
5. SU Rui, ZHAO Yingdi, The Multilinear Evolution of Folk Culture: Rendition and Diffusion

সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী:

1. Write an essay on the rural landscape of Bengal.
2. Discuss different anthropological and sociological ideas related to folk tradition.
3. What is the Multi Linear Evolution?

Block 2

Folk Customs and Tradition in Rural Bengal

Unit 4: Puranas and Folktales

Unit 5: Folk Literature

Unit 6: Folk Festivals

উদ্দেশ্য:

এই পর্যায়টি অধ্যয়ন করে আপনি জানতে পারবেন:

১. পুরাকথা এবং পুরাণ সম্পর্কে

২. বাংলা লোকসাহিত্য সম্পর্কে

৩. গ্রামবাংলার লোক উৎসব সম্পর্কে

Unit 4: Puranas and Folktales

ব্রহ্মাণ্ড

বিশ্বের সৃষ্টি কি ভাবে হলো, আদিম মানব তা ভেবে বিস্ময় বোধ করেছে। যে যুগে সৃষ্টি-রহস্যের কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কারও জানা ছিল না, সেই যুগে মানুষের মন নান। অবৈজ্ঞানিক উপায়ে তার ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছে। বিশ্ব সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে কি অবস্থা ছিল, সে কথা ভেবে বাংলার সাধারণ মানুষ একদিন মনে করেছিল:

নহি রেখ নহি রূপ নহি ছিল বল্লচিন। রবি শশী নহি ছিল নহি রাতিদিন। নহি ছিল জলস্থল নহি ছিল আকাশ। মেরুমন্দার নহি ছিল না ছিল কৈলাস ॥ নারি ছিল সৃষ্টি আর না ছিল চলাচল। দেহারা দেউল নহি পর্বত সকল ॥ দেবতা দেহারা না ছিল পূজিবাক দেহ। মহাশূন্য মধ্যে পরভূর নহি আর কেহ । ঋষি যে তপস্বী নহি নহিক ব্রাহ্মণ। পাহাড় পর্বত নহি স্থাবর জঙ্গম।

প্রভু (নিরঞ্জন অথবা তিনি ধর্ম বলেও পরিচিত, তিনি স্পষ্টতই সূর্যদেবতা) মহাশূন্যের উপর অবতরণ করলেন এবং বিশ্ব সৃষ্টি করতে মনস্থ করলেন। মহাশূক্ষ্ম থেকে প্রথমেই প্রভু বায়ু সৃষ্টি করলেন। তিনি বুদবুদের উপর আসন গ্রহণ করলেন, কিন্তু বুদবুদ তার ভার ধরে রাখতে পারল না, বরং ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। তখন আমার মহাপ্রভু মহাশূন্সে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর নিজের কায়া নির্মাণ করলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ দৃষ্টিশক্তিহীন নিরাকার পুরুষের রূপে পুনর্জন্ম গ্রহণ করলেন। তার নিরাকার দেহ থেকে নিরঞ্জনের জন্ম হলো। তিনি চৌদ্দ যুগ (168 বছর) তপস্যায় নিমগ্ন রইলেন। তপস্যার শেষে তার শ্রম লাঘব করবার জন্য এক হাই তুললেন। সেই হাই থেকে উল্লুকের (পেঁচা) জন্ম হলো। জন্ম মাত্র উলুক মহাশূন্নে উড়ে বেড়াতে লাগল। নিরঞ্জন তাকে থামতে বললেন। সে যখন থামল, তখন তার প্রভু তাকে তাঁর বাহন হবার জন্ম আদেশ করলেন। উলুক রাজি হলো। এইভাবে উলুকের উপর আসন করে তিনি পুনরায় দীর্ঘ তপস্যায় নিযুক্ত হলেন। উলুক ক্ষুধায় এবং তৃষ্ণায় পরিশ্রান্ত এবং ক্লান্ত হয়ে পড়ল। প্রভুর কাছে সে খাদ্য দিয়ে তাকে

বাঁচানোর জন্ম প্রার্থনা করল। প্রভু বললেন, এখন পর্যন্ত কোনও জীবের জন্ম হয়নি, তোমাকে কোথা থেকে খাদ্য দেব? উলুক বলল, তোমার মুখের অমৃত দিয়ে আমার প্রাণ রক্ষা কর।

প্রভু তাই করলেন। যখন তিনি তাঁর মুখ থেকে অমৃত দিতে যাচ্ছিলেন, তখন তা থেকে কয়েক ফোঁটা অমৃত নীচে পড়ে গেল। তা থেকে জলের সৃষ্টি হলো। তারপর মহাপ্রভু উলুকের পৃষ্ঠে আসন করে অনন্ত জলরাশির উপর ভাসতে লাগলেন। উলুক তার ভার শেষ পর্যন্ত আর বইতে পারল না, জলে ডুরে যেতে লাগল। তার গা থেকে একটি পালক খসে পড়ল এবং তা থেকেই রাজহংসের জন্ম হলো। মহাপ্রভু রাজহংসের পৃষ্ঠে এবার আসন স্থাপন করলেন। তাঁর ভার বেশীক্ষণ বইতে না পেরে রাজহংস মহাপ্রভুকে নিজের পিঠ থেকে জলের উপর ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেল। এবার উলুক প্রভুকে বিশ্ব সৃষ্টি করবার পরামর্শ দিল। কারণ, তার পক্ষে এভাবে জলের উপর ভেসে বেড়ানো ঠিক হয় না।

প্রভু বললেন, পৃথিবী এখনো নির্মাণ করা হয়নি, বিশ্ব সৃষ্টি করে আমি কোথায় রাখব? উলুক প্রভুর সোনার পৈতা প্রভুকে জলের উপর নিক্ষেপ করতে বলল। প্রভু তাই করলেন, তা থেকে বাসুকির জন্ম হলো, বাসুকির এক হাজার ফণা। বাসুকি ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ল, কিন্তু কোনো খাদ্য খুঁজে পেল না। তখন বাসুকি তাঁর বাহন সহ প্রভুকেই গিলে খাবার জন্য ছুটল। ক্রুদ্ধ বাসুকির কাছ থেকে উভয়েই পালিয়ে বাঁচল।

প্রভু ভাবলেন, বাসুকির জন্য খাদ্য কোথায় পাই? তাঁর বাহন উলুক বলল, আপনার কানের বালা জলের মধ্যে ফেলে দিন। তিনি তাই করলেন এবং তা থেকে সাপের খাবারের জন্য ভেকের জন্ম হলো। খাদ্য খেয়ে ক্ষুধা দূর করে বাসুকি তার সহস্র ফণা প্রভুর মাথার উপর বিস্তার করে দাঁড়াল। প্রভু তাঁর গা থেকে কিছু ময়লা নিয়ে তা বাসুকির মাথার উপর স্থাপন করলেন। এইভাবে বাসুকির মাথার উপরে প্রভু পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। পৃথিবী দিন দিন আয়তনে বাড়তে লাগল, দেখে প্রভুরও আনন্দ আর ধরে না।

কালক্রমে প্রভু তাঁর নিজের গায়ের ঘাম থেকে আদ্যাশক্তির সৃষ্টি করলেন। তিনি আদ্যাশক্তিকে তাঁর কন্যারূপে গ্রহণ করলেন। তাকে একাকিনী রেখে প্রভু তাঁর বাহনটি নিয়ে তপস্যা করতে চলে গেলেন। তিনি বল্লুকা নদীর সৃষ্টি করে তার তীরে তপস্যায় মগ্ন হলেন।

যুগের পর যুগ কেটে যেতে লাগল। প্রভু আদ্যাশক্তির কোনো সংবাদ নিলেন না। এদিকে আদ্যাশক্তির বয়স হলো। তাঁর মনের বাসনা থেকে কামদেবের জন্ম হলো। তিনি তারই মাধ্যমে তার পিতার ফিরে এলেন, কিন্তু আদ্যাশক্তির কাছে ফিরে আসবার জন্ম বলে পাঠালেন। প্রভু বিয়ের বয়স হয়েছে দেখে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তার জন্য বর কোথায় পাবেন? তিনি আদ্যাশক্তিকে আরো কিছুকাল অপেক্ষা করতে বলে আবার বজ্রকা তীরে রওনা হলেন। যাবার সময় তিনি এক পাত্রে মধু ও আর এক পাত্রে বিষ রেখে গেলেন। আদ্যাশক্তি প্রভুকে জিজ্ঞেস করলেন, এ নিয়ে আমি কি করব?

প্রভু বললেন, এ নিয়ে তোমার যা খুসী ভাই কর।

বাহনে আরোহন করে প্রভু বজ্রকা নদীর তীরে চলে এলেন। আবার সময় কেটে যেতে লাগল, তিনি তাঁর করার নিকট আর ফিরে যান না। ক্রমে আদ্যা- শক্তির যৌবন তার কাছে দুঃসহ বলে বোধ হলো, তাই প্রাণত্যাগ করবার ইচ্ছা করলেন। প্রভু যে তার জন্য বিষ রেখে গিয়েছিলেন, তাই পান করলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যু হলো না, বরং তার পরিবর্তে তিনি গর্ভবতী হলেন। যথাসময়ে তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই তিন জনের জন্মদান করলেন। তাঁরা জন্মান্ত হলেন। জন্ম মাত্র তাঁরা কারণ সমুদ্রের তীরে গিয়ে তপস্যায় মগ্ন হলেন। প্রভু তাঁদের ভক্তির আন্ত- রিকতা পরীক্ষা করতে চাইলেন। তিনি শবরূপ ধারণ

করে ভাসতে ভাসতে একে একে প্রত্যেকের সামনে এলেন। ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু দুর্গন্ধ শব দেখে মুখ ফিরিয়ে নিলেন, কিন্তু শিব তা জল থেকে তুলে নিয়ে কাঁধে করে নাচতে লাগলেন।

প্রভু তাঁর উপর প্রসন্ন হলেন এবং পুরস্কারস্বরূপ তাঁকে দৃষ্টিশক্তি দান করলেন, উপরন্ত তাঁকে অতিরিক্ত আরো একটি চোখ দিলেন। শিবের অনুরোধে প্রভুর দয়ায় ব্রহ্মা। এবং বিষ্ণুও দৃষ্টি শক্তি লাভ করলেন। তাঁরা সকলে এবার আদ্যাশক্তির কাছে ফিরে চললেন। প্রভু ব্রহ্মাকে সৃষ্টি নির্মাণ করবার জন্য বললেন, বিষ্ণুকে তা পালন করবার ভার দিলেন, প্রয়োজনবোধে শিবকে তা ধ্বংস করবার পরামর্শ দিলেন। এবার প্রভু আদ্যাশক্তির দিকে তাকিয়ে বললেন মানুষ সৃষ্টি করতে এবার মনো- যোগী হও। তিনি আদ্যাশক্তিকে বললেন, তুমি পুনর্জন্ম গ্রহণ কর, এবং প্রত্যেক জন্মে মহেশ (শিব) তোমাকে বিয়ে করবে। তা থেকে তুমি সন্তানের জন্ম দেবে। এইভাবে শিব এবং আদ্যা মিলনে পৃথিবীতে মানুষের জন্ম হলো।

সূর্য

ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যক্ষগোচর নৈসর্গিক বস্তুগুলোর মধ্যে সূর্যই সর্বাপেক্ষ। উজ্জ্বল। তাই সূর্য পৃথিবীর সভ্য এবং অসভ্য নিরপেক্ষ সকল জাতির লোক সংস্কৃতিতেই এক প্রধান অংশ গ্রহণ করে আসছে। ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে সূর্য সম্পর্কিত বিভিন্ন ধ্যান-ধারণা বিভিন্ন বহিরাগত জাতির মাধ্যমে এদেশে প্রচারিত হয়েছে, এই সকল বিভিন্ন ধ্যান- ধারণা পরবর্তী কালে ভারতীয় মতাদর্শকেও প্রভাবিত করেছে। বাংলায় সূর্যদেবতা বিভিন্ন নামে উপাসিত হয়ে আসছেন। যেমন, ধর্ম, ইতু, রাল-দুর্গা যে গ্রামে জনসাধারণের পূজো দেওয়ার জন্য স্থায়ী মন্দির তৈরী আছে, সেখানে সাধারণের জন্য দৈনিক পূজো হয়। কোন কোন গ্রামবাসীর ব্যক্তিগত গৃহেও দৈনিক পূজো হয়, সেখানে জনসাধারণের কোন অধিকার থাকে না; তাতে দেবতা কূল-দেবতার স্থান অধিকার করে থাকেন। এই ধরণের পূজোর জন। বিশেষ কোনো বিধি নেই, যে যাঁর কৌলিক বা স্থানীয় প্রথা অনুযায়ী পূজো করে থাকেন।

নৈমিত্তিক অথবা বাৎসরিক পূজো বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে গ্রীষ্মকালের মধ্যে যে কোন পূর্ণিমায় বা সংক্রান্তিতে হয়ে থাকে এবং দু একটি বিশেষ ক্ষেত্রে আষাঢ় সংক্রান্তিতেও হয়। ধর্মরাজ ঠাকুরের বাৎসরিক পূজো করবার সঙ্গে সঙ্গে এই উপলক্ষে সর্বত্র গাজন উৎসবও অনুষ্ঠিত হয়। তিন দিন ধরে উৎসব চলতে থাকে। তার মধ্যে যে সব আচার পালন করা হয়, তাতে ধর্মঠাকুরের আনুষ্ঠানিক স্নান একটি প্রধান আচার। অনুকারী ইন্দ্রজাল-এর (sympathetic magic) তা একটি উল্লেখ-যোগ্য দৃষ্টান্ত। কারণ, তার মধ্যে সূর্যদেবতার প্রতীককে আনুষ্ঠানিক ভাবে জলে ডুবিয়ে মনে করা হয় যে তার ফলেই বৃষ্টির আর বিলম্ব হয় না। কারণ, গ্রীষ্মকালে সূর্যদেবতার পূজো করবার উদ্দেশ্যই হল কৃষিকার্যের জন্য বৃষ্টিপাত ত্বরান্নিত কর।।

ধর্মঠাকুরের বাৎসরিক বা নৈমিত্তিক পূজো প্রকৃত অর্থেই বারোয়ারী পূজো। গ্রামবাসীরা পূজোর ব্যয়ভার মেটানোর জন্য প্রত্যেক গৃহ থেকেই চাঁদা তোলে। উৎসবে আনুষ্ঠানিকভাবে আচার পালনের জন্য যারা যোগদান করে তাদের সন্ন্যাসী বা ভক্ত্যা বলা হয়, অনুষ্ঠানের আচার কোন কোন সময় অত্যন্ত জটিল এবং ব্যাপক হয়ে উঠে। পূর্ববর্তী বৎসরে সন্ন্যাসীরা কোন কারণে এই ব্যাপারে দেবতার নামে মানসিক করে স্বেচ্ছায় এই দায়িত্ব গ্রহণ করে।

আরো এক ভাবে সূর্যদেবতা ধর্মঠাকুরের পূজো হয়ে থাকে, তার নাম 'ঘরভরা'; তাকে সংস্কৃত করে 'গৃহভরণ'-ও বলা হয়। এই অনুষ্ঠান বৎসরের যে কোনো শুভ-দিনে (গ্রীষ্মকাল হলেই ভালো হয়) কোনো ব্যক্তি বিশেষের মানসিক থাকলে তা পূরণ করার উদ্দ্বেন্দ্বেই অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠান যেমন আড়ম্বরপূর্ণ তেমনই ব্যয়সাধ্য। বারো দিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠান

চলতে থাকে, প্রত্যেকটি দিন এক একজন আদিত্যের বা সূর্যের উদ্দেশ্যে পূজো হয়ে থাকে। অর্থনৈতিক কারণে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হতে এখন আর বড় দেখা যায় না।

যে কোনো উপায়েই ধর্মঠাকুরের পূজো হোক না কেন, তাঁর নিম্নোদ্ধৃত ধ্যান মন্ত্রটি সর্বক্ষেত্রেই উচ্চারণ করা হয়ে থাকে-

ব্যাস্তো নাদিমধ্যো ন চ করচরণৌ নাস্তিকায়ো ন নাদঃ।

নাকারো নৈবরূপং ন চ ওয় মরণে নাস্তি জন্মাদি যস্য।।

যোগীন্দ্রৈধ্যানগমাং সকল জনময়ং সর্বলোকৈকনাথম।

ভক্তানাম কামপূরং সুরনরবরদং চিন্তয়েৎ শূন্যমূর্তিম।।

অর্থাৎ-শূন্যমূর্তিকে ধ্যান করতে হবে এই ভাবে যে, তাঁর কোন আদি নেই, মধ্য নেই, অন্ত নেই; তার কোন হাত নেই, পা নেই, তার কোন অবয়ব নেই, তাঁর কোন শব্দ নেই, কোন রূপ নেই, কোন আকার নেই, তাঁর জন্ম নেই, তাঁর মৃত্যু নেই, তিনি শ্রেষ্ঠ যোগীদের কেবলমাত্র ধ্যান দ্বারা লভ্য; তিনি সর্বব্যাপ্ত, তিনি সমগ্র পৃথিবীর প্রভু, তিনি ভক্তদের মনের অভিলাষ পূর্ণ করে থাকেন এবং তিনি দেবতা ও মানুষকে বরদান করে থাকেন। ধর্মঠাকুরের পরম্পরাগত নিরক্ষর ডোম পুরোহিতরা প্রাচীন ও অপ্রচলিত বাংলা ভাষায় নিম্নলিখিত যে ধ্যানমন্ত্রটি উচ্চারণ করে থাকেন, তার অর্থ এই-

হে ভগবান অর্ক: (সূর্য),

তোমার কোনো আকার নেই, রূপ নেই, তুমি সূর্যের মধ্যে প্রকাশিত হও, তুমি একগুচ্ছ চম্পক ফুলের মত। তুমি আকাশে সমাসীন, তোমার ভক্তের প্রার্থনায় তুমি সাড়া দাও। তুমি সর্বশুক্ল সর্ব পবিত্র তোমার আত্মা ও কৃষ্ণের আত্মা অভিন্ন।

ধর্মঠাকুরের নৈমিত্তিক কিংবা বিশেষ গৃহভরণ উৎসবে তার মাহাত্ম কীর্তন করে যে দীর্ঘ কাহিনীটি গাওয়া হয়, তা সংক্ষেপে এই।

গৌড়ের রাজার একটি যুবতী শ্যালিকা ছিল, তার নাম রঞ্জা। গৌড়রাজ তাকে তাঁর এক অতি বৃদ্ধ সামন্তরাজের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন। রঞ্জা সূর্যদেবতা ধর্ম- ঠাকুরের পরম ভক্ত ছিলেন, তিনি পুত্রবর লাভের জন্য গভীর ভক্তিসহকারে তাঁর পূজো করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি সূর্যদেবতাকে প্রসন্ন করবার জন্য শালে ভর দিয়ে প্রাণত্যাগ করলেন। সূর্যদেব প্রসন্ন হয়ে তাকে প্রার্থিত বর দিলেন। তাঁর আশীর্বাদে তিনি বৃদ্ধ স্বামীর ঔরসে এক পুত্র লাভ করলেন। পুত্রের নাম লাউসেন। তিনি বাল্যকাল থেকেই নির্ভীক শক্তিশালী ও ধর্মঠাকুরের পরম ভক্তরূপে বড় হয়ে উঠতে লাগলেন। গৌড়েশ্বর তাঁকে তাঁর সৈন্স বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করলেন। তিনি কলিঙ্গ ও কামরূপ জয় করলেন এবং পরম বিক্রমের সঙ্গে বহু সংখ্যক বিদ্রোহী সামন্ত রাজাকে দমন করলেন। রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী তাঁকে হিংসা করতেন। তার ফলে সূর্যদেবতা তাকে কুষ্ঠরোগ দিয়ে শাস্তি দিলেন। ধর্মঠাকুরের আশীবাদে লাউসেন সর্বত্র অজেয় হয়ে উঠলেন। তিনি ক্রমে চারটি পত্নী গ্রহণ করলেন। প্রত্যেকটি পত্নীই পরাজিত রাজ্যের রাজকন্যা। একদ। গৌড়ে অবিরাম বৃষ্টিপাত আরম্ভ হল। সমস্ত দেশ জলে ভাসিয়ে নিল। মানুষের দুঃখ-কষ্টের আর সীমা রইল না।। লাউসেন এই বৃষ্টিপাত বন্ধ করবার জন্ম গভীর তপস্যায় আত্মনিয়োগ

করলেন, শেষ পর্যন্ত তার দেহ নয় খণ্ডে খণ্ডিত করলেন। সূর্যদেবতা তাঁর প্রতি প্রসন্ন হলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই বৃষ্টিপাত বন্ধ হয়ে গেল। কর্ণসেনের মৃত্যুর পর লাউসেন সিংহাসনে আরোহন করলেন।

এই কাহিনী অবলম্বন করে মধ্যযুগে এক অতি সমৃদ্ধ আখ্যায়িকা-কাব্য রচিত হয়েছে, তার নাম ধর্মমঙ্গল।

(খ) ইতু-ধর্মঠাকুরের পরেই সূর্যদেবতা হিসাবে গুরুত্বের দিক থেকে ইতুর নাম করতে হয়। সাধারণভাবে মেয়েরা এই পুজো করলেও সারা বাংলায় বিশেষ করে কুমারী মেয়েরাই প্রধানতঃ তার পূজো বা ব্রতের অনুষ্ঠান করে থাকে।

থেকে উদ্ভুত হয়েছে। ইতু শব্দটি সংস্কৃত 'আদিত্য' থেকে আদিত্য অর্থ সূর্য। কার্তিক মাসের সংক্রান্তি থেকে আরম্ভ করে অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রতি রবিবার এই দেবতার পূজো করতে হয়, রবিবার সূর্যদেবের পক্ষে শুভ দিন।

নিম্নলিখিত উপায়ে প্রতি রবিবার এই দেবতার পুজো হয়। চারটি ছোট ছোট মাটির পাত্র একটি বড় পাত্রের উপরে রাখা হয়। বড় পাত্রটি

মাটি দিয়ে পূর্ণ করে দেওয়া হয়। ধান, গম, যব ও অন্যান্য কিছু কিছু খাদ্যশষ্যের বীজ পাত্রটির মধ্যে বপন করা হয়। প্রতি রবিবার খাদ্যশস্যের বীজগুলোর উপর জল ছিটিয়ে দেওয়া হয়। কিছুদিনের মধ্যেই বীজগুলোতে অঙ্কুর উপনাম হয়। মনে করা হয় যে সূর্য যে চারিটি ঋতুর উপর নিজের প্রাধান্য স্থাপন করে, চারিটি ছোট মাটির পাত্র তারই প্রতীক। মৃত্তিকা পরিপূর্ণ বড় পাত্রটি পৃথিবীর প্রতীক। যারা পূজো বা ব্রতে অংশ গ্রহণ করেন, তাঁরা পূজোর মাসে কোনো রবিবারেই চুলে ভেল দেন না, মাছ মাংস খান না। পুজোর মাস শেষ হয়ে এলে ইতুকে বিশেষ ভাবে ভোজ খাওয়ানো হয়, তার নাম সাধ। সাধে পায়েস ও ঘরে তৈরী করা, পিঠে ইতুকে নিবেদন করে দেওয়া হয়।

কি ভাবে ইতুর আশীর্বাদে চরম দারিদ্র থেকে অব্যাহতি পেয়ে এক ব্যক্তি ধন- সম্পদ লাভ করেছিল, ব্রতকথার আকারে রচিত তার এক লোককাহিনী শুনতে পাওয়া যায়। কি ভাবে এই দেবতার পুজো প্রথমে প্রবর্তিত হলো তাও তার মধ্যে জানা যায়।

(গ) মাঘমণ্ডল-বাংলার কুমারী মেয়েদের মধ্যে মাঘমণ্ডল নামে এক সূর্যপূজা বা সূর্যব্রত প্রচলিত আছে, বিয়েতে উত্তম বর ও বিয়ের পর একটি উত্তম ঘর বা পরিবার কামনা করে এই পূজো হয়ে থাকে। সারা মাঘ মাস জুড়েই এই ব্রত হয়। তাই তাকে মাঘমণ্ডল ব্রত বলা হয়, মণ্ডল শব্দের অর্থ গোলাকার পথ, সমস্ত বছর সূর্য এই গোলাকার পথ ধরে ঘুরে আসেন।

কুমারী মেয়েরা অভি অল্প বয়স থেকে এই ব্রত গ্রহণ করে, তাদের পাঁচ বছর পর্যন্ত প্রতি মাঘ মাসে এ ব্রত করতে হয়। পাঁচ বছরের শেষে এই ব্রত আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্যাপন বা সমাপ্ত করতে হয়। মাঘ মাসের প্রতেকদিন এই ব্রত হয়ে থাকে। পাঁচ বছরের মধ্যে মাঘ মাসে প্রতিদিন প্রতিনী বালিকারা অতি ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠে, নিকটবর্তী নদী কিংবা পুকুষ্ঠ ঘাটে যায়। নদীর ধারে জোড় হাতে তারা বসে, হাতে তারা ফুল নিয়ে পরিবারের একজন বয়স্ক মহিলার নেতৃত্বে কতক-গুলো ছড়া সুর করে আবৃত্তি করে। ছড়াগুলোর কোন আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা নেই, বরং তার পরিবর্তে তাদের মধ্য দিয়ে বিবাহিত গার্হস্থ্য জীবনের নানা আশা-আকাঙ্খা রূপায়িত হয়ে থাকে। সূর্যদেবতাকে তাতে একজন পার্থিব মানুষ বলে মনে করে তার জীবনের নানা বাস্তব অনুভূতি, যেমন তার বয়ঃপ্রাপ্তি, তার বিবাহ, তার পুত্রের জন্ম ইত্যাদি বর্ণনা কর। হয়। এই সকল ছড়ার মধ্যে বালিকার ভবিভৎ বিবাহিত জীবন সম্পর্কে নানা অপরিণত আশা আকাঙ্খার চিত্র সুকৌশলে প্রকাশ করা

হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে গুড়াগুলো আবৃত্তি করবার পর পরিবারের বয়স্কা মহিলাসহ কুমারী ব্রতিনীরা বাড়ী ফিরে আসে। বাড়ীর ভিতরের আঙিনায় সূর্যদেবতার আলপনা আঁকা থাকে, ব্রতিনীরা সেখানে এসে বসে এবং সূর্যের মাহাত্ম্য কীর্তন করে আরে। কিছু ছড়া বলে। বাড়ীর সমস্ত ভিতর আঙিনা জুড়ে এক সুবৃহৎ বিচিত্রিত আলপনা আগেই আঁকা হয়ে থাকে। বিভিন্ন রঙের গুড়ো ব্যবহার করে তাকে বিভিন্ন রঙে চিত্র-বিচিত্র করে তোলা হয়। মাঘ মাসে যে দিন সূর্যের উত্তর দিকে যাত্রা আরম্ভ হয়, সেদিন থেকেই এই ব্রত আরম্ভ করতে হয়। সূর্যের সেই গতিকে উত্তরায়ণ বলে। এই উপলক্ষে পূজো শেষ হলে প্রতিদিনই যে একটি ব্রতকথা বলা হয়, তা পার্থিব জীবন রসে ভরপুর।

(ঘ) রাল-দুর্গা- বাংলায় হিন্দু মেয়েদের মধ্যে যে সকল সূর্যের পূজো বা ব্রত প্রচলিত আছে, তাদের মধ্যে রাল-দুর্গার ব্রত অন্যতম। প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাস থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত প্রত্যেক পূর্ণিমায় এই ব্রত করতে হয়। চার বছরের পর প্রতিষ্ঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বাংলায় 'রাল' শব্দটি 'রাতুল', অর্থাৎ রক্ততুল্য বা রক্তাভ বুঝায়, রক্তাভ অর্থে উদীয়মান সূর্য তুল্য। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে রাউল (সংস্কৃত 'রাতুল' এবং আধুনিক বাংলা 'রাল'-এ সংবৃত উচ্চারণ) বুঝতে সোজাসুজি সূর্যকেই বুঝাত। দুর্গা শব্দটি এই নামেরই দেবী অর্থবাচক হলেও এখানে প্রত্যয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। স্ত্রীসমাজের মধ্যে প্রচলিত একটি সাধারণ প্রবণতা এই যে তারা পুরুষ দেবতাকেও স্ত্রী দেবতায় পরিণত করতে চায়। সুতরাং স্পষ্টতই বুঝতে পারা যায়, এখানেও রাল-ত্বর্গা। বলতে পুরুষ দেবতা বুঝাচ্ছে। দেবতার মাহাত্ম্য বর্ণন। করে একটি ব্রতকথা বর্ণিত হয়ে থাকে, তা থেকে বুঝতে পারা যায় যে এই দেবতা কুষ্ঠরোগ এবং নারীর বন্ধ্যাত্ব দূর করতে পারেন।

এই ভাবে রাল-দুর্গার ব্রতের অনুষ্ঠান করতে হয়-অগ্রহায়ণ মাসের অমাবস্যার দিন প্রত্যেকটি ব্রতিনী সাতটি ধান, সাতটি দূর্বা ও সিন্দুর সহ নুতন কেটে আনা কলার পাতার উপরে করে নেবে, তার সঙ্গে লাল চন্দন, রক্তজবা ফুল (সবই উদীয়মান সূর্যের প্রতীক) দিয়ে একটি তামার থালার উপর রেখে তা দেবতার সামনে সাজিয়ে দেবে। পরবর্তী পূর্ণিমা পর্যন্ত প্রতিদিন এই প্রকার করতে হয়। পূর্ণিমার দিন ষোড়শোপচারে সূর্যদেবতার পূজো বা ব্রত করতে হয়। ব্রতের কয়েকদিন ব্রতিনীকে সতেরে। মুঠি চালের গুঁড়ো দিয়ে ভাত রান্না করে খেতে হয়। আবার পরবর্তী পূর্ণিমার দিন এই একই ভাবে ব্রত করতে হয়। কিন্তু সেবার চালের গুঁড়ো দুধে সিদ্ধ করে ভাতে চিনি মিশিয়ে খাওয়া যেতে পারে। পরের মাসেও সূর্যদেবতাকে এমন ভাবেই পুজো করতে হয়। পূজোর দিনে প্রতিনী সতেরো মুঠো চালের গুঁড়ো দিয়ে পিঠে তৈরী করে খেতে পারে। এবার প্রত্যেক প্রতিনীই এক একটি তামার টাটে সূর্যদেবতাকে অর্থ্য সাজিয়ে দিতে পারে। তার উপর যথারীতি অবাফুল, হট কলা, কিছু রক্তচন্দন দিয়ে পূঙ্গোপকরণগুলো জলে ভাসিয়ে দিতে হয়। তার ভিতর দিয়েই আনুষ্ঠানিকভাবে এই ব্রত উদযাপন সম্পূর্ণ হয়।

(৩) রেবন্ত-বাংলার মধ্যযুগে রেবন্ত নামে এক সূর্যদেবতা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। কতকগুলো অর্বাচীন পুরাণেও তিনি স্থান লাভ করেছিলেন। হিন্দু প্রতিমা নির্মাণের পদ্ধতির মধ্যে তার স্থান ছিল এবং তার বর্ণনা অনুযায়ী তার অনেকগুলো প্রস্তর মূর্তিও এখানে সেখানে নির্মিত হয়েছিল। যে পুরাণে ইতিপূর্বেই একজন বৈদিক সূর্যদেবতা স্থান অধিকার করেছিলেন, তার মধ্যে তারও একটি স্থান নির্দেশ করবার জন্য রেবন্তকে সূর্যের পুত্র বলা হয়েছে। তবে প্রামাণ্য গ্রন্থে সূর্যের এই নামে কোনো পুত্র সন্তানের অস্তিত্ব নেই। রেবন্ত শব্দটির উদ্ভব অনিশ্চিত। সুতরাং মনে হয়, শব্দট অনার্য শব্দ কিংবা কোনো দেশীয় উৎস থেকে গৃহীত হয়েছে। হিন্দু প্রতিমা নির্মাণ বিষয়ে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাতেই তার অনার্য উদ্ভবের বিষয় বুঝতে পারা যায়। এই বর্ণনা অনুযায়ী তাঁকে অশ্বপৃষ্ঠে শিকারীর বেগে একজন অনুচর এই নির্মাণ করতে হয়। উত্তর বাংলা থেকে তার যে একটি প্রস্তর স্মৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে, তার এই বর্ণনাটি লক্ষ্য করবার মত-

বুট পরা দেবতা অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ়, তার ডান হাতে একটি চাবুক এবং বাম হাতে অশ্ব বলগা, একজন অনুচর তার মাথায় ছাতা ধরে আছে।

পূর্ব বাংলা থেকে যে একটি স্মৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে, তাতে দেখা যায় তিনি অশ্বারূঢ়, তার ডান হাতে একটি ভিক্ষাপাত্র, কতকগুলো কুকুর তাকে অনুসরণ করে যাচ্ছে, তার সঙ্গে কয়েকজন স্ত্রী এবং পুরুষ বাদ্যকরও আছে।

(চ) সূর্যব্রত-সূর্যের যে সকল ব্রত বা পূজোর বিষয়ে উপরে উল্লেখ করা হলো, তা ছাড়া মারে। একপ্রকার সূর্যপূজা বাংলার স্ত্রী সমাজে অত্যন্ত জনপ্রিয়। তা সাধারণতঃ সূর্যব্রত বলে পরিচিত। এই উপলক্ষে নিম্নলিখিত আচার পালন করা হয়ে থাকে।

মাঘ মাসে কৃষ্ণপক্ষের কোনো রবিবার গৃহাভিনায় একটি ক্ষুদ্র মাটির বেদী তৈরী করতে হয় তাতে ঘৃতের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিতে হয়। প্রত্যেক পরিবারে যে কয়ট মহিল। এই ব্রত পালন করবেন, তাদের প্রত্যেকের জন্য এক একটি কার সলতে দিতে হয়। পূর্বদিকে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সলতেগুলো জ্বালিয়ে দিতে হয়। কেবলমাত্র বিবাহিতা নারীরাই এই ব্রতে আশ গ্রহণ করতে পারে। সূর্যোদয়ের আগেই তাদের শয্যাত্যাগ করতে হয় এবা চান করে প্রদীপগুলো এক একয়নাক একটি কার জ্বালিয়ে তা হাতে নিয়ে সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। জ্বলন্ত প্রদীপগুলো সূর্যেরই প্রতীক। ব্রতিনীরা সূর্যকে প্রণাম করে এবং মুখে সূর্যের মাহাত্মাসূচক মেয়েলী গীত গায়, মধ্যে মধ্যে মুখে উলুধ্বনি করে (প্রত্যেক শুভকর্মেই জিহ্বাগ্র দুই ঠোঁটের প্রান্তে স্পর্শ করিয়ে এই ধ্বনি করা হয়)। রতিনীরা সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কখনো মাটিতে বসবে না, সারাদিন ভারা নিরাহারে থাকবে, মাখার চুল বাঁধবে না, এমন কি, মলমূত্র ত্যাগ করবে না। যারা অসুস্থতা কিংবা বার্ধক্যবশতঃ বসে বসে এই ব্রত করবে, তারা সারাদিনে কোনো সময়ই আর দাঁড়াতে পারবে না। সূর্যাস্তের পর অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

চন্দ্র

বাংলার বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে চন্দ্র সঙ্গত কারণেই কোনো সহানুভূতি লাভ করতে পারে নি। একমাত্র মরুভূমি অঞ্চল ব্যতীত চন্দ্র তার সহচর নক্ষত্র সহ কোথাও অভিনন্দিত হতে পারে নি। কারণ, যে মানুষ কাজ করে রাত্রি তার কাজে বাধা, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের কাছে রাত্রি নানা তুক তাক করে তার অনিষ্ট করবার জন্য। রাত্রি আসার নামেই মানুষ ভয় পায় এবং সেজন্যই নিশাপতি চন্দ্র গ্রাম- বাসীর কাছ থেকে বিশেষ কোনো আকর্ষণের বস্তু হয়ে উঠতে পারে নি। ভারত- ব্যাপী পূর্ণিমার রাত্রে যে সকল উৎসবের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে, তাদের সঙ্গে চন্দ্রো- পাসনার কোনো সম্পর্ক নেই। চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির উপর ভিত্তি করে একদিন মানুষ পঞ্জিকার দিন গণনা আরম্ভ করেছিল, কারণ, এক পক্ষে তা দিনের পর দিন হ্রাস এবং আর এক পক্ষে তার দিনের পর দিন বৃদ্ধি দিন-গণনার পক্ষে সুবিধাজনক ছিল। সারা বাংলার মধ্যে একটি মাত্র ক্ষেত্রে চন্দ্রকে অবলম্বন করে লোকসংস্কৃতি গড়ে উঠবার একটু মাত্র নিদর্শন পাওয়া যায়। ইতিহাসের আদি যুগে বাংলাদেশে যে এক শ্রেণীর গ্রহোপাসক বসতি স্থাপন করেছিল, তা তাদেরই প্রভাবের ফল বলে মনে হয়।

মাঘ মাসের পূর্ণিমার রাত্রে বাংলার থেকে জাত) বলে সম্বোধন করে তার মেয়েরা চন্দ্রকে 'পুণাই' (সংস্কৃত 'পৌর্ণমাসী' এক ব্রত উদযাপন করে। শেওড়া গাছের ডালের সঙ্গে স্থানীয় ভাবে পরিচিত বিন্না (এক প্রকার বুনো গাছ) গাছের ভাল একসঙ্গে করে বাড়ীর উঠোনে পুঁততে হয়। গাছের ডালগুলোর নীচে একটি ছোট্ট পুকুর কাটতে হয়। চালের গুঁড়ো জলের সঙ্গে মিশিয়ে গুলে নিয়ে তা দিয়ে পুকুর'-এর চার ধারে আলপনা এঁকে দিতে হয়। জলে সিদ্ধ করা চালের গুঁড়োর পিঠে, কিছু ফলমূল, শাকসব্জী (প্রত্যেকটি পাঁচটি করে) এবং আরো কিছু উপকরণ পূর্ণচন্দ্রকে নিবেদন করা হয়। কিছু কিছু

পুজোপকরণ ছোট্ট পুকুরটির মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়। এই সব আচার পালন করবার পর খাদ্য-নৈবেদ্য পুকুরের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয় এবং পুকুরটি একটি সমতল পাথরের টুকরো দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। ব্রতিনীরা পুকুরের চারদিক ঘিরে বসেন এবং সুণাইর এই ব্রতকথা শোনেন-

একদা কোনো এক সময়ে এক গোয়ালিনী আর এক ব্রাহ্মণী রমণী ছিল। তাদের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব ছিল। সারা বছর ধরে যত ব্রতপার্বণ হোত, তারা তাদের সবারই অনুষ্ঠান করত। একবার যখন পূণাই ব্রতের সময় এলো, তখন পুজনেই যথারীতি এই ব্রত পালন করস। গোয়ালিনীর ছেলের বৌ অত্যন্ত লোভী প্রকৃতির মেয়ে ছিল। বৌ পাছে পজোর নৈবেদ্য খেয়ে ফেলে, সেই ভয়ে গোয়ালিনী তার বৌয়ের আঁচল নিজের আঁচলের সঙ্গে বেঁধে রাখল। বৌ কেবলই শাশুড়ীর কাছ থেকে সরে যাবার জন্য ছুতো খুঁজে বেড়াতে লাগল। সে তার শাশুড়ীকে কোনো ছুতোয় অন্যত্র পাঠিয়ে দিতে চাইল। সে বলল, আমার মনে হয়, আমার ভাসুর অসুস্থ। শাশুড়ী বৌয়ের মনের কথা বুঝতে পারল, বলল, পুণাই-এর আশীর্বাদে সে সেরে উঠবে। বৌ এবার বসল, আমার মনে হয়, আমাদের গরুটাকে বাঘে ধরেছে। শাশুড়ী বলল, পুণাই-এর আশীর্বাদে বাঘ পালিয়ে যাবে। বৌ বলল, আমাদের পাড়া-পড়শীর বাড়ীতে আগুন লেগেছে। গোয়ালিনী বলল, পুণাই-এর বরে আগুন নিভে যাবে।

সুতরাং বৌ-এর সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হলো। পুণাই-এর পূজোর নৈবেদ্য তার একটু খেয়ে দেখবার খুব ইচ্ছা হলো, কিন্তু কিছুই করতে পারল না।

গোয়ালিনী পূজো শেষ করে তার সকল নৈবেদ্য একটা বড় মাটির হাঁড়িতে করে তার বান্ধবী ব্রাহ্মণ মহিলার বাড়ী নিয়ে চলল। দেশের রাজা তা জানতে পারলেন। তিনি ভাবলেন, এই গোয়ালিনী ব্রাহ্মণ মহিলার জাতিনাশ করবার জন্য তার নিজের রান্না করা পূণাই-এর ভোগ তার বাড়ীতে নিয়ে চলেছে। গোয়ালিনী যে পাত্রটি নিয়ে তাঁর ব্রাহ্মণ বান্ধবীর বাড়ীতে যাচ্ছিল, সেইটি নিয়ে রাজা তাকে তাঁর সামনে হাজির হতে আদেশ দিলেন। বিপদে পড়ে গোয়ালিনী পুণাই ঠাকুরাণীকে ডাকতে লাগল। পুণাই তার প্রাণরক্ষ। করবার আশ্বাস দিলেন।

রাজা গোয়ালিনীকে তার পাত্রের ঢাকনা খুলবার জন্য বললেন। তারপর তিনি বিস্মিত হয়ে দেখলেন, পাত্রের মধ্যে রান্না করা কোনো খাদ্য নেই, তাই তার আপত্তি করবার কিছু নেই।

রাজা তাকে মুক্তি দিলেন। যারা এই মিথ্যা সংবাদ রাজাকে দিয়েছিল, রাজা তাদের প্রাণদণ্ড দিলেন। কিছুদিন পর গোয়ালিনীর ছেলের বৌ-ও পুণাই-এর দয়ায় তার অদ্ভুত ব্যাধি থেকে ত্রাণ পেল।

ব্রহ্মান্ড, সূর্য, চন্দ্র ছাড়াও , নক্ষত্র, নদ-নদীকে কেন্দ্র করে বহু পুরগাথা প্রচলিত রয়েছে গ্রাম বাংলায়।

Unit 5: Folk Literature

লোকসাহিত্য মৌখিক ধারার সাহিত্য যা অতীত ঐতিহ্য ও বর্তমান অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে রচিত হয়। একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিমন্ডলে একটি সংহত সমাজমানস থেকে এর উদ্ভব। সাধারণত অক্ষরজ্ঞানহীন পল্লিবাসীরা স্মৃতি ও শ্রুতির ওপর নির্ভর করে এর লালন করে। মূলে ব্যক্তিবিশেষের রচনা হলেও সমষ্টির চর্চায় তা পুষ্টি ও পরিপক্কতা লাভ করে। এজন্য লোকসাহিত্য সমষ্টির ঐতিহ্য, আবেগ, চিন্তা ও মূল্যবোধকে ধারণ করে। বিষয়, ভাষা ও রীতির ক্ষেত্রে প্রচলিত ধারাই এতে অনুসৃত হয়। কল্পনাশক্তি, উদ্ভাবন-ক্ষমতা ও পরিশীলিত চিন্তার অভাব থাকলেও লোকসাহিত্যে শিল্পসৌন্দর্য, রস ও আনন্দবোধের অভাব থাকে না।

লোকসাহিত্য লোকসংস্কৃতির একটি জীবন্ত ধারা; এর মধ্য দিয়ে জাতির আত্মার স্পন্দন শোনা যায়। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একে 'জনপদের হৃদয়-কলরব' বলে আখ্যায়িত করেছেন। লোকসাহিত্যকে প্রধানত লোকসঙ্গীত, গীতিকা, লোককাহিনী, লোকনাট্য, ছড়া, মন্ত্র, ধাঁধা ও প্রবাদ এই আটটি শাখায় ভাগ করা যায়।

লোকসঙ্গীত ঐতিহ্যগতভাবে বিশেষ সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত গান; সাধারণত পল্লীর অনক্ষর জনগণ এর প্রধান ধারক। বিষয়, কাল ও উপলক্ষভেদে এ গানের অবয়ব ছোট-বড় হয়। ধুয়া, অন্তরা, অস্থায়ী ও আভোগ সম্বলিত দশ-বারো চরণের লোকসঙ্গীত আছে; আবার ব্রতগান, মেয়েলী গীত, মাগনের গান, জারি গান, গম্ভীরা গান ইত্যাদি আকারে অপেক্ষাকৃত বড় হয়। কবির লড়াই, আলকাপ গান, লেটো গান এবং যাত্রাগান হয় আরও দীর্ঘ, কারণ সারারাত ধরে এগুলি পরিবেশিত হয়।

লোকসঙ্গীতের গায়করা পেশাদার ও অপেশাদার উভয়ই হতে পারে। পেশাদার কোনো গায়েন বা বয়াতি দল গঠন করে অর্থের বিনিময়ে গান গায়; কবিয়াল দলবল নিয়ে কবির লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করে। আলকাপ গানের ছোকরা এবং ঘাটু গানের ঘাটু পেশাদার নটী ও গায়ক; উদাস বাউল নিজেই গান করে তার অধ্যাত্মপিপাসা নিবৃত্ত করে। বৈরাগী-বৈরাগিণী বা বোষ্টম-বোষ্টমী গান গেয়ে ভিক্ষা করে। বিবাহাদি অনুষ্ঠানে মেয়েলি গীত গাওয়ার জন্য পেশাদার গিদাল থাকে; তবে সাধারণ মেয়েরাও গান গায়। ক্ষেত-খামারে কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষ, মাঠে-ঘাটে রাখাল এবং নদী-হাওরে মাঝি-মাল্লারাও চিত্তবিনোদন, অবসরযাপন বা শ্রম লাঘবের জন্য গান গায়।

বাংলা লোকসঙ্গীত নাম ও প্রকারভেদে বিচিত্র; অঞ্চলভেদে এর প্রায় শতাধিক নাম রয়েছে এবং প্রকারভেদে প্রায় পঞ্চাশোর্ধ্ব শ্রেণির গান চিহ্নিত করা যায়। কেউ কেউ আঞ্চলিক ও সর্বাঞ্চলীয়, আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক, সাধারণ ও তত্ত্বপ্রধান, তালযুক্ত ও তালহীন এরূপ স্থূলভাবে ভাগ করে সেগুলির আবার নানা উপবিভাগ করেছেন। আশুতোষ ভট্টাচার্য লোকসঙ্গীতকে আঞ্চলিক, ব্যবহারিক, আনুষ্ঠানিক (ritual), কর্মমূলক ও প্রেমমূলক এই পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেন। বিষয়গত দিক থেকে একে প্রেম, ধর্ম-আচার-সংস্কার, তত্ত্ব ও ভক্তি, কর্ম ও শ্রম, পেশা ও বৃত্তি, ব্যঙ্গ ও হাস্যকৌতুক এবং মিশ্র এরূপ সাতটি ভাগ করা যায়।

নর-নারীর প্রেম অবলম্বন করে রচিত বাংলা লোকসঙ্গীতে লৌকিক বা পার্থিব প্রেম এবং তত্ত্ব-ভক্তিমূলক গানে অলৌকিক বা অপার্থিব প্রেমের কথা আছে। রাধাকৃষ্ণের আখ্যান অবলম্বনে রচিত আলকাপ, কবিগান, ঘাটু গান, ঝুমুর, বারমাসি, মেয়েলি গীত, যাত্রাগান, সারি গান, হোলির গান ইত্যাদিতে দেহজ কামনা-বাসনা, মান-অভিমান, মিলন-বিরহ ইত্যাদি ব্যক্ত হয়। যেমন 'বনে কানুর বাঁশি বাজিল রে' (আলকাপ), 'কি হেরিলাম যমুনায় আসিয়া গো সজনি' (ঘাটু গান), 'শুন গো রাই, বলি তোরে' (ঝুমুর), 'মাঘ না মাসেতে মাধব মতুরায় গমন' (বারোমাসি), 'তুই মোরে নিদয়ার কালিয়া রে' (ভাওয়াইয়া), 'মন দুঃখে মরিবে সুবল সখা' (বিচ্ছেদি গান), 'সুন্দরী লো বাইরইয়া দেখ, শ্যামে বাঁশি বাজাইয়া যায় রে' (সারিগান), 'নিধুবনে শ্যাম কিশোর সনে খেলব হোলি আয়' (হোলির গান) ইত্যাদি। এ গানগুলিতে রাধা, কৃষ্ণ, সুবল, মথুরা, যমুনা, বাঁশি ইত্যাদি শব্দ থাকলেও তাতে ধর্মীয় ভাব বা আধ্যাত্মিকতা নেই, আছে মানবিকবোধ ও বৈষয়িক

চেতনা। গাড়িয়াল, মৈষাল, মাহুত, মাঝি, সওদাগর, বানিয়া, নদী, হাওর প্রভৃতি বাংলার পেশাজীবী মানুষ ও প্রকৃতি নিয়েও এ ধরণের গান রচিত হয়। 'ও কি গাড়িয়াল ভাই, কত রব আমি পন্থের দিকে চায়া রে' (ভাওয়াইয়া), 'আরে গেইলে কি আসিবেন মোর মাহুত বন্ধু' (ওই), 'আমার বাড়ি যান ও মোর প্রাণের মৈষাল রে' (চটকা), 'ও মোর বানিয়া বন্ধু রে' (ওই), 'সুজন মাঝি রে, কোন ঘাটে লাগাইবা তোর নাও' (ভাটিয়ালি), 'সুন্দইর‍্যা মাঝির নাও উজান চলো ধাইয়া' (সারিগান) ইত্যাদি গানে রূপক-প্রতীক নেই, আছে নিত্য পরিচিত মানুষ, প্রাণী ও প্রকৃতির চিত্র।

জীবনের খন্ড খন্ড চিত্র কথায় ও সুরে অবলীলায় রূপ দিয়েছেন লোকশিল্পীরা। 'গাও তোল গাও তোল কন্যা হে, কন্যা পিন্দো বিয়ার শাড়ি', 'ঘাটে ডিঙ্গা লাগাইয়া মাঝি পান খেয়া যাও', 'কত পাষাণ বাইন্দ্যাছ পতি মনেতে', 'জল ভর সুন্দরী কন্যা জলে দিয়া মন', 'লাল নীল চউর বাইয়া, হাটে যাও রে সোনার নাইয়া' ইত্যাদি প্রেমসঙ্গীতে জীবনের খন্ডচিত্র আবেগের ভাষায় রূপ পেয়েছে।

দেহতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব, দয়ালতত্ত্ব ও ভাবতত্ত্ব নিয়ে রচিত হয় বাউল, মুর্শিদি, মারফতি, মাইজভান্ডারি প্রভৃতি আধ্যাত্মিক গান। প্রধানত বাউল, ফকির, বৈরাগী ও ভক্তশিষ্যগণ এসব গানের চর্চা করে থাকে। জীবন, সংসার ও জগৎকে অনিত্য এবং দুঃখময় ভেবে তারা আধ্যাত্মিক জগতে শান্তি ও মুক্তি খোঁজে। কেউ সরাসরি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে, কেউ বা গুরু-মুর্শিদের নিকট আবেদন-নিবেদন করে। 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়' (বাউল), 'মনমাঝি তোর বইঠা নেরে আমি আর বাইতে পারলাম না' (ভাটিয়ালি), 'ভবনদী পার করে দাও দয়াল মুর্শিদ আমারে' (মুর্শিদি), 'ও কি চমৎকার, ভান্ডারে এক আজব কারবার' (মাইজভান্ডারি গান) ইত্যাদি এরূপ তত্ত্বসঙ্গীত। এগুলিতে সংসারবিমুখ ভাবের প্রতিফলন ও বিবাগী সুরের প্রতিধ্বনি আছে।

ধর্ম-সংস্কার-আচার-ব্যবহারমূলক বিচিত্র লোকসঙ্গীত প্রচলিত আছে। প্রেমসঙ্গীতে জাতির চিরন্তন সত্তা আর অনুষ্ঠাননির্ভর সঙ্গীতে জাতির বিশিষ্ট সত্তা প্রকাশিত। 'আল্লাহ ম্যাঘ দে পানি দে, ছায়া দে রে তুই' গানে বৃষ্টির জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা হয়েছে। এমন আবেদন সরাসরি মেঘের কাছেও করা হয়েছে, যেমন: 'মেঘ রাজারে তুইনি সুদর ভাই/ এক ঝাড়ি মেঘ দে ভিজ্যা ঘরে যাই।' রংপুরের রাজবংশী কৃষকদের মধ্যে 'হুদমার গান' নামে এক ধরণের লোকসঙ্গীত প্রচলিত আছে। হুদমা হচ্ছে মেঘের দেবতা; কৃষক রমণীরা রাত্রিবেলা নগ্ন হয়ে কৃষিক্ষেতে নাচ-গান করে এবং পানি ঢেলে নকল চাষের অভিনয় করে।

পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলের ভাদু, টুসু ও জাওয়া গান মূলত ব্রতকেন্দ্রিক। জাওয়া শস্যোদ্গমের, আর ভাদু শস্য তোলার উৎসব। প্রাচীন যুগে লোকের দৃষ্টিতে ভূমির শস্যবতী ও নারীর সন্তানবতী হওয়া ছিল অভিন্ন। কুমারী মেয়েরা নিজেদের সফল জীবনের আশায় ভাদু ব্রত পালন করে। এছাড়া হিন্দু নারীসমাজে আরও অনেক ব্রত আছে। সেসব ব্রতে সন্তান, সম্পদ ও জাগতিক সুখসমৃদ্ধি কামনা করে গান করা, ছড়া বলা ও আলপনা অাঁকা হয়। কৃষির দেবতা শিবকে কেন্দ্র করে শিবের গাজন ও গম্ভীরা উৎসব পালিত হয়। শিব-পার্বতীর গার্হস্থ্য জীবন নিয়ে রচিত গাজন গানে আসলে কৃষকজীবনেরই ছায়াপাত ঘটেছে। এ গানের দুটি ধারা একটিতে থাকে শিবের পারিবারিক জীবনচিত্র এবং অপরটিতে থাকে শিবের কাছে সাংসারিক জীবনের নানাবিধ অভাব-অভিযোগের বিবরণ। 'ধান লাড় ধান লাড়, গোরী, আউলাইয়া মাথার কেশ' এটি প্রথম ধারার এবং 'শিব, তোমার লীলাখেলা কর অবসান/ বুঝি বাঁচে না আর জান' এটি দ্বিতীয় ধারার গান। বর্তমানে গম্ভীরার এই ধারায় 'নানা-নাতি'র গান ও অভিনয়ের মাধ্যমে রাজনীতি, সমাজ, শিক্ষা, অর্থনীতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্নীতি এবং ব্যক্তিচরিত্র সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়। এটি গম্ভীরার রূপান্তরিত নতুন আঙ্গিক।

ঝড়বৃষ্টি ও বজ্রপাত থেকে ফসল রক্ষার জন্য ওঝা শ্রেণির শিরালিরা শিঙ্গা বাজিয়ে ও মন্ত্রধর্মী গান গেয়ে মেঘ তাড়ায়। এ প্রথা এক সময় ময়মনসিংহ ও সিলেট অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। এ ধরণের কাজ করতে গিয়ে শিরালিরা বজ্রাঘাতে প্রাণ হারিয়েছে এমন দৃষ্টান্তও আছে। বর্তমানে অবশ্য এ জাতীয় গান লুপ্তপ্রায়।

গোসম্পদ রক্ষার উদ্দেশ্যে গোয়াইলার শিরনি ও গোরক্ষনাথের শিরনি আচার পালিত হয়। কৃষিকাজে গরুর ব্যবহার অপরিহার্য, তাই গরুর নিরাপত্তা কামনা করে শির্নী মানত করা হয়। এ উপলক্ষে রাখাল বালক ও অন্যান্য ছেলেমেয়ে দল বেঁধে ঘরে ঘরে যায় এবং গান গেয়ে শির্নীর চাল-ডাল-অর্থ সংগ্রহ করে; একে মাগনের গানও বলে।

হিন্দুসমাজে দেবদেবীর উদ্দেশে যেমন ব্রতের গান আছে, তেমনি মুসলমান সমাজেও আছে পীর-পীরানির উদ্দেশে জাগগান। পীরের মাহাত্ম্যসূচক এ গান দীর্ঘরাত্রি জেগে গাওয়া হয়। গাজী পীর, মাদার পীর, খোয়াজ-খিজির, মানিক পীর, সোনা পীর ও বদর পীর লোকদৃষ্টিতে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী; তাঁরা সন্তানহীনাকে সন্তানদান, রোগব্যাধি দূরীকরণ, ধনসম্পদ দান এবং গরুবাছুর রক্ষা করতে সক্ষম বলে বিশ্বাস করা হয়। মাগনের গানের মতো জাগগান গেয়েও শির্নীর চাল-ডাল সংগ্রহ করা হয়। জাগগানে পীরমাহাত্ম্য বর্ণিত হলেও তাতে ধর্মভাব আছে সামান্যই; বৈষয়িক চেতনা ও কল্যাণবুদ্ধিই মুখ্য। এগুলি আখ্যানধর্মী ও বিবৃতিমূলক বলে আকারে দীর্ঘ হয়। গাজী পীরের উদ্দেশে নিবেদিত গান গাজীর গান নামে পরিচিত। সন্তান, স্বাস্থ্য ও সম্পদ কামনায় মানত করে গাজীর গানের পালা দেওয়ার রীতি আছে। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যের লীলাসংক্রান্ত জাগগানও আছে।

মুসলমান সমাজে প্রচলিত জারিগান বা শোকসঙ্গীত মহরম উপলক্ষে গাওয়া হয়। কারবালার বিষাদময় কাহিনী অবলম্বনে ছোট ও বড় আকারের জারিগান প্রচলিত আছে। জারি গান ও নাচে শিয়া সম্প্রদায়ের মুহররমের মিছিল, তাজিয়া, দরগাহ, দুলদুল, ইমামবারা, মাতম, মর্সিয়া ইত্যাদির প্রভাব পড়েছে। বিষয়বস্ত্ততে মৃত্যু, শোক, বিলাপ ও বিরহ থাকায় জারিগানে করুণ রসের প্রাধান্য থাকে। মুহররম ধর্মীয় অনুষ্ঠান হলেও জারিগানে ধর্মীয় কোনো প্রভাব নেই; মানবহৃদয়ের চিরন্তন আর্তি ও বেদনার সুরই এতে ধ্বনিত হয়।

জারিগান দলীয় সঙ্গীত; গায়েন ও দোহাররা মিলিতভাবে এ গান পরিবেশন করে। বাংলাদেশের নানা অঞ্চলে আজও জারিগানের প্রচলন আছে। তবে বর্তমানে এর বিষয়বস্ত্তর বিস্তার ঘটেছে; 'ইসমাইলের কোরবানির জারি', 'ইউসুফের জারি', 'আনাল হকের জারি', 'স্বাধীনতা দিবসের জারি' ইত্যাদি নামে বিচিত্র বিষয় অবলম্বনে জারিগান রচিত হচ্ছে। নারীরা মুহররম উপলক্ষে অন্তঃপুরে বসে যে মাতম করে এবং গীত গায় তাকে বলে মর্সিয়া। এতে পতিহারা সখিনার বিরহ-যাতনা ও আর্তনাদ গীতের ভাষা ও সুরে প্রকাশ পায় এবং তা সাধারণ বিধবার অন্তর্বেদনার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

কর্মসঙ্গীতের নামই প্রমাণ করে যে, এগুলি শ্রম ও কর্মের সঙ্গে জড়িত লোকসঙ্গীত। কর্মে উৎসাহ দান, শ্রমভার লাঘব এবং চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে এ সঙ্গীতের আয়োজন করা হয়। ক্ষেত নিড়ানো, ধান-পাট কাটা, ধান ভানা ইত্যাদি কৃষিকাজ ছাড়াও দাঁড় টানা, ছাদ পেটানো, জাল বোনা, তাঁত বোনা, মাটি কাটা, ভারি বস্ত্ত টানা ইত্যাদি কাজেও কর্মসঙ্গীতের প্রচলন আছে। কর্মের সঙ্গে সঙ্গীতের কথা ও সুরের সরাসরি সম্পর্ক আছে। যেমন 'আয় রে তরা ভুঁই নিড়াইতে যাই', 'আমরা ধান ভানিরে ঢেকিতে পার দিয়া', 'রঙের নাও রঙের বৈঠা রঙে রঙে বাও' যথাক্রমে ক্ষেত নিড়ানো, ধান ভানা ও নৌকা বাইচের গান। এসব গানের কথা, ছন্দ ও সুরে ছড়িয়ে আছে জীবনের সাধ-আহ্লাদ, রস-রসিকতা, আনন্দ-উল্লাস ইত্যাদি। শ্রমসঙ্গীতে শাস্ত্রকথা ও নীতিকথার কোনো স্থান নেই।

নিম্নশ্রেণীভুক্ত পেশাজীবী পটুয়ারা কাগজ ও মাটির পাত্রে পট আঁকে এবং পটের চিত্র অনুযায়ী গান রচনা করে। গ্রামে-গঞ্জে পট দেখানোর সময় তারা এই গানগুলি গেয়ে অর্থোপার্জন করে। তাদের পটের বিষয়বস্ত্ত রাধাকৃষ্ণ, রামসীতা, নিমাই সন্ন্যাস, গাজী পীর ইত্যাদি। ময়মনসিংহ থেকে সংগৃহীত 'পঞ্চকল্যাণী' নামক একটি পটে শিব, শ্যাম, সীতা, নিমাই ও অসতী নারীর চিত্র আছে। পটুয়া গানে ভাব নয়, ঘটনার বর্ণনা থাকে। পটের চিত্র অনুযায়ী কথা সাজাতে হয় বলে এরূপ গানে শিল্পীর স্বাধীনতা থাকে অল্পই।

পটুয়াদের মতো বেদেরাও বর্ষাকালে নৌকায় করে গ্রামগঞ্জে গিয়ে ছোটখাটো ব্যবসাদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। সাপ ধরা, সাপ খেলানো ও ওঝাগিরি তাদের প্রধান জীবিকা। এ উপলক্ষে তারা মন্ত্র ও গান রচনা করে। 'সাপ খেলা দেখবি যদি আয়

রে সোনা বউ/ এমনি খেলা সাপের খেলা দেখেনি তো কেউ' ঢাকা থেকে সংগৃহীত ও রেকর্ডকৃত এই গানে সাপ খেলানোর চিত্র আছে। মনসা ও বেহুলা-লক্ষীন্দর প্রসঙ্গ তাদের গানের প্রধান বিষয়।

পুতুলনাচ দেখিয়ে ও গান গেয়ে জীবিকা অর্জন করে অপর এক শ্রেণির পেশাজীবী মানুষ। পুতুলনাচের প্রকৃতি ও বিষয় অনুযায়ী এর গান হয় ছোট-বড়। পাঁচালি, কীর্তন ও মালসী সুরে এ গান পরিবেশিত হয়। মাঝেমধ্যে গদ্য সংলাপও থাকে। এতে অনেক সময় মানবজীবনের খন্ডচিত্র ফুটে ওঠে, যেমন: 'ও লো সুন্দরি! কার কথায় কইরাছো তুমি মন ভারি/ আমি যেখানে সেখানে থাকি অনুগত তোমারি' গানটিতে দাম্পত্য জীবনের একটি সরস চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

ফেরিওয়ালারা ফেরি করতে করতে গান করে, আবার ফকির-বৈরাগীরা গান গেয়ে ভিক্ষা করে। হাতিখেদার গান হাতি ধরার উদ্দেশ্যে রচিত ও গীত হয়। কর্ম ও পেশার সঙ্গে এসব গানের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। খেমটা নাচ ও গান ব্যবসায়বৃত্তির সঙ্গে জড়িত; এ উদ্দেশ্যে নাচের দলও আছে। প্রধানত নপুংসকেরা এ ধরণের নাচ-গান করে জীবিকা নির্বাহ করে। বিবাহ, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি উৎসবে খেমটাওয়ালারা নাচ-গান করে দর্শকদের মনোরঞ্জন করে। এদের গানের বিষয় সাধারণত লঘু রঙ্গরসাত্মক ও অশ্লীল হয়ে থাকে। রাধাকৃষ্ণের লৌকিক প্রেম খেমটা গানের প্রধান বিষয়। চটকা, বোলান, লেটো ইত্যাদি গানেও রঙ্গ-ব্যঙ্গ, ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও অশ্লীলতা আছে। এছাড়া আলকাপ, কবির লড়াই, খেমটা, মেয়েলি গীত, সারি, ঘাটু ইত্যাদি গানও অংশত ব্যঙ্গরসাত্মক। মূলত লোকমনোরঞ্জনই এ ধরণের গানের উদ্দেশ্য। গ্রামজীবনের অভাব-অনটন, দুঃখ-শোক ও বঞ্চনার মধ্যেও হাসির ঈষৎ রেখাটি যে এখনও বিলীন হয়ে যায়নি, এসব গানে তার পরিচয় পাওয়া যায়। অবৈধ ও পরকীয়া প্রেম, অবাঞ্ছিত ব্যক্তি ও ঠাট্টা-মস্করার পাত্রকে অবলম্বন করে হাস্যরসের গান রচিত হয়। সাময়িক উত্তেজনা ও লঘু রসিকতা এসব গানের মুখ্য আবেদন।

কবিগানে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাবিষয়ক কাহিনী বা সমস্যাদি স্থান পায়। দাঁড়া কবিগানে তাৎক্ষণিকভাবে প্রস্তাবিত বিষয় আলোচিত হয়। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক আখ্যানগুলি ধর্মীয় ও নীতিবিষয়ক হয়ে থাকে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমাখ্যানকে 'সখী সংবাদ' এবং শ্যামার ভক্তিমূলক গানকে 'ভবানী বিষয়' বলে। কবিগানের 'খেউড়' অংশ আদি রসাত্মক ও রুচিহীন। 'খিস্তি-খেউড়' কথাটির এখান থেকেই উৎপত্তি। দুই দলের মধ্যে প্রশ্নোত্তরের ধারায় কবির লড়াই চলে। উনিশ শতকে কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে কবিগানের উৎপত্তি হয়। পরে তা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। কবিগানের আসরে ভাব, ভাষা, ছন্দ, সুর, বাদ্য ও ভঙ্গি সংযোগে একটি সাঙ্গীতিক আবহ সৃষ্টি হয়। শ্রোতারা সারারাত ধরে তা শুনে মুগ্ধ হয় ও আনন্দ উপভোগ করে।

সারিগানের সঙ্গে নদী, নৌকা, মাঝি-মাল্লা, পারাপার ইত্যাদি বিষয় জড়িত। রাধা-কৃষ্ণ, গৌরী-মেনকা ও রাম-সীতার লীলাবিষয়ক পুরাণাশ্রিত গান, নিমাই সন্ন্যাসমূলক ইতিহাসাশ্রিত গান এবং নর-নারীর প্রেম-বিরহমূলক বাস্তব জীবনাশ্রিত গান সারিগানের অন্তর্ভুক্ত। নৌকাবাইচ উপলক্ষে গীত সঙ্গীতসমূহ সারিগানের প্রধান অংশ, তবে সাধারণভাবে দাঁড়-গুণ টানা বা পাল তুলে নৌকা চালানোর সময়ও এ গান গাওয়া হয়। নৌকাবাইচের গান বেশ জীবনরসসিক্ত, তাত্ত্বিক ও উদ্দীপনামূলক। 'আষাড়িয়া নয়া পানি আইল রে ভাই দেশেতে/ আয় রে ও ভাই আয় রে সবাই আয়রে ডিঙ্গা বাইতে', 'মন পবনে বেগ উঠ্যাছে ভক্তির বাদাম দেও নৌকায়', 'শ্যাম কালিয়া তোর পিরীতে মইলাম জ্বলিয়া/ ডিঙ্গা সাজাও মাঝিভাই যমুনাতে যাই' ইত্যাদি গানে বিষয়, সুর, তাল ও ছন্দোবৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। সারিগান বাংলাদেশে এখনও জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত।

মেয়েলী গীত নারীসমাজের অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের বিচিত্র ভাব-আলেখ্য। কন্যা-জায়া-জননীরূপে পরিবারে নারীর অবস্থানকে কেন্দ্র করে সংসার-সাগরে যে ভাবরাশি উত্থিত হয়, মেয়েলি গীত তার বাঙ্ময় প্রকাশ। কুমারী জীবন, বিবাহিত জীবন ও সংসার জীবনের সুখ-দুঃখময় নানা ঘটনা ও বিচিত্র ভাব নিয়ে মেয়েলি গীত রচিত হয়। বিবাহ উপলক্ষে রচিত মেয়েলি গীতের সংখ্যা সর্বাধিক। কনে দেখা থেকে শুরু করে বিবাহের শেষ অনুষ্ঠান ফিরানি পর্যন্ত প্রায় সবস্তরের আচার-অনুষ্ঠানে এ গান গাওয়া হয়। এ সময় পল্লিরমণীরা ঢেঁকি, যাঁতা ও পাটায় কাজ করে এবং গান গেয়ে সারারাত কাটিয়ে দেয়। গর্ভাধান, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, খতনা, কান ফোঁড়ানো, সখি পাতানো ইত্যাদি উপলক্ষেও মেয়েলি গান রচিত ও

গীত হয়। স্বামী-স্ত্রীর প্রেম-বিরহ ও নাইয়রকেন্দ্রিক গীতও আছে। এসব গীতে বৈষয়িক চাওয়া-পাওয়া ও আশা-আকাঙ্ক্ষার চিত্র ফুঠে ওঠে। মেয়েলি গীত বাংলার প্রায় সব অঞ্চলেই প্রচলিত।

গীতিকা গীতোপযোগী ছন্দোবদ্ধ রচনা এবং লোকসাহিত্যের নবীনতম শাখা। অন্তঃমধ্য যুগ এর রচনাকাল। নাটকীয়তা গীতিকার একটি প্রধান গুণ। গীতিধর্মী রচনা হলেও এটি পাঠ করে সাধারণ কাব্যপাঠের মতোই আনন্দ পাওয়া যায়।

গীতিকায় সাধারণত পাত্র-পাত্রীর নাম থাকে না; রাজপুত্র, মন্ত্রিপুত্র, রাজকন্যা, পরীকন্যা, রাক্ষস, জাদুগিন্নী, সওদাগর, ধোপা, মালিনী, সন্ন্যাসী, পীর-ফকির ইত্যাদি নৈর্ব্যক্তিক নামে তারা পরিচিত হয়। তাদের রাজ্য ও আবাসগৃহ থাকে বটে, কিন্তু সেসবের ভৌগোলিক অস্তিত্ব থাকে না।

বাংলা গীতিকার প্রধান বিষয় নরনারীর প্রেম। মৈমনসিংহ-গীতিকার দশটি পালার মধ্যে নয়টিই প্রেমমূলক, একটি দস্যুতামূলক। প্রেমগাথার নায়ক-নায়িকারা বর্ণ-বিত্ত-কূল-ধর্মের দিক থেকে কেউ সমস্তরের, কেউ বা অসমস্তরের। নায়ক-নায়িকার প্রেমে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে সামন্তপতি, তার প্রতিনিধি, বিত্তশালী ও অন্যান্য ক্ষমতাধর ব্যক্তির রূপতৃষ্ণা, প্রণয়বাসনা, কামপ্রবৃত্তি ইত্যাদির কথা আছে। দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার, শোষণ, নির্যাতন, উচ্চবর্গের ইন্দ্রিয়াসক্তি, সম্ভোগপ্রিয়তা, প্রতিহিংসাপরায়ণতা, সমাজের রক্ষণশীলতা, আভিজাত্যের অহঙ্কার, বহুবিবাহ, যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদিও গাথাগুলিতে স্থান পেয়েছে। সমাজের নিষ্ঠুর বিধিনিষেধের কারণে কিছু কিছু গাথা, যেমন 'কঙ্ক ও লীলা', 'শ্যামরায়', 'ধোপার পাট', 'দেওয়ানা মদিনা', 'ফুলকুমারী', 'চন্দ্রাবতী', 'মহুয়া' ইত্যাদি বিয়োগান্তক পালায় পরিণত হয়েছে। গীতিকাসমূহের কয়েকটি সংকলন গ্রন্থ হচ্ছে মৈমনসিংহ-গীতিকা, পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, মোমেনশাহী গীতিকা (১৯৭১), সিলেট গীতিকা (১৯৭২), রংপুর গীতিকা (১৯৭৭) ও বাংলার লোক-গীতিকথা (১৯৮৬)।

লোককাহিনী পুরুষানুক্রমে মুখে মুখে প্রচলিত বর্ণনামূলক গল্প। এর মূল ভিত্তি কল্পনা। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল পর্যন্ত গল্পের আখ্যানের সীমানা বিস্তৃত। দেব-দৈত্য, জ্বীন-পরী, রাক্ষস-খোক্ষস, রাজা-প্রজা, সাধু-সন্ন্যাসী, পীর-ফকির, কৃষক-তাঁতি, কামার-কুমার, ধোপা-নাপিত, পশু-পাখি, নদী-সাগর, পাহাড়-পর্বত, চন্দ্র-সূর্য, দিন-রাত্রি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গল্প রচিত হয়। একক ও সরলরৈখিক গল্প যেমন আছে, তেমনি বিচিত্র শাখাসম্বলিত জটিল গল্পও আছে। প্রথম শ্রেণির গল্প সাধারণত আকারে ছোট হয় এবং দ্বিতীয় শ্রেণির গল্প হয় বড়।

বিষয় ও আঙ্গিক বিচারে লোককাহিনীগুলিকে বারোটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা: রূপকথা, পুরাণকথা, ব্রতকথা (religious tale), রোমাঞ্চকথা, বীরকাহিনী, সন্তকাহিনী (sage tale), পুরাকাহিনী, স্থানিক কাহিনী (legend), পশুকাহিনী, নীতিকথা (fables), হাস্যরসাত্মক কাহিনী ও ব্যাখ্যামূলক কাহিনী। বাংলা ভাষায় প্রায় সবশ্রেণীর লোককাহিনীই রচিত হয়েছে। রোমাঞ্চ কাহিনীর উর্বর ভূমি হচ্ছে আরব-পারস্য। আলিবাবা ও চল্লিশ চোর, হাতেম তাই, সিন্দাবাদ, আলাউদ্দীনের আশ্চর্য প্রদীপ ইত্যাদি কাহিনী আরব-পারস্য থেকে আগত; আরবি আলেফলায়লা-ওয়া-লায়লা গ্রন্থ এসব কাহিনীর উৎস। মধুমালা, রূপভান, চন্দ্রাবতী ইত্যাদি দেশীয় কাহিনী।

লোককাহিনীর নায়ক-নায়িকারা সাধারণত দৈব বা অদৃষ্টের ওপর বেশি নির্ভরশীল, কর্মের ওপর নয়। তারা জাদুবিদ্যার ওপরও নির্ভর করে। ভোগবাদী কর্মকুণ্ঠ চেতনা থেকেই এমন মনোভাবের জন্ম।

বাংলা লোককাহিনীতে সকল স্তরের মানবজীবন ও সমাজের অজস্র ছবি আছে। সেসব বিশ্লেষণ করলে জাতির অনেক অজানা ইতিহাস বেরিয়ে আসে। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, যৌতুকপ্রথা, জন্মান্তরবাদ, সতীন-বিদ্বেষ, সৎমার ঈর্ষাকাতরতা, সবলের অত্যাচার, ধনীর ধনলিপ্সা, দুর্বল ও দরিদ্রের দুর্ভোগ, ধন ও বর্ণবৈষম্য, জাতি ও ধর্মভেদ, কৌলীন্যবিচার, দাম্পত্য-প্রেম, ভ্রাতৃপ্রেম, গুরুভক্তি, অতিথিসেবা, দান-ধ্যান ইত্যাদির অসংখ্য চিত্র লোককাহিনীতে পাওয়া যায়। প্রাচীনকাল থেকেই লোককাহিনী লোকসাহিত্যের একটি জনপ্রিয় শাখা ছিল, কিন্তু আধুনিক শিক্ষা ও নগরসভ্যতা বিস্তারের ফলে এর চর্চা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে।

লোকনাট্য লোকসমাজে প্রচলিত ঐতিহাসিক, ধর্মীয় ও লোককাহিনী ভিত্তিক নাট্যাভিনয়। আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে: 'গ্রামীণ সমাজে জনসাধারণের জীবন অবলম্বন করে যে নাটকধর্মী রচনা মুখে মুখে রচিত হয়ে মুখে মুখে প্রচারিত হয় তা-ই লোকনাট্য।' উন্মুক্ত বা ঈষৎ আচ্ছাদিত আসরে নাচ, গান, বাদ্য, সংলাপ ও অভিনয় সহযোগে এগুলি পরিবেশিত হয়, যেমন: ভাসান, যাত্রা, পালাগান, ঘাটু, গম্ভীরা, আলকাপ, কবিগান, পুতুলনাচ ইত্যাদি। এগুলির কোনোটিতে থাকে গানের প্রাধান্য, কোনোটিতে নাচের, আবার কোনোটিতে থাকে অভিনয়ের প্রাধান্য। বিষয়, আঙ্গিক, পরিবেশনরীতি ও সময়কালের দিক দিয়েও একটি অপরটি থেকে পৃথক।

লোকনাট্যের উপস্থাপনায় দুটি স্তর থাকে প্রস্তুতিপর্ব ও মূলপর্ব। লপ্রস্তুতিপর্বে মূল কাহিনীর পূর্বে প্রস্তাবনা, সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত ও বন্দনা পরিবেশিত হয়; আর মূলপর্বে অভিনয়, নৃত্যগীত, কথা ও সংলাপ, বাদ্য, সঙ বা ভাঁড় ইত্যাদি সহযোগে মূলকাহিনী পরিবেশিত হয়। রাম-সীতা, অর্জুন-দ্রৌপদী, রাধা-কৃষ্ণ, নিমাই সন্ন্যাস, বেহুলা-লক্ষীন্দর, ঈসা খাঁ দেওয়ান, ফিরোজ দেওয়ান, জয়নব-হাসান, সখিনা-কাসেম, হানিফা-জয়গুন, রহিম বাদশা, রূপবান, বাইদ্যানি ইত্যাদি পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও লৌকিক বিষয় নিয়ে লোকনাট্য রচিত ও পরিবেশিত হয়। গ্রামের সাধারণ মানুষ সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, অত্যাচার-পীড়ন, সংগ্রাম-বিরোধ, প্রেম-ভালোবাসা, লোভ-লালসা ইত্যাদি মিশ্রিত এসব কাহিনী থেকে আনন্দলাভের পাশাপাশি সৎ-অসৎ, ধর্মাধর্ম, পাপ-পুণ্য ইত্যাদি সম্পর্কেও শিক্ষালাভ করে থাকে।

পুরাণ, ইতিহাস, লোককাহিনী ও পালাগানভিত্তিক যাত্রা দেশের প্রায় সর্বত্র অনুষ্ঠিত হয়। উত্তরবঙ্গে প্রচলিত আলকাপে পৌরাণিক ও সামাজিক উভয় বিষয় স্থান পায়। যাত্রার মতো আলকাপ সারারাত ধরে চলে; নাচ, গান ও বাদ্য সহযোগে তা দীর্ঘায়িত করা হয়। রাজশাহী ও পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলায় প্রচলিত গম্ভীরা মূলে ছিল শিব-শিবানীর গার্হস্থ্য জীবনের আলেখ্য; শিবের গাজন উপলক্ষে তা অনুষ্ঠিত হতো। বর্তমানে সমাজ, শিক্ষা, অর্থনীতি, রাজনীতি, পরিবার যেকোনো বিষয় নিয়ে তা রচিত হয় এবং দুজন অভিনেতার (নানা-নাতি) মাধ্যমে নাচ-গান-বাদ্য-সংলাপ সহকারে পরিবেশিত হয়। ব্যঙ্গ-কৌতুক এর মুখ্য রস। এটি একাঙ্কিকা নাটকের মতো; স্বল্পায়তনে স্বল্প সময়ের মধ্যে পরিবেশিত হয়। যাত্রা ও আলকাপ থেকে গম্ভীরার এখানেই পার্থক্য।

লোকমনোরঞ্জক ঘাটু গান ও নাচ মূলত গীতিনাট্য। গায়েন ও দোহার গান করে, বাদক বাজনা বাজায় আর 'ঘাটু' নামে এক বালক কিশোরীবেশে নাচে; নৌকার পাটাতনে এর আসর বসে। তার গান ও নাচের মাধ্যমে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা অভিনীত হয়। আলকাপেও 'ছোকরা' নামে এক তরুণ যুবতীবেশে নাচ-গান করে। উভয়ের বিষয়বস্তু ও পরিবেশনায় অশ্লীলতা আছে, তাই এর আসর বসে সাধারণত লোকালয়ের বাইরে। তবে এখন শহরেও পেশাদার গায়েন ঘাটুগান পরিবেশন করে। ঘাটু ময়মনসিংহ-সিলেট জেলায় প্রচলিত। বর্ধমানের লেটোগানের পালা অংশে গান, নাচ ও অভিনয়ের মিশ্রণ আছে; কবিগানের লড়াই অংশ উত্তর-চাপানের আঙ্গিকে সংলাপের ভাষায় রচিত। উত্তরবঙ্গে প্রচলিত ভাসানযাত্রার বিষয় বেহুলা-লক্ষিন্দরের জনপ্রিয় কাহিনী; সমতল ভূমিতে নির্মিত বৃত্তাকার মঞ্চে এটি অভিনীত হয়।

কারবালার বিষাদময় কাহিনী অবলম্বনে রচিত জারিগানও নৃত্য, বাদ্য ও অভিনয় সহযোগে পরিবেশিত হয়। জারিগানের স্থান প্রধানত দরগাহ। মুহররম উপলক্ষে দশ-বারোজন তরুণ যুবক জারিদল গঠন করে বৃত্তাকারে নেচে নেচে গানের অভিনয় করে। একজন থাকে মূল গায়েন, অন্যরা দোহার হিসেবে ধুয়া গায় ও হাততালি দেয়। অভিনয়গুণের জন্য জারিগানকে রংপুরে 'জারিযাত্রা' বলা হয়। কারবালার কাহিনীকে ইমামচুরি, জয়নাবের বিলাপ, সখিনার বিবাহ ও বিলাপ, জয়নাল উদ্ধার ইত্যাদি পালায় বিভক্ত করে পরিবেশিত হয়। ইসলামি ভাবের জারিগানের উদ্ভাবক স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম সমাজ। বাংলা একাডেমীর লোকসাহিত্য সংকলনে (১৮শ খন্ড) 'জারিযাত্রা' শিরোনামে কারবালার বিষাদময় কাহিনী অবলম্বনে রচিত এরূপ একটি লোকনাট্য প্রকাশিত হয়েছে। এর মূল সংলাপ গদ্যে রচিত, মাঝে মাঝে গান আছে। ঘটনার ক্রমধারায় রচিত গানগুলি কাহিনীকে গতিশীল করে। এদিক থেকে জারিযাত্রার গানই হচ্ছে মূল কাহিনীর প্রাণস্বরূপ। গীতাভিনয় সম্বলিত পালাগানকেও লোকনাট্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। ধর্মীয়, সামাজিক ও ঐতিহাসিক জনপ্রিয় আখ্যান নিয়ে পালাগান রচিত হয়। বাইদ্যানির পালা, গাজীর পালা, বনবিবির পালা, সখিনার পালা ইত্যাদি মূল গায়েন, দোহার ও

বাদক সহযোগে পরিবেশিত হয়। পালাগান বিষয়-রস-রুচির দিক থেকে উন্নত মানের রচনা। সকল স্তরের নরনারী দিনের প্রকাশ্য আসরে এ ধরণের লোকনাট্য উপভোগ করে।

পুতুলনাচ লোকনাট্যের একটি জনপ্রিয় মাধ্যম। পুরাণ, লোককথা ও সমাজ-আশ্রিত যেকোনো কাহিনীকে পুতুলের অভিনয়দ্বারা ফুটিয়ে তোলা হয়। চরিত্র অনুযায়ী পুতুলগুলির অবয়ব, রূপ ও অঙ্গসজ্জা নির্মাণ করা হয়। পুতুলনাচের জন্য বিভিন্ন ধরণের শিল্পী থাকে। সূত্রধর সুতার সাহায্যে পুতুলের অঙ্গভঙ্গি প্রকাশ করে, কথক সংলাপ বলে, গায়ক গান গায় এবং বাদক বাদ্য বাজায়। এ সব কিছুই নেপথ্য থেকে করা হয়, যার জন্য বিশেষ ধরণের মঞ্চ ও মঞ্চসজ্জার প্রয়োজন হয়।

ছড়া সাধারণত শিশুতোষ রচনা হিসেবে পরিচিত। শিশুর মনোরঞ্জন, অবসরযাপন, জ্ঞানবৃদ্ধি ও নীতিশিক্ষার উদ্দেশ্যে এর চর্চা হয়ে থাকে। তবে কিছু কিছু ছড়া সকল বয়সের লোকদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বাংলা ছড়াগুলিকে বিষয়ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়: ছেলেভুলানো ও শিশুতোষ ছড়া, খেলার ছড়া, সামাজিক ছড়া, ঐতিহাসিক ছড়া, আচার-অনুষ্ঠানমূলক ছড়া, ঐন্দ্রজালিক ছড়া, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক ছড়া, পেশাভিত্তিক ছড়া ও নীতিশিক্ষামূলক ছড়া।

অল্পবয়স্ক শিশুদের ভুলানো বা আনন্দ দেওয়ার জন্য মা-বোন, দাদী-নানী প্রমুখ যেসব ছড়া আবৃত্তি করে, সেসব ছেলেভুলানো ছড়া। অনেক সময় শিশু-কিশোররা নিজেরাই ছড়া আবৃত্তি করে আনন্দ উপভোগ করে। এগুলিকে শিশুতোষ ছড়ার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিশোর-তরুণ-যুবক যেসব ছড়া বলে খেলা করে বা খেলা উপলক্ষে ছড়া বলে, সেসব খেলার ছড়া নামে পরিচিত। হাডুডু, কানামাছি ইতাদি খেলায় এরূপ ছড়ার প্রচলন আছে।

শিশু-কিশোরদের মধ্যে লঘু হাস্যরস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক ছড়া রচিত হয়। এতে প্রধানত সমবয়সী ছেলেমেয়ে, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, জামাতা, পশু-পাখি ইত্যাদিকে ব্যঙ্গ বা সমালোচনা বা হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। কোনো কোনো কাজে শ্রমলাঘব করা ও প্রেরণা দেওয়া বা চিত্তবিনোদনের জন্যও ছড়া রচিত হয়। বাইস্কোপ দেখানোর সময় ছড়া কেটে চিত্রের বর্ণনা দেওয়া হয়; এটি জীবিকার সঙ্গে যুক্ত। নীতি-উপদেশ, অঙ্ক-জ্যোতিষ ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান দানের জন্যও ছড়া আছে।

সামাজিক ছড়াগুলি রচিত হয় পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা, ভাই-বোন, শাশুড়ি-বধূ, জামাতা, ধোপা, নাপিত, মালী, তাঁতি, কামার, কুমার, দারোগা, পেয়াদা, জমিদার, রাজা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে। ঐতিহাসিক ছড়াগুলিতে জাতীয় জীবনের অনেক অলিখিত ইতিহাস লিপিবদ্ধ থাকে। ‘ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো, বর্গী এলো দেশে’ এ ছড়াটিতে বর্গী কর্তৃক বাংলা আক্রমণের কথা আছে। ‘জাত মারলে পাদ্রী ধরে/ ভাত মারলে নীল বাঁদরে। বিড়াল চোখে হাঁদা হেমদো/ নীলকুঠির নীল মামদো।’ এ ছড়াটিরও ঐতিহাসিক পটভূমি আছে। খ্রিস্টান পাদ্রি অসহায় মানুষের ধর্মনাশ করে, আর নীলকর সাহেব কৃষকের ভূমি ও রুজি গ্রাস করে। ‘বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর নদে এলো বান/ শিব ঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যা দান।’ এ ছড়ায় এক পাত্রে তিন কন্যা সম্প্রদান তথা বহুবিবাহের চিত্র আছে। গোপীচন্দ্রের গান নাথগীতিকায় রাজপুত্র গোপীচন্দ্র রাজকন্যা অদুনাকে বিয়ে করে পদুনাকে দান হিসেবে লাভ করে; এখানে আছে শ্যালিকাকে পত্নীরূপে লাভ করার দৃষ্টান্ত।

মন্ত্রের ছড়ায় প্রাচীন বিশ্বাস-সংস্কারের বীজ আরও সজীব ও প্রকট। বৃষ্টি আবাহনের জন্য বলা হয়, ‘আয় বৃষ্টি ঝেঁপে, ধান দিব মেপে’; আবার বৃষ্টি বারণের জন্য বলা হয় ‘লেবুর পাতায় করঞ্চা, এই মেঘখান উড়ে যা’ ইত্যাদি। বৃষ্টির আবাহনে ছড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু আচার পালনেরও ব্যাপার আছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মাথায় কুলা নিয়ে বাড়ি বাড়ি যায় এবং ছড়া বলে মাগনের চাল-ডাল সংগ্রহ করে; গৃহস্থরা তখন কুলায় পানি ঢালে আর সেই পানি গা বেয়ে মাটিতে পড়ে। এটি হলো বৃষ্টির নকল। ব্রতের ছড়ায় আরাধ্য দেবতার কাছে মনস্কামনা ব্যক্ত করে ফলের প্রত্যাশা করা হয়। দশপুত্তল ব্রতে সুস্থ, সুন্দর ও আদর্শ জীবন কামনা করা হয়; ভাইফোঁটা ব্রতে সহোদর ভাইয়ের সৌভাগ্য ও মঙ্গল কামনা করা হয়; লক্ষ্মীর ব্রতে পিতা-ভ্রাতার নিরাপদ বাণিজ্য-যাত্রা কামনা করা হয়। এছাড়া সন্তান, ভালো ফসল, নীরোগ জীবন ইত্যাদি লাভের উদ্দেশ্যে আরও অনেক ব্রত আছে যাতে ছড়ার মাধ্যমে মনস্কামনা ব্যক্ত করা হয়। এসব ছড়ায় ধর্মের আড়ালে বিষয়বুদ্ধিই প্রধান থাকে; পরকালের সুখ-স্বপ্ন-আনন্দ এতে অনুপস্থিত।

মন্ত্র এ ধরণের সাহিত্য গ্রামের সাধারণ মানুষের বিশ্বাস, কুসংস্কার এবং কতিপয় মানুষের প্রতিহিংসাবৃত্তি থেকে সৃষ্টি হয়েছে। যেমন, 'আওলা চাল বকের পাক/ যেমন পিঠা তেমন থাক' এটি হলো পিঠা নষ্ট করার একটি মন্ত্র। তৈরি খাবারে 'নজর' দিলে বদহজম হয় এ বিশ্বাসও গ্রামের মানুষের আছে এবং সেজন্য নির্দিষ্ট ছড়াও আছে। বড়শি দিয়ে মাছ শিকারের জন্যও বিভিন্ন মন্ত্র আছে। রোগ-ব্যাধিকে দীর্ঘস্থায়ী করা, আবার রোগ সারানোর জন্যও মন্ত্র আছে।

ফসলের ওপর যাতে কুলোকের কুদৃষ্টি না পড়ে সেজন্য কৃষক বীজ বুনে ক্ষেতের চারপাশে পানি ছিটিয়ে দেয়, আর ক্ষেত-বন্ধনের মন্ত্র বলে: 'জিও জালা, জিও/ হাত ধুইয়া দিলাম পানি/ ধান হইস্ পোড়া খানি/... আমার ক্ষেত দেখ্যা যে নজর লাগায়/ তার মা-পুলা ভাতে মারা যায়।' চোর থেকে সম্পদ রক্ষার জন্য 'চোরবন্দী' এবং ভূতপ্রেত থেকে মুক্ত থাকার জন্য 'শরীরবন্ধন' মন্ত্র আছে। এরূপ বন্ধনমন্ত্র আরও আছে, যেমন 'অগ্নিবন্ধন', সর্পবন্ধন', 'বাঘ ও সাপের মুখখিলানী', 'হাতিবন্ধন', 'বোলতাবন্ধন', 'বন্যা প্রতিরোধ', 'গৃহবন্ধন' 'বিষঝাড়া' ইত্যাদি মন্ত্র। এর কতক মন্ত্র প্রতিরোধক এবং কতক প্রতিষেধক। অন্যের ক্ষতি করার জন্য 'বাণমারা মন্ত্র' আছে, আবার নারী-পুরুষ পরস্পরকে বশ করার জন্য আছে 'বশীকরণ মন্ত্র'। কোনোটি ছড়ার মতো আবৃত্তি করা হয়, আবার কোনোটি শ্লোকের মতো পাঠ করা হয়।

মন্ত্রের ভাষায় হিন্দু ও মুসলমানের ঐতিহ্য কোথাও আলাদাভাবে, কোথাও মিশ্রভাবে আছে। কোনো কোনো দেবদেবী, পীর-পীরানি বা ধার্মিক ব্যক্তির দোহাইও আছে। মন্ত্রগুলি দুই থেকে আট-দশ চরণে ছন্দোবদ্ধ ও চরণাশ্রিত কতগুলি শব্দসমষ্টি; এর ভাষায় কোনো কবিত্ব নেই। উপলক্ষ বা প্রয়োজন ছাড়া যখন তখন এবং যেখানে সেখানে এগুলি উচ্চারিত হয় না।

মন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত আছে কিছু লৌকিক ক্রিয়া, যাকে বলা হয় মন্ত্রাচার। এতে জাদুর প্রভাবও আছে। শুভ-অশুভ, ইষ্ট-অরি সকল শক্তির অধিকারী হওয়া বা তাকে বশে আনার চেতনা থেকেই জাদুর উদ্ভব। জাদু প্রধানত দুই প্রকার শুক্ল জাদু (white magic) ও কৃষ্ণ জাদু (black magic)। প্রথমটি মঙ্গলজনক এবং দ্বিতীয়টি অমঙ্গলজনক বা ধ্বংসাত্মক। ঝাড়-ফুঁক চিকিৎসাদিতে ব্যবহৃত জাদু মঙ্গলজনক; এসব প্রকাশ্যে অনুশীলিত হয়। মারণ, উচাটন, বশীকরণ ইত্যাদি অনিষ্টকর; এগুলি গোপনে নিষ্পন্ন হয়। মন্ত্র হলো জাদুর বাঙ্ময় রূপ। মন্ত্রের মধ্যে জাদুশক্তি আছে; মন্ত্রোচ্চারণ এবং তৎসংশ্লিষ্ট কিছু আচার পালন করে জাদুশক্তির প্রকাশ ঘটানো হয়। মাদুলি, তাবিজ, তাগা, কবজ ইত্যাদি বস্তুকে মন্ত্রপূত করে জাদুগুণ সম্পন্ন করা হয়। ওঝা, বৈদ্য, কবিরাজ, পুরোহিত, সাধু-সন্ন্যাসী, পীর-ফকির, বেদে-বেদেনী, ধাত্রী, শিরালি প্রভৃতি পেশাদার ও অপেশাদার ব্যক্তি মন্ত্রের প্রয়োগ করে থাকে। যেহেতু জাদুমন্ত্র গুপ্তবিদ্যা, সেহেতু এর সবকিছুতে গোপনীয়তা রক্ষা করতে হয়। শিষ্য ছাড়া অন্যকে মন্ত্রশিক্ষা দেওয়া যায় না। বার-তিথি, ক্ষণ-কাল, স্থান-পাত্র ইত্যাদির বাছ-বিচার করে মন্ত্র প্রয়োগ করতে হয়; পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হয়। মন্ত্রোচ্চারণে বা মন্ত্রাচারে ত্রুটি হলে লক্ষ্য অর্জন দূরের কথা, প্রয়োগকারী নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় লোকসমাজে এরূপ বিশ্বাস প্রচলিত আছে।

ব্যক্তি, গার্হস্থ্য ও সমাজজীবনের নানা ক্ষেত্রে জাদুমন্ত্রের ব্যবহার আছে। মধ্যযুগের কাব্য, ব্রতকথা, লোককাহিনী, লোকবিশ্বাস, লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান, চিকিৎসা, কৃষিকাজ ও অন্যান্য পেশায় জাদুমন্ত্রের প্রভাব লক্ষ করা যায়। আসামের কামাখ্যা ছিল মন্ত্রশিক্ষার কেন্দ্র; বাংলাদেশ থেকে বহু লোক সেখানে জাদু শিখতে যেতো। পূর্বোক্ত গ্রামবন্ধনের মন্ত্রে 'কামিখ্যা পর্বতে'র উল্লেখ আছে।

বাংলা লোককাহিনীতে কায়ার পরিবর্তন বা আত্মার রূপান্তর (transformation of soul) একটি উল্লেখযোগ্য মোটিফ; স্টিথ থম্পসন একে ডি-৬৯৯ সংখ্যক মোটিফ-সূচির অন্তর্ভুক্ত করেছেন। গোপীচন্দ্রের গান থেকে জানা যায় যে, রাজমাতা ময়নামতী মন্ত্রজ্ঞানী ছিলেন; মৃত স্বামীর প্রাণ ফিরে পাওয়ার জন্য যমের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব হয়।

মন্ত্র আসলে অজ্ঞ ও অসহায় মানুষের সান্ত্বনামাত্র; বিজ্ঞানের সঙ্গে এর কোনো যোগসূত্র নেই। মন্ত্র মানুষের বিশ্বাস, দৈবনির্ভরতা ও অদৃষ্টবাদের ওপর ভরসা বাড়িয়েছে, প্রকৃত মুক্তি দেয়নি। তবে কোনো কোনো মন্ত্রাচারে রোগী সেবাজনিত উপকার পায়; তাতে কিছুটা মনস্তাত্ত্বিক উপকার হয়; অন্যথায় মন্ত্র সম্পর্কিত আর যা কিছু সবই নিষ্ফল প্রয়াস

মাত্র। মন্ত্রের ভাষায় আল্লাহ, রসুল, চন্ডী, মনসা, শিব, পার্বতীর দোহাই থাকলেও তাতে আধ্যাত্মিকতা নেই; ঐহিক চেতনা এবং স্বাস্থ্য, সম্পদ, সুখ ও শান্তির বাসনাই মুখ্য। মন্ত্রের ভাব ও ভাষায় হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান সংস্কৃতির প্রভাব পড়েছে।

ধাঁধা এক প্রকার রহস্যপূর্ণ রচনা। 'ধন্দ' শব্দ থেকে এর উৎপত্তি; অর্থ সংশয়, দুরূহ সমস্যা ইত্যাদি। এর আরেক নাম 'হেঁয়ালি'। এতে মূলত একটি জিজ্ঞাসা থাকে এবং তার উত্তরটিও পরোক্ষভাবে এরই মধ্যে বিদ্যমান থাকে। মূল বিষয়কে আড়াল করে শব্দের জাল বুনে তা রচনা করা হয়। তাই উত্তরদাতাকে উপমা-রূপক-প্রতীকের রহস্যভেদ করে উত্তর দিতে হয়।

ধাঁধাচর্চায় কমপক্ষে দুজনের উপস্থিতির প্রয়োজন হয় একজন ধাঁধা ধরে, অন্যজন উত্তর দেয়। 'সাগরেতে জন্ম তার লোকালয়ে বাস/ মায়ে ছুঁলে পুত্র মরে একি সর্বনাশ।' এ ধাঁধাটির উত্তর 'লবণ'। এখানে 'সাগর', 'লোকালয়', 'মা' ও 'পুত্র' প্রতীকী শব্দ। সমুদ্রের পানি শুকিয়ে লবণ তৈরি করা হয়, আবার পানিতে দিলে সে লবণ গলে যায়। ধাঁধায় বর্ণিত এ চিত্রটি যেমন পরোক্ষ, তেমনি রহস্যপূর্ণ। এটি নির্মাণে যেমন প্রতিভার প্রয়োজন, তেমনি উত্তর দিতেও উপস্থিত বুদ্ধির প্রয়োজন।

ধাঁধা রচনায় বুদ্ধির সঙ্গে কল্পনার মিশ্রণ আছে, তবে আবেগের স্থান নেই। এজন্য ধাঁধার অবয়ব দীর্ঘ হয় না। গদ্যে ও পদ্যে ধাঁধা রচিত হয়। সাধারণত গদ্যাত্মক একটি বাক্যে অথবা ছন্দোবদ্ধ ও অন্ত্যমিলযুক্ত দুই থেকে চার চরণে ধাঁধা সমাপ্ত হয়। ধাঁধাকে লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম শাখার একটি বলা হয়। গ্রিক পুরাণে ধাঁধা আছে; স্ফিঙ্কস ইডিপাসকে মানুষ সম্পর্কীয় একটি ধাঁধা ধরেছিল এবং ইডিপাস তার উত্তর দিয়ে থীবসের অভিশাপ থেকে জনগণকে রক্ষা করে। ভারতের আদি গ্রন্থ ঋগ্বেদেও ধাঁধা আছে। অশ্বমেধযজ্ঞে হোতা ও ব্রাহ্মণগণ একে অপরকে ধাঁধা জিজ্ঞেস করতেন। এছাড়া অথর্ববেদ, মহাভারত, জাতক, কথাসরিৎসাগর, নাথসাহিত্য, চন্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, শিবায়ন, গোপীচন্দ্রের গান ইত্যাদিতেও প্রচুর ধাঁধার ব্যবহার আছে।

বাংলা ও ভারতের বিভিন্ন গোত্রের আদিবাসীরা বিবাহ, কৃষিকাজ, মৃতদেহ সৎকার, মন্ত্রাচার ও ধর্মানুষ্ঠানে ধাঁধার অনুশীলন করে। ছোটনাগপুরের ওরাওঁ উপজাতির বিবাহানুষ্ঠানে ধাঁধার মাধ্যমে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করা হয়। মধ্যপ্রদেশের গড় উপজাতির লোকেরা মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানের একটি অঙ্গ হিসেবে ধাঁধার চর্চা করে; তারা বিবাহানুষ্ঠানেও বরপক্ষকে ধাঁধাযুদ্ধে নাজেহাল করে। আসাম ও বাংলাদেশের অরণ্যচারী নাগা, কুকি, গারো, কোচ ও মুরং উপজাতির কৃষকরা ফসল পাকার সময় ধাঁধা বলে আনন্দ করে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের আদিবাসীদের মধ্যেও ধাঁধার প্রচলন আছে। বাংলাদেশে ধাঁধার চর্চা হয় মূলত বিবাহোপলক্ষে বর ও কনে নির্বাচনে বুদ্ধি পরীক্ষায়, বিবাহ-বাসরে বরপক্ষ ও কনেপক্ষের মধ্যে আমোদ-প্রমোদমূলক প্রতিযোগিতায়, কিশোর ও তরুণদের মধ্যে অবসরযাপন এবং কখনো কখনো গৃহস্থালি কাজকর্মের অবসরে চিত্তবিনোদনের অঙ্গ হিসেবে।

বাংলা ধাঁধাকে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক মানুষ ও তার অঙ্গবাচক, প্রাণী ও তার অঙ্গবাচক, উদ্ভিদ ও ফলমূলবাচক, প্রকৃতি ও নিসর্গবাচক, খাদ্যদ্রব্য ও তৈজসপত্রবাচক, অক্ষর ও সংখ্যাবাচক, বাদ্যযন্ত্রবাচক, ভাব ও ক্রিয়াবাচক ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এসব বিচিত্র বিষয় নিয়ে রচিত ধাঁধায় বাঙালি জাতির কল্পনাশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, বিষয়জ্ঞান, সৌন্দর্যচেতনা, কৌতুকবোধ ও চিত্তস্ফূর্তি প্রকাশ পেয়েছে।

একটি জাতি বা জনগোষ্ঠীর আত্মার মর্মস্থল থেকে ধাঁধার উদ্ভব হয় বলে তাতে সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়। 'এক বাড়ির তিন বউ/ এক পালাইলে রান্না থোও।' (উনুন) এটি একান্নবর্তী পরিবারের অন্তরঙ্গতার ছবি; 'মামুরা সিন্নি রান্ধে খায়/ আমাকে দেখ্যা দুয়ার দেয়।' (শামুক) এখানে আত্মীয়তার মধুর সম্পর্কে ফাটল ধরার কথা ব্যক্ত হয়েছে। অনুরূপভাবে 'কালো বউয়ের কপালে চিক/ জামাই এলে করে হিত।' (মাসকলাই), 'ছোট ইটা ছেমরি/ নায়না ধোয়না এতই সুন্দরী।' (রসুন), 'তলে মাটি উপরে মাটি/ মধ্যে সুন্দরী বেটি।' (হলুদ), 'ঘরের মধ্যে ঘর/ নাচে কন্যা-বর।' (মশারি) ইত্যাদি ধাঁধা পারিবারিক জীবনের বিভিন্ন চিত্রকে ধারণ করে আছে।

প্রবাদ লোকসাহিত্যের শাখাগুলির মধ্যে প্রবাদ অতীতের বিষয় হয়েও সমকালকে সবচেয়ে বেশি স্পর্শ করেছে। আধুনিক যুগে প্রায় সব ধরণের রচনায় প্রবাদ ব্যবহৃত হয়। কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, নাটক, সংবাদপত্র, বিজ্ঞাপন, বক্তৃতা, দৈনন্দিন কথাবার্তা ইত্যাদিতে প্রবাদের ব্যবহার অহরহ লক্ষ করা যায়। লোকসাহিত্যধারায় প্রবাদ হলো ক্ষুদ্রতম রচনা। একটি সংক্ষিপ্ত বাক্য থেকে ছন্দোবদ্ধ দুই চরণ পর্যন্ত প্রবাদের অবয়বগত ব্যাপ্তি।

প্রবাদ মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত বৌদ্ধিক রচনা। যেকোনো প্রবাদ মানুষের ব্যবহারিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থেকে জন্ম নেয়। 'অতি সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট', 'চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে', 'জোর যার, মুল্লুক তার', 'লাগে টাকা দেবে গৌরীসেন' ইত্যাদি প্রবাদের গঠন অত্যন্ত সংহত, অথচ ভাবার্থ অত্যন্ত ব্যাপক; স্বল্প কথায় এত বেশি অর্থবহনক্ষমতা প্রবাদ ছাড়া লোকসাহিত্যের অন্য শাখায় নেই।

প্রবাদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশেষ উক্তি বা কথন। যে উক্তি লোকপরম্পরায় জনশ্রুতিকে নির্ভর করে চলে আসছে তাই প্রবাদ। প্রবাদ সমাজমানসে জন্ম নিয়ে পাথরের নুড়ির মতো জীবনস্রোতের অনেকখানি পথ অতিক্রম করে একটি নিটোল রূপ লাভ করে। পরে আর তেমন কাঠামোগত পরিবর্তন হয় না। উল্লেখ্য যে, প্রবাদ ও বাগ্ধারার মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রবাদ হচ্ছে একটি অর্থপূর্ণ সংক্ষিপ্ত বাক্য, আর বাগ্ধারা হচ্ছে অর্থপূর্ণ একটি বাক্যাংশ বা শব্দগুচ্ছ।

দেশের প্রকৃতি-পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা, প্রাণী, সম্পদ, উৎপাদন ও জাতীয় জীবনের নানা ধারা, তার ইতিহাস, সংস্কৃতি, ধর্ম, সমাজ, পরিবার, ঘর-সংসার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে প্রবাদ রচিত হয়। এগুলি খন্ড হলেও দেশ ও জাতির খাঁটি চিত্র; কারণ প্রবাদ লোকমনের সত্যরূপ বহন করে।

প্রবাদ বহু প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত আছে। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে মিশরের প্যাপিরাসের গল্পে প্রবাদ আছে। ভারতীয় বেদ-উপনিষদ এবং বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদেও প্রবাদ আছে। 'আপনা মাসে হরিণা বৈরি' প্রবাদটি চর্যাপদকর্তা ভুসুকু ব্যবহার করেন, তাঁর আবির্ভাবকাল এগারো শতক; চৌদ্দ শতকে বড়ু চন্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এবং ষোলো শতকে মুকুন্দরাম চন্ডীমঙ্গলে একই প্রবাদ ব্যবহার করেন। আধুনিক যুগে বাংলা সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি ও প্রসার ঘটলে প্রবাদের ব্যবহারও ব্যাপক হয়।

Unit 6: Folk Festivals

লোক উৎসব:

কোনো জনগোষ্ঠীর জীবনঘনিষ্ঠ সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যবাহী উৎসবকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে লোক সংস্কৃতি এবং পালন করা হয় লোক উৎসব। বাংলার লোক সমাজের ইতিহাস অতি প্রাচীন, বৈচিত্র্যময় এবং ব্যাপক। এই ব্যাপকতার মধ্যে রয়েছে বাংলার লোককাহিনী, লোকগীতি, লোকনৃত্য, লোকক্রীড়া, লোকচিকিৎসা, লোকজ গণমাধ্যম, লোকগান, লোক ভঙ্গিমা, লোকসংস্কার- এসবই লোকসংস্কৃতির নানা অঙ্গ।

দীর্ঘকাল থেকে গড়ে ওঠা লোক সম্প্রদায়ের সামাজিক আচার-আচরণ ও বিশ্বাস, যাপিত জীবন, আনন্দ-উৎসব বাংলার মানুষের প্রকৃত পরিচয় বহন করে। স্থুলভাবে কেউ কেউ হয়তো বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে নগর সংস্কৃতি, গ্রাম বাংলার সংস্কৃতি ও আদিবাসীদের সংস্কৃতি এমনই তিন ভাগে ভাগ করে থাকেন। প্রকৃত অর্থে বৈশিষ্ট্য-বৈচিত্র্যে পৃথক হলেও এবং এই তিন সংস্কৃতি একসূত্রে গাঁথা না হলেও একে অন্যের পরিপূরক। তবে গ্রাম প্রধান বাংলায় গ্রামের বিশাল জনগোষ্ঠী শত শত বৎসর ধরে তাদের নিজস্ব ধ্যানধারণা ও জীবনযাপন প্রণালীকে ভিত্তি করে নানামুখী যে সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে তাই আমাদের লোক সংস্কৃতি।

প্রাকৃতিক পরিবেশে লালিত-পালিত বিশ্বের নানা স্থানের জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা, সমাজ-ব্যবস্থা, আচার-আচরণ বিশ্বাস-সংস্কার মিলিয়ে তাদের যে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি গড়ে ওঠে তার মধ্যে এক বিস্ময়কর সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। মূলত বাংলায় লোকসমাজ
লোকায়ত সমাজ কৃষিভিত্তিক; বস্তুত কৃষি নির্ভর। আর এ কারনেই এখানকার জন-জীবন কৃষিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। প্রাত্যহিক জীবনাচার থেকে শুরু করে লোকশিল্প, লোকসাহিত্য, লোকনৃত্য,লোকক্রীড়া প্রভৃতি লোকসংস্কৃতির মাঝে কৃষিভিত্তিক জীবনাচারেরই প্রতিফলন ঘটে। মধ্যযুগে ও এ শতাব্দীর তিরিশ চল্লিশ দশক পর্যন্ত যেসব পালা পার্বণ কে কেন্দ্র করে যেসব গানের আসর বসত, যাত্রাপালার আসর বসত ,গ্রামের মানুষ তা শ্রোতার আসনে বসে সারারাত জেগে উপভোগ করত। নিম্নে বাংলার কিছু লোক উৎসব সম্পর্কে লোক উৎসব এবং লোক শিল্পের গবেষক হীরেন্দ্রনাথ মিত্রের কিছু গ্রাম বাংলার বিভিন্ন লোক উৎসব সম্পর্কে অভিজ্ঞতা এবং লেখা সংক্ষেপে আলোচনা করা হল:

উলাইচণ্ডীর জাত

রাত থাকতে থাকতেই ওরা এসে হাজির হয়। বটগাছের তলায় মা উলাইচণ্ডীর থানে। বাঁধানো চাতালের ওপরে বেদী, তার ওপরে সিঁদুরমাখানো শিলাখণ্ড। বিশাল বটগাছ ডালপালার চাঁদোয়া খাটিয়ে রেখেছে মায়ের মাথার ওপরে। সেই চাঁদোয়ার ফাঁক দিয়ে শুক্লপক্ষ রাত্রির খামচা খামচা জ্যোৎস্না এসে চাতালের ওপরে পড়ে থাকলেও চারপাশের ঝোপঝাড়ে আর ওপরে বটগাছের ডালপালায় রাতের অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে। বটগাছের ডালে-ডালে পাখিদের বাসায় তখনও কারও ঘুম ভাঙেনি। এই আলো আঁধারি নিঝুম শেষরাতে ওরা নিঃশব্দেই আসে, বটগাছের তলায় উলাইচণ্ডীর বৈশাখী পূর্ণিমার জাত। সকাল হলেই সাতগাঁয়ের মানুষ আসবে আজ এখানে, মায়ের থানে পুজো দেবে, ছাগল, ভেড়া, পায়রা বলির মানত শোধ করবে। এই বটগাছের তলায় সারাদিন ধরে আজ চলবে ঢাক, ঢোল, ব্যাগপাইপ, ব্যান্ডের বাজনা।

ওরাও তো তখন আসতে পারত পুজো দিতে। কী দরকার ছিল রাত থাকতে থাকতে নিরিবিলিতে চুপিসাড়ে পুজো সারার। কিন্তু তখন যে উঁচু জাতের মানুষদের ছোঁয়াছুঁয়ির ভয় আছে। ওরা যে জাতে 'হাড়ি', 'অস্পৃশ্য'। ছোঁয়াছুঁয়ির হাঙ্গামা এড়াবার জন্যেই তো ওদের রাত থাকতে থাকতে মা উলাইচণ্ডীর পুজো দিতে আসতে হয়। তখন দুদণ্ড মায়ের কাছে শান্তিতে নির্ভয়ে। ওরা আসতে পারবে, মন খুলে মাকে ডাকতে পারবে।

হাড়ির ঝি চণ্ডী

আর মা উলাইচণ্ডী যে ওদের একান্ত আপনার জন, নাড়িছেঁড়া ধন-হোন না কেন উনি জগদীশ্বরী, জগজ্জননী। জগজ্জনে জানে-মা যে ওদেরই মেয়ে। ভূত-প্রেত-ডাইনি তাড়াতে, সাপের বিষ, বিছের বিষ ঝাড়াতে ওঝাগুণিনরা ধুলোপড়ায়, জলপড়ায়, মা মনসা, মা কামাখ্যা, মা চণ্ডীর দোহাই পাড়ে। 'কার আচ্ছে? হাড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে?"-মা চণ্ডীর দোহাই পাড়তে ওঝাগুণিনরা এ কথা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে না? ওদের বিশ্বাস আর গর্ব-মা হাড়িদেরই মেয়ে, হাড়িদেরই ঘরে মায়ের জন্ম: ওরাই মাকে খাইয়েছে, পরিয়েছে, মানুষ করেছে, আর দেবাদিদেব শিবঠাকুর তাঁকে বিয়ে করে ওদের কাছ থেকে নিয়ে গেছেন; দীনদুঃখীর ঘরের মেয়ে দেবাদিদেবের ঘরণী: তিনি বিশ্বজনকে খাওয়াচ্ছেন, লালন করছেন বিশ্বজননী হয়ে। হাড়িদের ঘেন্না করলে কী হবে। হাড়িদেরই মেয়েকে সবাই মা বলে ডাকছে, ভয়ভক্তি ছেন্দা করছে, বামুন-পুরুতে মন্ত্র পড়ছে, পুজো করছে! জাতের দিন ভক্তদের পুজোর উপচারে মা উলাইচণ্ডীর চাতাল ভরে, মানত শোধের বলির পাঁঠা, ভেড়া, পায়রার রক্তে মাটি ভাসে। হাড়ির ঝির এত আদর, হাড়িদের গরবে বুক ফুলবে না? মায়ের

সঙ্গে হাড়িদের নাড়ির সম্পর্ক আছে বলেই না উঁচু জাতের মানুষরা ওদের এখানে এসে পুজো করবার অধিকার কেড়ে নিতে পারেনি।

শূকরবলির কিংবদন্তী

কী ওদের মন্ত্র, কী ওদের ধ্যান-স্তব, কী ওদের পুজোপদ্ধতি তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। কেউ দেখতেও আসে না, ওরা কখন আসে, কখন পুজো সারে। নানান কাহিনী, কিংবদন্তী নানান লোকের মুখে ফেরে। কেউ বলে ওরা শূয়োর বলি দেয়, নারকেলের মালায় মদ রেখে মাকে উৎসর্গ করে। কেউ বলে ওরা পুরোহিত নিয়ে আসে-পতিত ব্রাহ্মাণ। সেই পুরোহিতই ওদের পুজো নিবেদন করে। সে ব্রাহ্মণ শাস্ত্র নির্ধারিত মন্ত্রতন্ত্র, যথারীতি পূজোপদ্ধতি মেনে চলে, না, নিজেদের প্রাণের ভাষায়, ভক্তি শ্রদ্ধার সরল আবেগে নিজেদের ইচ্ছে আর রুচিমত অর্চনা করে যায়, কেউ ভা বলতে পারে না। শুধু সকাল হলে দেখা যায় মা উলাইচণ্ডীর থানে বটগাছের ভলার পড়ে আছে পুজোর টাটকা ফুল, সিঁদুর, নিভে যাওয়া মাটির প্রদীপ, পুড়ে যাওয়া ধূপের ছাই। কখনও বা বাঁশের হাড়িকাঠ পোঁতা, মাটিতে রক্তের দাগ, শূকরবলির চিহ্ন হয়তো।

ডাকাত ধরায় উলার নাম পরিবর্তন

আঠারো শতকের শেষভাগে এ অঞ্চলে ডাকাতের ভয়ানক উপদ্রব ছিল। ডাকাতের খাল নামটিতে তারই যেন ইঙ্গিত আছে। উলার অধিবাসীরা কয়েকজন ডাক্সাইটে ডাকাত ধরে তখনকার ইংরেজ শাসকদের দারুণ মাথাব্যথা থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন বলে তাঁরা উলাবাসীর বীরত্বের জন্যে 'উলা' নামটি পালটিয়ে 'বীরনগর' নাম রাখেন। নদীয়ার পুরনো ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে প্রকাশিত ১৮০০ সালে তদানীন্তন রাজস্ব ও বিচার বিভাগীয় সেক্রেটারী জে লামডেন সাহেবের লেখা একখানা লম্বা চিঠিতে এর বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।

উলা-বীরনগরের গ্রামদেবী উলাইচণ্ডীর বৈশাখী পূর্ণিমার জাত বা যাত্রা ঐ অঞ্চলের খুব পুরনো, প্রসিদ্ধ লোক উৎসব। কলকাতা থেকে রেলপথে ৫১ মাইল দূরে চুণী নদীর তীরে অবস্থিত নদীয়া জেলার এই প্রাচীন গ্রামটির এই উৎসবে আজও বিপুল জনসমাগম হয়।

নদীয়া জেলার তো বটেই, হুগলি, হাওড়া, বর্ধমান জেলা থেকেও হাজার হাজার মানুষ এসে হাজির হয় উলাইচণ্ডীতলায়। সারাদিন সেখানে উলাইচণ্ডীর শিলামূর্তির পুজো হয়। বহু পাঁঠাবলি পড়ে, দুলে-বাগদিরা পায়রাবলিও দেয়। মোষবলি এখন বন্ধ। শূকরবলিও প্রায়শ বন্ধ। ছাগল- ভেড়ার বলির সংখ্যাও অনেক কমছে। আগে যেখানে কমসে কম পাঁচ-ছশো ছাগল-ভেড়া বলি পড়ত সারাদিনে, এখন সেখানে তার সংখ্যা দেড়শোতে ওঠে কিনা সন্দেহ। মানুষের আর্থিক দূরবস্থাই এর মুখ্য কারণ নিশ্চয়ই, তার ওপর রুচি বদলেরও প্রশ্ন আছে।

হাড়িদের পুজোর অগ্রাধিকার

উলাইচণ্ডীর জাতে আজও রাত থাকতে থাকতে হাড়িদের পুজো হয়। এই তথাকথিত অন্ত্যজ, অস্পৃশ্যদের পুজোয় অগ্রাধিকারকে কেউ কেড়ে নিতে পারেনি। নদীয়ার রাজাদের নামে পুজো হয়। তারপর তিন মহলের পুজোর পর উলাইচণ্ডী সর্বসাধারণের পুজো নেবেন-এই-ই হচ্ছে এখানকার রেওয়াজ।

বর্ণাশ্রমধর্মশাসিত হিন্দুসমাজের মধ্যে যারা তথাকথিত অস্পৃশ্য অপাঙ্‌ক্তেয়, একেবারে নিচের থাকের জনগোষ্ঠী, তাদের অনেক দেবদেবী, ধর্মচর্যা, সংস্কৃতি কালক্রমে ওপরের থাকের জনগোষ্ঠীর অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য সমাজের স্বীকৃতি, সম্মান, পুজো পাচ্ছে। এ তথ্য নৃতাত্ত্বিক, সমাজ-বিজ্ঞানী গবেষকদের সন্ধানী চোখে ধরা পড়েছে। তাঁদের মতে ব্রাহ্মণ্য তথা আর্য আর অনার্য সংস্কৃতি অনেক সংঘাত, সমন্বয় এবং সমীকরণের পর হিন্দু ধর্মের বর্তমান বিশাল বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে। হিন্দু সংস্কৃতির সেই বিচিত্র সংঘাত ও সমন্বয়ের রূপ বাংলাদেশেও সুস্পষ্ট। উলার উলাইচণ্ডীর জাত এমনই সংঘাত-সমন্বয়ে গড়া একটি উৎসব।

বাংলাদেশে আর্যীকরণ শুরু হয়েছে অনেক দেরিতে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে গুপ্ত আমলে। তার আগে এখানকার আদিম অধিবাসীরা-নিগ্রোবটু, আদি অস্ত্রাল, ভূমধ্যসাগরীয়, মোঙ্গলাকার প্রভৃতি বিভিন্ন জাতের মানবগোষ্ঠী নিজেদের আচার-আচরণ, সংস্কার, ধর্মচর্যাকে পারস্পরিক সংঘাত- সমন্বয়ের পথে গড়ে তুলেছিল। কালক্রমে প্রবল শক্তিশালী আর্য তথা ব্রাহ্মণ্য-সংস্কার এসে তাদের সামনে দাঁড়িয়েছে। এবং তাকেও সংঘাত, সমন্বয়, সমীকরণের পথে এখানকার পুরনো সভ্যতা- সংস্কৃতির সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়েছে। এইভাবেই বাংলার পুরনো অনেক দেব-দেবী, ধর্ম- সংস্কার, ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের অঙ্গীভূত হয়েছে, যদিও তাদের সেই পুরনো লোকায়ত সহজ, সরল চেহারাকে ব্রাহ্মাণ্য ভাবাদর্শে পরিণত দার্শনিক চিন্তাধারায় আর উঁচু আধ্যাত্মিক তাৎপর্যে নতুন অঙ্গরাগ করা হয়েছে। কিন্তু এই নতুন অঙ্গরাগ অনেক ক্ষেত্রেই প্রাচীনদের আদিম স্বরূপকে সম্পূর্ণ ঢাকা দিতে পারেনি, সে বেরিয়ে পড়ে নানান সূত্রে। এর স্পষ্ট উদাহরণ চণ্ডী দেবী। শাস্ত্রীয় ধ্যান- মন্ত্রে, পুজোপদ্ধতিতে এবং ব্রাহ্মণেরই পৌরোহিত্যে এঁর অর্চনা প্রচলিত।

মুর্শিদাবাদের বেরা উৎসব

সারাদিন দারুণ গুমোটের পর সন্ধ্যের মুখেই একচোট খুব বৃষ্টি হয়ে গেছে। রাতটা তাই বেশ ঠান্ডা। প্রকৃতিও আর কোনও অঘটন ঘটায়নি। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আকাশ। শুক্লা চতুর্থীর ক্ষীণার্থী চন্দ্রকলা, একবার মাথার ওপরে দেখা দিয়েই ফখন উধাও হয়েছে। নক্ষত্র-চর্চিত বিশাল আকাশখানা বর্ষাস্ফীত ভাগীরথীর জলে মুখ দেখবার জন্যে ঝুঁকে পড়লেও আজ রাত্তিরে তার সুন্দর মুখে নয়, আর এক অন্য রূপে ভাগীরথী রূপময়ী হয়ে উঠেছে। বাঁশ আর কলাগাছ দিয়ে তৈরি বিচিত্রগঠন প্রকাণ্ড ভেলা মোমবাতির আলোর গহনা পরে ভাগীরথীর জলে ভাসছে। বাখাবি, চেঁচাবির কাঠামোতে রঙিন কাগজে, অস্ত্রে, রাংতায় সাজানো তার মিনার, ছত্রি, বারান্দা, তোরণ। তাদের চুড়োয় চুড়োয় নিশান, ময়ূর, আলোর ঝালর। বেলোয়ারি ঝাড়-লণ্ঠনের অস্ত্রের ঢাকনায় ঝোলানো মোমবাতির আলোর কারুকর্মে ভেলার সর্বাঙ্গ ভূষিত। জলের ঢেউ-এ ভেলা দুলছে। সেই দোলাতে চুড়ো থেকে তলা পর্যন্ত বেলোয়ারি আলোর সাজও দুলছে ঝিলিক তুলে। এই আলোর ভেলা আর তার কম্পমান প্রতিবিম্বিত রূপটিকে বুকে নিয়ে রাতের কালো ভাগীরথী স্বপ্নময় হয়ে উঠেছে যেন।

এই ভেলার নাম বেরা। বেড়া, ব্যারা, ব্যাড়া-এসব নামও বলে কেউ কেউ। প্রতি বছর ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবারের রাত্তিরে মুর্শিদাবাদ শহরে যে বিখ্যাত বেরা উৎসব হয়, সেই উপলক্ষেই ভেলাটি তৈরি হয়। মুসলমানি শাস্ত্রে জলদেবতা বলে কথিত খাজা খিজির নামে এক পীরের উদ্দেশ্যে এই ভেলাটি উৎসর্গ করে ভাগীরথীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়, নবাব নাজিমদের হাজারদুয়ারী প্রাসাদের সামনে তোপখানার ঘাট থেকে। রাত এগারটার সময় তোপখানার কামান থেকে তোপ দেগে বেরা ভাসানোর সমটি ঘোষিত হওয়ামাত্র ভেলার তীরের সঙ্গে রজ্জবন্ধনীটি কেটে দেওয়া হয়। স্রোতের টানে হেলে দুলে রূপের আলো ছড়িয়ে ভেলা ভেসে চলে দক্ষিণবাহিনী ভাগীরথীর বুকে। তাকে ঘিরে অনেক নৌকোও চলে সঙ্গে সঙ্গে, আলো-বাজনাবাদ্যি নিয়ে। বাজি পোড়ানোর ধুমও পড়ে যায়।

ময়ূরপঙ্খী নাও

এই উৎসবে ভেলাটিই কিন্তু সর্বস্ব নয়। চেঁচারির কাঠামোতে কালো কাগজ দিয়ে যে চারটি ময়ূরপঙ্খী তৈরি করা হয় আসল উৎসব তাদেরই নিয়ে। ভেলার মাঝখানে থাকে সেই ময়ূরপঙ্খী চারটি। তারা তের হাত লম্বা, দেড় হাত চওড়া। ময়ূরপঙ্খী নাম, কিন্তু তাদের সামনের মুখ মকর আর পেছনের মুখ হাতির মত। এই মকরমুখো নৌকার ওপরে মাঝখানে চৌরি বাংলা। বঙিন কাগজের ঝালরে, নিশানে, নানান আভরণে, সাজসজ্জায় নৌকাগুলো বিচিত্র রূপ ধারণ করে। খুদু মিএল নামে এক নিপুণ কারিগর বংশপরম্পরাক্রমে এই কারুকর্মটি করে আসছেন। তিনিই ভেলার সমস্ত আলোর আভরণ, গম্বুজ, মিনার, তোরণ, বারান্দা, ময়ূর, নিশান প্রভৃতি তৈরি করেন।

খাজা খিজিরের নামে সিন্নি

ময়ূরপঙ্খীগুলো ওয়াসিফ মঞ্জিলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে নবাববাড়ির লোকজন মকরের মুখে ফুলের মালা বেঁধে দেন। একে বলে সেহারা বাঁধা। তারপর খাজা খিজিরের জন্যে সুজির পায়েস, কুটির সিন্নি আর সোনার পিদ্দিম নিয়ে বাজনাবাদ্যি করে মিছিল আসে তোপখানার ঘাটে। ময়ূরপঙ্খী চারটি ডেলার মাঝখানে স্থাপন করা হয়। তারপর খাজা খিজিরের নামে সোনার পিদিম আর ভেলার সব মোমবাতি জ্বেলে দেওয়ার রীতি। তোপখানার তোপ দাগার সঙ্গে সঙ্গে ভেলা ভাসিয়ে দেওয়া হয়। এর নাম বেরা কাটা।

বেরা ভাসানো ছাড়া আর একটি অনুষ্ঠান আছে, তার নাম কমল ভাসানো। কলার পেটোর ওপরে মোমভর্তি গেলাস বসিয়ে রঙিন কাগজের ঘেরাটোপে সাজিয়ে সেইগুলি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। ভাগীরথীর বুকে দ্রুত ধাবমান সেই বিপুল সংখ্যক আলোর কমল চোখে যেন বিভ্রম সৃষ্টি করে।

সোদো ভাসানোর সঙ্গে মিল

এটি মুসলমানি উৎসব। ভাদ্র মাসে কলাগাছের পেটোতে কাগজ দিয়ে নৌকা সাজিয়ে, তার ভেতরে এলাচদানা, বাতাসার সিন্নি রেখে, ধূপ চেরাগ জ্বেলে পীরের নামে উৎসর্গ করে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়ার প্রথা এক সম্প্রদায়ের মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত আছে। কলকাতাতেও গঙ্গায়, পুকুরে মুসলমানদের ঐরকম নৌকা ভাসাতে দেখেছি। বাঙালি হিন্দু মেয়েরাও পৌষসংক্রান্তিতে ঠিক এইরকমভাবেই সোদো ব্রত করেন। কলার পেটোয় নৌকা বানিয়ে গাঁদা ফুল দিয়ে সাজিয়ে তার ভেতরে বাতাসা রেখে পিদ্দিম জ্বালিয়ে নদীতে, পুকুরে ভাসিয়ে দেন তাঁরা। এর নাম সোদো ভাসানো। মুসলমানদের এই বেরা ভাসানোর সঙ্গে হিন্দু মেয়েদের সোদো ভাসানোর বেশ মিল আছে। কিন্তু মুর্শিদাবাদের বেরা ভাসানোর উৎসবে যে রকম ভিড় আর জাঁকজমক হয়, বাংলাদেশে এই উৎসবে সেইরকমটি আর কোথাও হয় বলে শুনিনি। মুর্শিদাবাদের এই উৎসবটির সূত্রপাতে নাকি নবাব-নাজিমরাই ছিলেন। এখনও এর সঙ্গে তাঁদের বংশধরদের যোগসূত্র একেবারে ছিন্ন হয়নি। তবুও এটি এখন আর শুধু নবাববাড়ির উৎসব নয়। অগণিত সাধারণ মানুষের স্বতস্ফূর্ত যোগদানে এটি একটি প্রকৃত লোকোৎসবে পরিণত হয়েছে। আর শুধু মুসলমান সম্প্রদায়েরই লোক নয়, হিন্দুরাও এতে দলে দলে যোগ দেয় সমান উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে।

মুর্শিদাবাদের বেরা-উৎসবের প্রবর্তক কে, এ নিয়ে নানা মুনির নানা মত। মুর্শিদাবাদের ইংরেজ সিভিল সার্জন মেজর জে. এইচ. টাল্ ওয়াল্ তাঁর ১৯০২ সালে রচিত 'এ হিস্ট্রি অফ মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্ট'-এর ১৩৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, মুর্শিদকুলী খাঁ এই উৎসব করতেন। তিনিই মুর্শিদাবাদে এ-উৎসবের প্রবর্তক কিনা ওয়াল্ কিন্তু সে-কথার উল্লেখ করেন নি। প্রাচীন মুসলমান ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন তাঁর সিয়র-উল্-মুতা-খরীন গ্রন্থে লিখেছেন, সিরাজদৌল্লা মুর্শিদাবাদে এই

উৎসবের সূত্রপাত করেছিলেন। ডক্টর জেমস্ ওয়াইজও ঐ মুসলমান ঐতিহাসিকের মন্তব্যের জোরে তাঁর রচিত 'দি ম্যাহমেডানস অফ্ ইস্টার্ন বেঙ্গল' প্রবন্ধের ৩৯ পৃষ্ঠায় সিরাজকেই মুর্শিদাবাদের বেরা উৎসবের প্রবর্তক বলে উল্লেখ করেছেন। ('জার্নাল অফ দি এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল', তৃতীয় খণ্ড, ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ)। ভোলানাথ চন্দ্র ১৮৪৫ সালে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণের যে বৃত্তান্ত রেখে গেছেন তাঁর 'দি ট্রাভেল্স অফ্ এ হিন্দু' (১৮৬৯) নামক গ্রন্থে, তার ৮২ পৃষ্ঠায় তিনি মুর্শিদাবাদের বেরা-উৎসবের বিবরণে বলেছেন, সিরাজই মুর্শিদাবাদে এই উৎসবের প্রবর্তক।

যদি মুর্শিদকুলী খাঁর আমলে মুর্শিদাবাদে এই উৎসব শুরু হয়ে থাকে তবে এই উৎসবের বয়স প্রায় আড়াইশো বছর হবে। আর সিরাজের আমলে শুরু হলে এর বয়স শ-দুয়েক বছর তো হবেই। মুর্শিদকুলী খাঁর আগে মুর্শিদাবাদের নাম যখন মুখসুদাবাদ ছিল কে জানে, তখন থেকে হয়তো এ- উৎসব চলে আসছে।

সেকালের উৎসবের চেহারা

কিন্তু দুশো-আড়াইশো বছরের মধ্যে এ-উৎসবের জৌলুস অনেক কমে গেছে। নবাব-নাজিমদের আমলে লাখ লাখ টাকা খরচ হত উৎসবে। আমির-ওমরাহ, ইয়ার-বক্সিদের নিয়ে তাঁদের খানাপিনা, নাচ-গান, হৈ-হুল্লোড়ের আসর জমত। বেরা যখন ভাসিয়ে দেওয়া হত তখন ভার সঙ্গে নৌকায় নৌকায় চলত বাঈজিদের অবিরাম নাচ-গান। নিজামত কেল্লার ঠিক উল্টোদিকে ভাগীরথীর পশ্চিমপারে রোশনিবাগের রোশনাই-এর কথা পুরনো ইতিহাসের কেভাবে লেখা আছে। লক্ষ লক্ষ মোমবাতিতে, সেজের আলোয়, বেলোয়ারি ঝাড়-লণ্ঠনে তৈরি আলোর মিনারে, তোরণে রোশনিবাগ ঝলমল করে উঠত। সারারাত্রি ধরে পোড়ানো আতসবাজির আলোতে উদ্ভাসিত হত রাত্রি। আর তখন কী প্রকাণ্ড ভেলাই না তৈরি হত। ওয়াল্ সাহেব তাঁর মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে (১৯০২ সালের কিছু আগে লেখা) যে ভেলাটির কথা লিখেছেন, সেটি ছিল চওড়ায় ১২৫ হাত অর্থাৎ ১৮৭ ফুট। ওয়াল্ সাহেব যখন মুর্শিদাবাদে গিয়েছিলেন, তখন নবাব-নাজিমদের একেবারে পড়তি দশা। নামকোওয়াস্তে যেটুকু ক্ষমতা ছিল তাও ইংরেজ শাসকরা কেড়ে নিয়েছেন। ফেরিদুনজাই মুর্শিদাবাদের শেষ নবাব-নাজিম। তারপরে সে উপাধি অদৃশ্য হয়ে শুধু 'নবাব-বাহাদূরে' এসে ঠেকেছে। সুতরাং উৎসববৈভবের মাত্রাও কমে গেছে। নবাব-নাজিমদের মধ্যে মীরজাফরের ছেলে মুবারকউদ্দৌলার কথায় ওয়াল্ সাহেব লিখেছেন, তিনি ঈদ, বেরা, দেওয়ালি প্রভৃতি উৎসবে মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করতেন। তিনি মসনদে ছিলেন খ্রিস্টায় ১৭৭০ সাল থেকে ১৭৯৩ সাল পর্যন্ত। উইলিয়ম হজেস্ খষ্টীয় ১৭৮০ থেকে ১৭৮৩ সাল পর্যন্ত ভারতভ্রমণের যে বিবরণ রেখে গেছেন তাঁর 'ট্রাভেল্স অফ ইন্ডিয়া'তে, তার ৩৫ পৃষ্ঠাতে মুর্শিদাবাদের এই বেরা-উৎসবের বিবরণ আছে। মনে হয়, তিনি মুবারকউদ্দৌলারই বেরা উৎসবই দেখেছিলেন।

সেই প্রাচীন বিরাট উৎসবের ভগ্নাংশ এখন কোনওরকমে টিকে আছে। নিজামতি ব্যান্ডের বদলে এখন আধুনিক ভাড়াকরা ব্যান্ড পার্টি আসে। নৌকা থেকে লাউডস্পিকারে রেকর্ড সঙ্গীতের কমপিটিশান চলে। খাজা খিজিরের জন্যে সিন্নি নিয়ে চারটি ময়ূরপন্থী আজও আসে নবাববাড়ি থেকে জুলুস করে। তার জুলুস নামটুকু আছে, কিন্তু আগেকার সেই জৌলুস আর নেই। সোনার পিদ্দিম জ্বালানো সম্বন্ধে লোকে এখন ঘোর সন্দিহান। এখন যে বেরাটি ভাসান হয়, আকারেও সেটি অনেক ছোট হয়ে এসেছে। এখন লম্বায় আর চওড়ায় দুদিকেই সেটি ৩০ ফুটে এসে দাঁড়িয়েছে। রোশনিবাগে এখন ইলেকট্রিক আলোর একটা ছোটখাট গেট তৈরি করে তার রোশনাই-এর নামের পিত্তি রক্ষে হচ্ছে। আর তাপখানার ঘাটের সামনে একটাও আলো থাকে না। অন্য জায়গায় আলোর কথা তো দূরে। বাজির দফাও এখন রফা হয়েছে। ঘন্টাখানেকও বাজি পোড়ে কিনা সন্দেহ।

খড়দহের রাস

নামটা গোষ্ঠবিহার। কিন্তু যুগটা তো বৃন্দাবনী নয়। তাই কোথায় মিলবে সেই বাখাল ছেলের দল মুখে যাদের অলকা-তিলকা আঁকা, মাথায় চুল ময়ূরপাখা দিয়ে চুড়ো করে বাঁধা, গলায় বনফুলের মালা, কাঁধে ছাঁদনদড়ি, হাতে বেত্র, বেণু, বিষাণ। কোথায় তাদের মধ্যমণি ললিতকান্তি কানাই বলাই। কোথায় বা মিলবে নধরদেহ শ্যামলী, ধবলী, পিয়ালীর পাল-যাদের পিছনে পিছনে হৈ হৈ ছুটেছে ব্রজের দূরন্ত দামাল রাখাল ছেলেরা।

গোখুর ধূলি উছলি তরু অম্বর
ঘন হাম্বা হৈ হৈ রাব।
বেণু-বিষাণ-রথ বেয়াপিত দশদিগ
রঙ্গে সঙ্গে সহচর ধাব।।

খড়দার রাসের শেষে সেদিন গোঁসাইন্দব মন্দিরের বিগ্রহ শ্যামসুন্দবকে নিয়ে যে গোষ্ঠযাত্রার মিছিল বেরিয়েছিল, তাতে ব্রজের রাখাল ছেলে আর শ্যামলী-ধবলীদের অভাব থাকলেও মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তার ধুলো আর আকাশে টিটাগড়, ব্যারাকপুর, পলতা, ইছাপুর, শ্যামনগর, কাঁকিনাড়ার সারি সাবি কলকারখানার চিমনির উগরে দেওয়া, বাতাসে ভেসে আসা কালির অভাব হয়নি। গোঁসাইরা দল বেঁধে বৃন্দাবনের কানাই বলাই-এর গোষ্ঠবিহারেব গান গেয়ে চলেছিলেন। খোল-করতালের সঙ্গতে তাঁরা কোরাসে গাইছিলেন

শ্রীকরে বলয় পাঁচনি
মুখে আবা আবা ধ্বনি
নেচে নেচে ত্রিভঙ্গগমন

ঢিমে তাল শেষ করে গান যখন দুনের মাতনে এসে পৌঁছোচ্ছিল, তখন তাঁদের উদ্দও নাচে পায়ের দাপে রাস্তার ধুলোও উড়ে উড়ে চারধারে যেন পর্দা টাঙিয়ে দিচ্ছিল। ব্রজের ধেনুচবানো বেণুবাজানো রাখালছেলেরা নিপাত্তা হলেও খড়দহের গোষ্ঠবিহারে ব্রজবেণুর অভাব হয় না-মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তার ধুলোয় আর চিমনির ধোঁয়ার কালিতে।

গোঁসাইদের সঙ্গে প্রবীণ, নবীন-সব বয়সেরই লোক ছিলেন। প্রবীণদেব পবনে স্মৃতিচাদর, কেউ কেউ গরদ আর রঙিন বেনারসি জোড়ও পরেছিলেন। তিলক, কণ্ঠী নামাবলীর ভূষণও তাঁদের ছিল। ছেলে ছোকরারা জরিপাড়ের ধুতির সঙ্গে শুধু গেঞ্জি কিংবা তার ওপরে আদ্দির পাঞ্জাবি চড়িয়ে হাজির হযেছিলেন। পায়জামা-পাঞ্জাবি কিংবা ফুলপ্যান্ট-বুশশার্টও কারও কারও অঙ্গশোভা বর্ধন, করছিল। বৈষ্ণবের তিলক-মালার সাজ নবীনদের মধ্যে দুর্লভ। স্কুল কলেজের পোড়ো ছাত্র কিংবা আপিসে-কলকারখানায় চাকরি করা এই গোস্বামীসন্তানরা বছরের এই একটা দিন খড়দার রাস্তায় ঠাকুর নিয়ে ব্রজরাখালের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন এবং গোষ্ঠবিহারের গান গাইতে গাইতে নাচতে নাচতে পথ পরিক্রমা করেন। শ্রীনিত্যানন্দ কিংবা তাঁর পুত্র বীরভদ্রের আমল থেকে খড়দার শ্যামসুন্দরের রাসযাত্রা উপলক্ষে এই গোষ্ঠবিহারের রেওয়াজ চলে আসছে এবং গোস্বামীসন্তানরা আজও তার হেরফের করেননি। খড়দার রাসযাত্রা শুরু হয় পূর্ণিমায়। দিনতিনেক উৎসবটির মেয়াদ। এই কদিন প্রতিদিন রাত্রে খড়দার বিখ্যাত শ্যামসুন্দর ও রাধার বিগ্রহকে মন্দির থেকে বার করে গঙ্গার ধারে রাসমঞ্চে নিয়ে যাওয়া হয়। আবার ভোর বেলায় তাঁদের মন্দিরে ফিরিয়ে আনা হয়।

সতেরো চুড়োর রাসমঞ্চ

সতেরোটি চুড়োর রাসমঞ্চ। পুরনো রাসমঞ্চ বীরভদ্রের আমলের বলে কথিত, সেটি গঙ্গার ধারে লালুপালের বাঁধাঘাটের ওপরে রাস্তার পূর্বদিকে ছিল। সেটি এখন বিধ্বস্ত। তার বদলে তৈরি হয়েছে এই নতুন বাসমঞ্চ। এর বয়স পঞ্চাশ-ষাট বছরেব কিছু বেশি হবে। এর গায়ে পম্বের অঙ্গলেপের যে মসৃণ শুভ্রদ্যাত ছিল, বারবার মোটা চুনকামে এখন তা ঢাকা পড়ে গেছে। সারা বছর এখানে গোরু ছাগল, আর ছেলেপিলেদের আড্ডাখানা জমে। রাসযাত্রার দিনকতক আগে কয়েক পোঁচ কলিচুনের অঙ্গরাগ পড়ে এব গায়ে। আগে আগে রাসমঞ্চের চারধারে দুলত জরির পরা। কাঁচের বেলোয়াবি চিমনির ভেতরে জ্বলত মোমবাতির নরম আলো। শোলার তৈরি কদমঝাড়ে, শাপলায়, পদ্মাফলে, টিয়া, কাকাতুয়া, ময়ূব, হাঁস, পানকৌড়ি, বাঁদরের মেলায় বৃন্দাবনের বাসরঙ্গ-ভূমি রচিত ২৩। এই রাসমঞ্চের ভেতবে কালো কষ্টিপাথরের তৈরি সুঠাম, সুদর্শন শ্যামসুন্দর আর অষ্টধাতুর বালা কিষাণের বসনে, সোনার গয়নায়, বেলোয়ারি আলোয় ঝলমলানি তুলে রাসনিশি যাপন করতেন। এখন বেলোয়ারির দিন গত। তার বদলে নিওন আব ইলেকট্রিকের আলোর জমকালো মালা বাসমঞ্চেল গায়ে জড়ানো। বৃন্দাবনের বনসজ্জা এখন শোলার তৈরি গোটাকতক কদমফুলে

আর পাখিতে এসে ঠেকেছে। পূর্ণিমা থেকে শুরু করে করে দিনতিনেক প্রতিদিন রাত্তিরে শ্যামসুন্দর বাজনাবাদ্যি করে আলোর রোশনাই এ চারধাণ ভরিয়ে রাসমঞ্চে এসে ওঠেন। গোস্বামীরা এই মিছিলে রাসের গান গাইতে গাইতে আসেন। মন্দির থেকে রাসমঞ্চ মিনিট আস্টেকের পথ। কিন্তু এই গানের মিছিল আসে নানা জায়গাস থামতে থামতে। সুতরাং বেশ দেরিই হয়ে যায় রাসমঞ্চে এসে পৌঁছতে। বাসমঞ্চের সামনে যখন তারা এসে পৌঁছন তখন বাসমঞ্চের চারধার ঘিবে, আর গঙ্গার ধারে বাসমেলার দোকান পাট জমে গেছে। হাঁড়িকুড়ি, পোড়ামাটির পুতুল, ধামা, চুপড়ি, লোহার বঁটি কাটাবিব শেকানে লোক গিমগিস করছে। ওদিকে গোস্বামীদের কালে চতুদোলার ওপরে আপাদমস্তক সোনার গহনায় ঝলমল শ্যামসুন্দর রাধার বিগ্রহ। আর গোস্বামীরা ঝুমুর গান ধরেন:

শ্যাম চলু বাসবিহারী
বাসনিকুঞ্জে বসি
শ্যাম আমার বাজায় বাঁশী।
মুখে মৃদু মৃদু হাসি
চলে কালো পূর্ণশশী
দেখি ঐ রূপরাশি
গোপী ঘরে রইতে নাবে
চলু বাসবিহারী

সারা রাত্তির রাসরঙ্গে কাটিয়ে ভোব থাকতে থাকতে ক্লান্ত শ্যামসুন্দর মন্দিরে ফিরে আসেন।

গোষ্ঠবিহারের মিছিল
এইভাবে তিনটি রাত্তিরের উৎসবের শেষে চতুর্থ দিন অর্থাৎ তৃতীয়াতে শ্যামসুন্দর আর ভোর
বেলায় মন্দিরে যান না। এই রাসমঞ্চেই থাকেন অনেক বেলা পর্যন্ত। তারপর গোস্বামীরা আসেন তাঁকে গোষ্ঠবিহাবে নিয়ে যেতে। গোষ্ঠবিহার সকাল বেলাবই লালা। কিন্তু রাসমঞ্চ থেকে ঠাকুরকে নিয়ে মিছিল করে বেরোতে বেরোতে গোস্বামীদের দুপুর আডাইটে বেজে যায়। খড়দার বাসযাত্রায় এই শেষদিনেই যাত্রীদের সবচেয়ে বেশি ভিড় জমে। বাসমঞ্চে ঠাকুব যতক্ষণ, যাত্রীদের প্রণামীও পড়বে ততক্ষণ। ভক্তদের প্রণাম আব প্রণামীর ঠেলায় ভক্ত বৎসল ঠাকুবের গোষ্ঠে গোচারণে যেতে দেরি হয়ে যায়।

এই গোষ্ঠবিহারের মিছিলে ব্যান্ডে, ব্যাগপাইপে একালের হিট বেকর্ড সঙ্গীত বাজে। ঢাক ঢোল তো আছেই। তাদের পেছনে গোস্বামীরা গোষ্ঠের গান ধরেন।

বেলা হল গোচারণে যাই।

অঙ্গনে দাঁড়ায়ে সবাই

শিঙাতে ডাকিছেন দাদা বলাই

চতুর্দোলায় গোস্বামীদের শ্যামসুন্দর। চতুর্দোলার পাশে সুসজ্জিত প্রকাণ্ড ছাতা। গোষ্ঠে যেতে প্রখর রবির কিরণে শ্যামের চাঁদমুখ পাছে শুকিয়ে যায়, সেই জন্যে মাথায় ছাতা ধরার ব্যবস্থা বোধহয়।

দরজায় দরজায় শ্যামের ভোগ

শ্যামের শ্রম দূর করবারও ব্যবস্থা আছে। এই মিচিলের পথের ধাবে বাড়ির দরজায় দরজায় শ্যামের জন্যে ভোগ সাজিয়ে বসে থাকেন গৃহস্থবা। ক্ষীর, সর, ছানা, মাখন, চন্দ্রপুলি, মালপো, ফলমূলের নৈবেদ্যের ভার। সাবা সকাল থেকে মা যশোদার দল শ্যামসুন্দরের জনে। এইসব সুস্বাদু ভোগ তৈরি কবে বাখেন। সদর দরজায় চাঁদোয়া খাটিয়ে, আমের পল্লবে আব আলপনায় সাজিয়ে সবাই অপেক্ষা করেন। শ্যামসুন্দবের চতুর্দোলা ঐ সমস্ত গৃহস্থদের বাড়ির সামনে ঘুবিয়ে দাঁড় করানো হয়। তারপর সেই সমস্ত ভোগ নিবেদন করা হয় তাঁকে। আরতি, প্রণাম ইত্যাদি সারা হলে, শ্যামসুন্দর আর এক বাড়ির সদর দরজায় গিয়ে দাঁড়ান। এইভাবে রাসমঞ্চ থেকে মন্দিরের মিনিট আটেকের পথে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটি বাড়ির ক্ষীর, সর, ছানা, ননী, মালপো খেতে খেতে তাঁর সন্ধে হয়ে যায়।

ভোগলুট পর্ব

তারপরে মন্দিবে গিয়ে ঢোকেন শ্যামসুন্দর। এখানেও এক প্রকাণ্ড ভোগের ব্যাপার। এর নাম 'মহা বিরাট ভোগ'। এই 'মহা বিরাট ভোগলীলায়' সেদিন যে কাণ্ডটি দেখেছি, তা কোনও দিন ভুলবো না। সেই কথাটি বলি এবার।

মন্দিরের নাটমন্দিরের ভেতরে একটা প্রকাণ্ড পেতলের তৈরি গাড়ি। লম্বায় ১০ ফুট, চওড়ায় ৭ ফুট আর গভীরতায় ৪ ফুট। এই পেতলের প্রকাণ্ড গাড়ি খিচুড়িতে ভর্তি। গাড়ির সামনে রাখা মালসাতে সরায় মিষ্টি খাবাব, ফলমূল ইত্যাদি। নাটমন্দিরে চাবধারে লোকে-লোকারণ্য। তাদের হাতে হাঁড়ি, বালতি, কড়া, টিফিন ক্যারিয়ার, ঝুড়ি, চুপড়ি, কাঁচের গলাভাঙা বোতল, বাটি, গেলাস, ঠোঙা, মাটির ভাঁড়-যে যেমন পাত্র পেরেছে নিয়ে এসেছে। ভলান্টিয়াররা লাইন বেঁধে হাতে হাত দিয়ে সেই বিরাট ভিড়কে প্রতিহত করে রেখেছে। শ্যামসুন্দর মন্দিরে এসে পৌঁছনো মাত্র তাঁকে কোলে করে সেবাইতরা এই ভোগের সামনে যেই এসে দাঁড়ালেন, অমনি সেই বিশাল ভিড বাঁধভাঙা হুমড়ি খেয়ে পড়ে খিচুড়ি তুলে নিতে লাগল। আগুন লাগলে চৌবাচ্চা থেকে জল তুলে নিয়ে লোক যেমন দৌড়োয়, এও সেই রকম ব্যাপার। হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার। একসঙ্গে যত রাজ্যের হাঁড়ি, কড়া, বাটি, বালতি, ধামা, চুপড়ি সব ঐ চৌবাচ্চায় চুবিয়ে খিচুড়ি ভর্তি করে নিয়ে লোক পালাচ্ছে। সেই হুড়োহুড়িতে কত বালতি খিচুড়ি মার্বেল পাথরের মেজেতে পড়ে গেল। কত লোকের মাথায় বালতির চোট লাগল। কতজন মেয়েপুরুষকে হাঁড়িভর্তি খিচুড়ি নিয়ে পালাতে গিয়ে পা পিছলে সেই মেঝেতে দড়াম করে পড়ে গড়াগড়ি দিতে দেখলুম। কয়েকজনের কপাল কেটে বক্তও ঝবতে লাগল খুব। সকলের জামায় কাপড়ে

আপাদমস্তক এমন কি মেয়েদের খোঁপার খাঁজে খাঁজে পর্যন্ত ছিটকিয়ে পড়া খিচুড়ি লেপটে রয়েছে। নাটমন্দির থেকে বাইরে এসে দেখি- সেখানেও খিচুড়িতে পিছল হয়ে গেছে। লোকে দড়াম দড়াম করে আছাড় খাচ্ছে তার ওপরে। এর নাম ভোগলুট। এই ভোগলুট পর্ব খড়দার রাসযাত্রার এক প্রসিদ্ধ ব্যাপার। অনুষ্ঠানটি কিন্তু খুব পুরনো নয় বছব ৭০/৭৫ বৎসব ধরে চলছে।

খড়দহ বৈষ্ণবের শ্রীপাট, নিত্যানন্দের গার্হস্থ্যজীবনযাত্রার পূণ্যভূমিরূপে পূজিত। শ্রীচৈতন্যের পরামর্শে তিনি বিবাহ কবে এখানে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। সূর্যদাস সরখেলের দুই কন্যা বসুধা আর জাহ্নবীকে তিনি বিয়ে করেছিলেন। বীরভদ্র বা বীরচন্দ্র বসুধার গর্ভজাত পুত্র। বীরভদ্র নিত্যানন্দেরই মত অতি উদার, দয়ালুহৃদয় এবং অ-হুঁৎমার্গী ছিলেন। কথিত আছে, তিনি বারোশো নেড়া আর তেরোশো নেড়িকে ভেক দিয়ে বৈষ্ণব ধর্মাশ্রিত করেছিলেন।
বর্ণাশ্রম ধর্মের শাসন পাশে বদ্ধ, স্মৃতিশাসিত প্রাণহীন শুদ্ধ সমাজকে কৃষ্ণভক্তির সুধারসে সঞ্জীবিত করে শ্রীচৈতন। যে নতুন জীবনপ্রবাহ বাংলাদেশে এনেছিলেন ষোড়শ শতকে, নিত্যানন্দ "অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়" জাতি বিচারের ধার ধারতেন না। আনন্দময়, সরলপ্রাণ, ক্ষমাসহিষ্ণু নিত্যানন্দ বাংলার প্রেমধর্ম প্রচারব্রতী ছিলেন। তাঁর পুত্র বীরভদ্রও পিতার মত দয়াপ্রবণ, উদার হৃদয়, মনস্বী ছিলেন। নিত্যানন্দের তিরোধানের পর জাহ্নবী দেবী আর বীরভদ্রই খড়দহের শ্যামসুন্দর মূর্তি প্রতিষ্ঠা কবেছিলেন এবং তাঁর সময় থেকেই নিত্যানন্দের স্মৃতিপূত খড়দহ বৈষ্ণবের শ্রীপাটের মর্যাদায় পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নবদ্বীপ যেমন শ্রীচৈতন্যের, শান্তিপুর শ্রীঅদ্বৈতের, খড়দহ তেমনি শ্রীনিত্যানন্দের বিহার-ভূমিরূপে বৈষ্ণবদের কাছে পূজিত। বাংলাদেশের সর্বত্র অদ্বৈতবংশের মত নিত্যানন্দবংশেরও গোস্বামীদেব পুরুষানুক্রমে বহু শিষ্যগোষ্ঠী আছেন। তাঁদের মধ্যে অনেক ধনী ভক্তেবও অভাব নেই। ধনী দরিদ্র সকল ভক্তের পৃষ্ঠপোষকতায় মন্দির, দেবসেবা, উৎসব, অনুষ্ঠানের ৩.বস্থা পাচীনকাল থেকে গড়ে উঠেছে। তাই খড়দহের রাসযাত্রায় যে এত ভক্ত সমাগম হবে, তাতে বিচিত্র কাঁ।

নবদ্বীপের রাসপূর্ণিমায় যে সমস্ত বিশালকায় শক্তিমূর্তির পূজা হয়, তার পরদিন তাদের বিসর্জনের আড়ং এব এবং শান্তিপুরেব ভাঙা রাসেব মিছিলের যেমন বিশেষ ধুম. খড়দহের বাসযাত্রার শেষে গোষ্ঠবিহাবের তেমনই ধুম। এই রাসযাত্রা আর গোষ্ঠবিহারই খড়দহের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব। দলে দলে লোক যায় খড়দহের বাসে ট্রেনে, বাসে, নৌকায়, পায়ে হেঁটে। মাঘী পূর্ণিমায় শ্যামসুন্দরের আর একটি উৎসব হয়। তাতেও কম যাত্রী সমাগম হয় না।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

Banglapedia

Ekota

Bangla Kobitar Mela

হীরেন্দ্রনাথ মিত্র, বাংলার লোক-উৎসব ও লোকশিল্প

আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোক-সংস্কৃতি

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

1.আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোক-সংস্কৃতি

2. হীরেন্দ্রনাথ মিত্র, বাংলার লোক-উৎসব ও লোকশিল্প

3. Asoke Mitra, Paschimbanger Puja Parbon o Mela

4. Lal Behari Dey, Folk Tales of Bengal

সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী:

1. Write a note on Purana and folktales.
2. What do you know about folk literature of Bengal?
3. Write an essay on folk festivals of Bengal with reference to Olaichandi, Bera festival, and Ras utsav of Khardaha.

Block 3

Popular Folk music, Dance and Drama

Unit-7: Baul, Bhawaiya, Bhadu, Tusu, Jhumur

Unit-8: Manasamangal, Bolan and Leto Jhapan, Gambhira, Banbibi pala

Unit-9: Putul Nach, Alkaap and Jatra-social and religious aspects

উদ্দেশ্য:

এই পর্যায়টি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন:

১. বাংলার বিভিন্ন লোকসংগীত সম্পর্কে

২. বাংলার বিভিন্ন লোক নৃত্য, পালা এবং যাত্রা সম্পর্কে

Unit-7: Baul, Bhawaiya, Bhadu, Tusu, Jhumur

বাউল:

বাউল লোকসম্প্রদায়ের একটি সাধন-ভজন গোষ্ঠী, যারা গ্রামে-গঞ্জে গান গেয়ে ভিক্ষা করে বেড়ায়। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে এদের দেখা গেলেও সাধারণত কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, ফরিদপুর, যশোর এবং পাবনা অঞ্চলেই এদের বেশি দেখা যায়। বাউলরা দেহভিত্তিক গুপ্ত সাধনার অনুসারী। এই সাধনায় সহজিয়া ও সুফি সাধনার সম্মিলন ঘটেছে; তবে সুফি ভাবনার প্রভাবই বেশি। বাউলরা মসজিদ বা মন্দিরে যায় না। কোনো ধর্মগ্রন্থে তাদের বিশ্বাস নেই। মূর্তিপূজা, বর্ণবৈষম্য বা জাতিভেদে তারা বিশ্বাসী নয়। তারা মানবতাবাদী। তাদের বিশ্বাস জন্মগতভাবে কেউ বাউল নয়, গুরুর নিকট দীক্ষা নিয়েই বাউল হতে হয়। বাউল সাধনা মূলত নারী-পুরুষের যুগলসাধনা। তবে জ্ঞানমার্গীয় একক যোগসাধনাও আছে।

বাউল সম্প্রদায়ের উদ্ভব সম্পর্কে সঠিক কোনো তথ্য জানা যায় না। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 'বাউল' শব্দের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। পনের শতকের শাহ মোহাম্মদ সগীরের ইউসুফ-জুলেখা, মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়, ষোলো শতকের বাহরাম খানের লায়লী-মজনু এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে 'বাউল' শব্দের ব্যবহার আছে। এ থেকে অনুমান করা হয় যে, অন্ততঃপক্ষে খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতক কিংবা তার পূর্ব থেকেই বাংলাদেশে বাউল সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল। সাম্প্রতিককালের এক গবেষণায় জানা যায় যে, পারস্যে অষ্টম-নবম শতকে সুফিসাধনা প্রবর্তনকালে 'বা'আল' নামে সুফি সাধনার একটি শাখা গড়ে ওঠে। তারা ছিল সঙ্গীতাশ্রয়ী এবং মৈথুনভিত্তিক গুপ্ত সাধনপন্থী। মরুভূমির

বিভিন্ন অঞ্চলে তারা গান গেয়ে বেড়াত। অন্যান্য সুফিসাধকদের মতো তারাও এক সময় ভারতীয় উপমহাদেশে আগমন করে এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবেই বাংলায় বাউল সম্প্রদায়ের আগমন ঘটে।

বাউলদের আচার-আচরণ অদ্ভুত এবং বিচিত্র হওয়ায় কেউ কেউ তাদের 'পাগল' বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ কারণে সংস্কৃত 'বাতুল' (পাগল, কান্ডজ্ঞানহীন) ও 'ব্যাকুল' (বিহবল, উদ্ভ্রান্ত) শব্দদ্বয়কে 'বাউল' শব্দের উৎপত্তিমূল বলে মনে করা হয়। কেউ কেউ পারসি 'বা'আল' বা আরবি 'আউলিয়া' (বন্ধু, ভক্ত) শব্দ থেকে 'বাউল' শব্দের উৎপত্তি বলে মনে করেন। বা'আলরা তাদের প্রেমাস্পদের উদ্দেশে মরুভূমিতে 'পাগল' বা 'ক্ষ্যাপা'র মতো গান গেয়ে বেড়ায়। তারা সংসারত্যাগী এবং সকল বাধা-বন্ধনহীন। বাউলরাও অনেকটা পাগল বা ক্ষ্যাপার মতো।তবে তারা যে অর্থে 'পাগল' বা 'ক্ষ্যাপা' তা কেবল সুফি 'দিওয়ানা' শব্দের সঙ্গেই তুলনীয়।

সুফি সাধনায় যিনি সাধকের পরমারাধ্য বা পরমার্থ, তিনিই বাউলের মনের মানুষ এবং বাউলদের মতে তাঁর অবস্থান মানবদেহে। বাউলরা তাঁকে সাঁই (স্বামী), মুর্শিদ (পথনির্দেশক), গুরু (বিধানদাতা) ইত্যাদি নামে অভিহিত করে এবং তাঁরই সান্নিধ্যলাভে পাগল হয়।

প্রকারভেদ বাউলদের মধ্যে দুটি শ্রেণি আছে গৃহত্যাগী বাউল ও গৃহী বা সংসারী বাউল। যারা গুরুর নিকট ভেক খিলাফৎ-এর মাধ্যমে দীক্ষা গ্রহণ করে তাদের ত্যাগী বা ভেকধারী বাউল বলা হয়। এই শ্রেণির বাউলরা সংসার ও সমাজত্যাগী। ভিক্ষাই তাদের একমাত্র পেশা। তারা আখড়ায় আখড়ায় ঘুরে বেড়ায় এবং সেখানে সাময়িকভাবে অবস্থান করে। পুরুষরা সাদা লুঙ্গি এবং সাদা আলখাল্লা এবং মহিলারা সাদা শাড়ি পরিধান করে। তাদের কাঁধে থাকে ভিক্ষার ঝুলি। তারা সন্তান ধারণ বা প্রতিপালন করতে পারে না। এ ধরনের জীবনকে বলা হয় 'জ্যান্তে মরা' বা জীবন্মৃত। মহিলাদেরকে বলা হয় সেবাদাসী। পুরুষ বাউল এক বা একাধিক সেবাদাসী রাখতে পারে। এই সেবাদাসীরা বাউলদের সাধনসঙ্গিনী। ১৯৭৬ সাল অবধি বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলায় ২৫২ জন ভেকধারী বাউল ছিল। ১৯৮২-৮৩ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৯০৫ জনে দাঁড়ায়। বর্তমানে সমগ্র দেশে ভেকধারী বাউলের সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার।

গৃহী বা সংসারী বাউলরা স্ত্রী-পুত্র-পরিজনসহ লোকালয়ে একটি স্বতন্ত্র পাড়ায় বাস করে। সমাজের অন্যদের সঙ্গে তাদের ওঠা-বসা, বিবাহ ইত্যাদি নিষিদ্ধ। ভেকধারী বাউলদের মতো তাদের কঠোর সাধনা করতে হয় না; 'কলমা' বা 'বীজমন্ত্র' পাঠ এবং নির্দিষ্ট কিছু সাধন-ভজন প্রক্রিয়া অনুসরণ করলেই হয়। ভেকধারী বাউলরা গৃহী বাউলদের দীক্ষা দিয়ে থাকে। উভয়ের সম্পর্ক অনেকটা পীর-মুরিদের মতো। দীক্ষা নেওয়ার পর সন্তানধারণ নিষিদ্ধ, তবে গুরুর অনুমতিক্রমে কেউ কেউ সন্তান ধারণ করতে পারে। বর্তমানে কৃষিজীবী, তন্তুবায় এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে বাউল হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব ব্যক্তির মধ্যে অনেকে কলকারখানার শ্রমিক ও দৈনন্দিন মজুর পর্যায়ভুক্ত। বাউলমতে দীক্ষিত হওয়ার পূর্বে বিবাহ হয়ে থাকলে নতুন করে কোনো অনুষ্ঠান করতে হয় না। ত্যাগী বাউলদের সেবাদাসী 'কণ্ঠিবদল' করে একজনকে ছেড়ে অন্য জনের সঙ্গে চলে যেতে পারে। বর্তমানে গৃহী বাউলদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গুরুধারা বাউলদের 'ঘর' বা 'গুরুধারা' আছে। এক একজন প্রধান বাউলগুরুর নামানুসারে এই 'ঘর' নির্দিষ্ট হয়। যেমন লালন শাহী, পাঞ্জু শাহী, দেলবার শাহী, পাঁচু শাহী ইত্যাদি। বাউলদের একটি বিশেষ সম্প্রদায় হলো কর্তাভজা। এরা বৈষ্ণবপন্থী এবং 'সতীমায়ের ঘর' বলে পরিচিত। সতী মা কর্তাভজা সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান গুরু। বাউলদের এসব ঘর বা গুরুধারার মধ্যে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য উভয়ই আছে। বৈসাদৃশ্য তাদের সাধন-ভজন এবং সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও লক্ষ করা

যায়। লালন শাহীর মধ্যে সুফি সাধনপ্রক্রিয়াসহ তন্ত্রযোগ এবং সহজিয়া সাধনতত্ত্ব এবং পাঞ্জু শাহীর মধ্যে সুফিভাবনা ও দর্শন অধিক গুরুত্ব পেয়েছে।

বাউল-ফকিরদের সাময়িক আবাসস্থলের নাম আখড়া। এসব আখড়া পল্লিগ্রামের লোকালয় থেকে একটু দূরে অবস্থিত। সাধারণত সংসারত্যাগী এবং ভেকধারী বাউল-ফকিররাই এখানে অবস্থান করে। গুরুগৃহ এবং তার সমাধিকে কেন্দ্র করেও আখড়া গড়ে ওঠে। লালন শাহ সমকালে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষ করে ঢাকার বিক্রমপুর, নরসিংদী, মানিকগঞ্জ, শ্রীহট্ট (সিলেট), ত্রিপুরা (কুমিল্লা), রংপুর, নিলফামারী, পাবনা, ফরিদপুর, রাজশাহী, যশোর, মাগুরা, ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর এবং কুষ্টিয়াতে বাউল-ফকিরদের আখড়া ছিল। ঝিনাইদহ অঞ্চলে হরিণাকুন্ড থানার কুলবেড়ে হরিশপুর গ্রামে পাঞ্জু শাহ বসতবাড়ি ও সমাধিকে কেন্দ্র করে আখড়া গড়ে উঠেছে। লালন ফকিরের আখড়া কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়া গ্রামে। আখড়ায় ভক্তরা জড় হয়ে গান গেয়ে ধর্মকর্ম পালন করে। ছেঁউড়িয়ায় প্রতি বছর দোল পূর্ণিমায় তিনদিন ব্যাপী 'মচ্ছব' (মহোৎসব) ও 'সাধুসেবা' অনুষ্ঠিত হয়।

বাউলবিরোধী আন্দোলন: বাউল সম্প্রদায় অতীতকাল থেকেই এক শ্রেণির মানুষের কাছে যেমন সমাদৃত হয়েছে, তেমনি অন্য এক শ্রেণির গোঁড়া সম্প্রদায়ের নিকট ধিকৃত ও নিন্দিতও হয়েছে। লালন নিজেও এর শিকার হয়েছেন। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্বপ্রদায়ই বাউলদের প্রতি কমবেশি বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিল। এর কারণ বাউলরা সকল প্রকার শাস্ত্রাচার ও জাতিভেদপ্রথাকে অস্বীকার করে এবং দেহবাদী আধ্যাত্মসাধনায় নিয়োজিত থাকে। তাদের এই সাধনায় নারীকে তারা সঙ্গিনী হিসেবে গ্রহণ করে। তাদের সাধনা প্রেমনির্ভর আধ্যাত্মবাদী হলেও তা মৈথুনাত্মক যৌনাচারমূলক হওয়ায় সুশীল সমাজ কর্তৃক নিন্দিত। ১৯৪২ সালে কুষ্টিয়া অঞ্চলে মওলানা আফসারউদ্দিনের নেতৃত্বে 'বাউল খেদা' নামে একটি আন্দোলনও হয়।

বাউল গান বাউল সম্প্রদায়ের সাধনসঙ্গীত। এটি লোকসঙ্গীতের অন্তর্গত। এ গানের উদ্ভব সম্পর্কে সঠিক কোনো তথ্য জানা যায় না। অনুমান করা হয় যে, খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতক কিংবা তার আগে থেকেই বাংলায় এ গানের প্রচলন ছিল। বাউল গানের প্রবক্তাদের মধ্যে লালন শাহ্, পাঞ্জু শাহ্, সিরাজ শাহ্ এবং দুদ্দু শাহ্ প্রধান। এঁদের ও অন্যান্য বাউল সাধকের রচিত গান গ্রামাঞ্চলে 'ভাবগান' বা 'ভাবসঙ্গীত' নামে পরিচিত। কেউ কেউ এসব গানকে 'শব্দগান' ও 'ধুয়া' গান নামেও অভিহিত করেন।

বাউল গান সাধারণত দুপ্রকার দৈন্য ও প্রবর্ত। এ থেকে সৃষ্টি হয়েছে রাগ দৈন্য ও রাগ প্রবর্ত। এই 'রাগ' অবশ্য শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের রাগ নয়, ভজন-সাধনের রাগ। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের মতো বাউল গানে 'রাগ' শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে 'রাগ' অর্থে অভিমান এবং প্রেমের নিবিড়তা বোঝায়। কাঙ্ক্ষিতজনের প্রতি নিবেদিত প্রেমের প্রগাঢ় অবস্থার নামই রাগ। রাগ দৈন্যে এমন ভাবই লক্ষণীয়। বাউলরা তাদের সাধনপন্থাকে রাগের কারণ বলে অভিহিত করে (আমার হয় না রে সে মনের মত মন/ আগে জানব কি সে রাগের কারণ)।

বাউল গান সাধারণত দুটি ধারায় পরিবেশিত হয় আখড়া আশ্রিত সাধনসঙ্গীত এবং আখড়াবহির্ভূত অনুষ্ঠানভিত্তিক। আখড়া আশ্রিত গানের ঢং ও সুর শান্ত এবং মৃদু তালের। অনেকটা হাম্দ, গজল কিংবা নাত সদৃশ্য। লালন শাহ আখড়ায় বসে ফকিররা এ শ্রেণির গান করে থাকে। অপর ধারার চর্চা হয় আখড়ার বাইরে অনুষ্ঠানাদিতে, জনসমক্ষে। এ গান চড়া সুরে গীত হয়। সঙ্গে একতারা, ডুগডুগি, খমক, ঢোলক, সারিন্দা, দোতারা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয়। তাল দাদরা, কাহারবা, কখনও ঝুমুর, একতালা কিংবা ঝাঁপতাল। শিল্পীরা নেচে নেচে গান করে। কখনও গ্রাম এলাকায় রোগের প্রাদুর্ভাব

ঘটলে বাউল গানের মাধ্যমে তা নিরাময়ের জন্য প্রার্থনা করা হয়। বাউলরা কখনও একক আবার কখনও দলবদ্ধভাবে সঙ্গীত পরিবেশন করে। এ গানের একজন মুল প্রবক্তা থাকে। তার সঙ্গে অন্যরা ধুয়া বা 'পাছ দোয়ার' ধরে।

বাউল গানে কেউ কেউ শাস্ত্রীয় রাগসঙ্গীতের প্রভাবের কথা বলেছেন। কিন্তু এ গান মূলত ধর্মীয় লোকসঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের উন্মেষ ও বিকাশ লোকসঙ্গীতের অনেক পরে। আধুনিক শিল্পীদের কণ্ঠে কখনও কখনও রাগের ব্যবহার হলেও তা সর্বক্ষেত্রে অপরিহার্য নয়।

বাউল গানে সাধারণত দুধরনের সুর লক্ষ করা যায় প্রথম কলি অর্থাৎ অস্থায়ীতে এক সুর এবং অন্য সব কলিতে কিছুটা ভিন্ন সুর। সবশেষে দ্রুতগতিতে দ্বিতীয় কলির অংশবিশেষ পুনরায় গীত হয়। এ গানে অস্থায়ী এবং অন্তরাই প্রধান। অস্থায়ীকে কখনও ধুয়া, মুখ বা মহড়া বলা হয়। দ্রুত লয়ের এ গানে প্রতি অন্তরার পর অস্থায়ী গাইতে হয়। কোনো কোনো গানে সঞ্চারী থাকে; আবার কোনো কোনো গানে নাচেরও প্রচলন রয়েছে, যার উৎস গ্রামীণ পাঁচালি গান বলে মনে করা হয়। তবে আখড়া আশ্রিত বাউল গানে নাচের প্রচলন নেই।

কিছু কিছু বাউল গান কীর্তন আশ্রিত। বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে এমনটি হয়েছে। তবে বাউল গানে সুফিভাবনাই প্রবল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের বাউল গানে সুরের পার্থক্য রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে সহজিয়া বৈষ্ণব সুরের আধিক্য, আর বাংলাদেশে সুফি গজলের প্রভাব, যার একটি দেশজরূপ ভাবগান ও শব্দগান। বাউল গানের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো এতে একটা উদাসী ভাব লক্ষ করা যায়; এর সুরে যেন মিশে থাকে না-পাওয়ার এক বেদনা। বাউল গানের একটি বড় সম্পদ তার গায়কী বা গায়নশৈলী। উল্লেখ্য যে, বাউল গান একটি বিশেষ অঞ্চলে রচিত হলেও সঙ্গীতশিল্পীদের কারণে এর ওপর বিভিন্ন অঞ্চলের প্রভাব পড়ে। ফলে সুর ও গায়কিতে আসে পরিবর্তন। কখনও কখনও শব্দেও পরিবর্তন ঘটে। লক্ষ করা গেছে, কুষ্টিয়া অঞ্চলের বাউল গান যখন সিলেট, চট্টগ্রাম, ঢাকা, ফরিদপুর, রাজশাহী বা দিনাজপুরে গীত হয়, তখন বাণীর উচ্চারণে, সুরের প্রক্ষেপণে এবং গায়কিতে পরিবর্তন আসে। কিন্তু তারমধ্যেও মূল সুর ও বাণীর মধ্যে কমবেশি ঐক্য বজায় থাকে।

অতীতে বাউল বা লালনের গানে নির্দিষ্ট কোনো সুর ছিল না। পরবর্তীকালে লালনশিষ্য মনিরুদ্দিন ফকির এবং তাঁর শিষ্য খোদা বক্স এই গানের একটি 'ছক' বাঁধার প্রচেষ্টা নেন। খোদা বক্সের শিষ্য অমূল্য শাহ্ ছিলেন একজন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ। তিনি বাউল তথা লালনগীতির একটি সঙ্গীতকাঠামো নির্মাণ করেন। তাঁর শিষ্য বেহাল শাহ্, শুকচাঁদ, দাসী ফকিরানী, চাঁদার গহর, নিমাই শাহ্, মহেন্দ্র, কানাই ক্ষ্যাপা, মতি ফকিরানী প্রমুখ এ গানের শ্রীবৃদ্ধি ঘটান। পরবর্তী সময়ে মহিম শাহ্, খোদাবক্স শাহ্, ঝড়ু শাহ্, করিম, বেল্লা, ফকিরচাঁদ, জোমেলা, খোরশেদ ফকির, লাইলি, ইয়াছিন শাহ্ প্রমুখ এর আরও উৎকর্ষ সাধন করেন। বেতার ও টেলিভিশন শিল্পী মকছেদ আলী খান বাউল গান ও লালনগীতির আধুনিকীকরণ করেন এবং তাঁর শিষ্য ফরিদা পারভীন বর্তমানে লালনগীতির সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় শিল্পী। তিনি বাউল গান ও লালন গীতিতে নতুন মাত্রা ও সুর সংযোজন করেন।

বাউল গানের একাধিক ঘরানা আছে। অবশ্য এ ঘরানা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের রীতি অনুযায়ী নয়। এ ঘরানা সাধন-ভজন সংক্রান্ত। বাউল গানের ঘরানার সংখ্যা পাঁচ লালন শাহী, পাঞ্জু শাহী, দেলবার শাহী, উজল শাহী এবং পাঁচু শাহী। লালন শাহ্, পাঞ্জু শাহ্ প্রমুখ পঞ্চ বাউলকে কেন্দ্র করে এই পাঁচটি ঘরানা গড়ে উঠেছে।

বাউল গানে নানা তত্ত্বকথা আছে যেমন দেহতত্ত্ব, গুরু বা মুর্শিদতত্ত্ব অথবা নবীতত্ত্ব, লীলা অথবা মনের মানুষ তত্ত্ব ইত্যাদি। প্রতি গানে দুটি পদ থাকে দেহতত্ত্ব এবং ভজনতত্ত্ব। বাউলরা নিজেদের ভাষায় এ দুটিকে উপর পদ এবং নিচের পদ বলে উল্লেখ করে। বাউল গানের সুরে কখনও কখনও ভাটিয়ালি সুরের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এর কারণ

মাঝিমাল্লারাও অনেক সময় নৌকা বাইতে বাইতে ধীর লয়ে এ গান গেয়ে থাকে। বাউল গানের বিশেষত্ব এই যে, এ গান কেবল বাউল সাধকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বাউলের সাধন-ভজন জানে না এমন সাধারণ মানুষও অধ্যাত্মরসের কারণে এ গান নিজের করে নিয়েছে।

বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ সৃজনশীল সাধকদের মধ্যে বাউল সম্প্রদায় অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। এই সম্প্রদায় মূলত দেহ-সাধনা করেন এবং গানের মাধ্যমেই সেই দেহ-সাধনার কথা প্রকাশ ও প্রচার করেন। বাউলদের রচিত গানের ভাবের গভীরতা, সুরের মাধুর্য, বাণীর সার্বজনীন মানবিক আবেদন বিশ্ববাসীকে মহামিলনের মন্ত্রে আহ্বান করে। তাই ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দে ইউনেস্কো বাংলার বাউলগানকে দি রিপ্রেজেন্টিটিভ অব দি ইন্টানজিবল কালচারাল হেরিটেজ অব হিউম্যানিটির তালিকাভুক্ত করে। অবশ্য তার আগেই বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশ-ষাটের দশক হতে ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে বাউলগান ও বাউলদের সাধনপদ্ধতি নিয়ে নানা ধরনের গবেষণা কার্যক্রম শুরু হয়। পাশাপাশি বাংলার বাউলগান পরিবেশন করতে গ্রামের বাউল সাধকশিল্পীগণ নানা দেশ ভ্রমণ করেন। তবে, জাতীয় পর্যায়ে ও আন্তর্জাতিক পরিমহলে বাউলদের সাধনা ও গান সম্পর্কে আগ্রহের সূচনা হয়েছিল প্রাথমিক পর্যায়ে কাঙাল হরিনাথ মজুমদার, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়, সরলা দেবী, ইন্দিরা দেবীর তৎপরতায়, পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলার বাউল ও বাউল সম্পর্কে বিশেষভাবে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, এমনকি নিজের রচনার ভাবসম্পদ হিসেবে বাউলগানের ভাবাদর্শ তিনি গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের সুর গৃহীত হয়েছিল বাউল গগন হরকার গান হতে।

বাউল সাধনার ইতিহাস ও সাধন-পদ্ধতি : দেহকেন্দ্রিক বাউল-সাধনার সাথে প্রাচীন ভারতীয় সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্রের সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করা যায়। তবে, বাউল-সাধনা মূলত বৈদিক বা ব্রাহ্মণ আচার বিরোধী এবং মৈথুনাত্মক ও রাগানুগা সাধনার পক্ষপাতী। প্রাচীন বৌদ্ধ সহজিয়া ও নাথধর্মের দেহ-সাধনার সাথে বাউল-সাধনার নৈকট্য খুঁজে পাওয়া যায়। প্রাচীন বৌদ্ধ সহজিয়াদের সাহিত্য-সংস্কৃতির নিদর্শন আনুমানিক ৬৫০-১২০০ খ্রিষ্টাব্দে রচিত চর্যাগীতির অনেক পদের সাথে বাংলার বাউলদের দেহ-সাধনার প্রতিধ্বনি শ্রুত হয়। যেমন- চর্যার প্রথম পদেই লুইপা যে দেহ সাধনার কথা বলেছেন, তা হলো- ‘কাআ তরু বর পঞ্চ বি ডাল।/চঞ্চল চিএ পৈঠ কাল॥/দৃঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।/লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জান॥’ অর্থাৎ মানবদেহে বৃক্ষশাখার মতো পাঁচটি ইন্দ্রিয় রয়েছে, আর তাদের চঞ্চলতার জন্য মৃত্যু ধেয়ে আসে। কিন্তু তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে মহাসুখের দেখা মেলে। লুই বলেন- গুরুর কাছ থেকেই কেবল সেই দেহ-সাধনায় মহাসুখ পাবার কৌশল জানা যায়। এ ধরনের কথার ভেতর দিয়ে দেহ-সাধনার জন্য যে গুরু আবশ্যক সেই নির্দেশনা পাওয়া যাচ্ছে। বাংলার বাউলরা আজও দেহ-সাধনার জন্য চর্যায় বর্ণিত সেই গুরুকেই আশ্রয় করে থাকেন। কিন্তু বাউল-সাধনার পূর্ণাঙ্গ উদ্ভব ও বিকাশ কাল হিসেবে সাধারণত ১৪৮৬ হতে ১৫৩৪ খ্রিষ্টাব্দে বর্তমান চৈতন্যদেবের সময়কে শনাক্ত করা হয়। কথিত আছে যে, চৈতন্যদেবের মৈথুনাত্মক সাধন-পদ্ধতি অনুসরণে আউল চাঁদের শিষ্য মাধববিধি বাউলমত প্রবর্তন করেন এবং মাধববিবির শিষ্য বীরভদ্রের তৎপরতায় এই মতের বিস্তৃতি ঘটে। বাউল মতের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে ডক্টর আহমদ শরীফ বলেন, “যে-সব প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ইসলাম কবুল করেছিল আর যে-সব প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ হিন্দু-সমাজ ভুক্ত হয়ে নিজেদের পূর্বপুরুষের ধর্মাচরণে রত ছিল, তারাই কালে বাউল সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েছে। বৌদ্ধ ঐতিহ্যের সাধারণ উল্টরাধিকার ছিল বলেই হিন্দু-মুসলমানের মিলনে বাউল মত গড়ে উঠতে পেরেছে।”

বাউল সাধনার সাথে যেহেতু নানা ধর্মমতের প্রভাব রয়েছে সেহেতু বাউল গানে হিন্দু প্রভাবে রাধা-কৃষ্ণ, শিব-শিবানী, মায়া-ব্রহ্ম, বিষ্ণু-লক্ষ্মী প্রভৃতি পুরুষ-প্রকৃতির প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে, মুসলিম প্রভাবে তেমনি মোকাম, মঞ্জিল, লতিফা, সিরাজম্মুনিরা, আল্লাহ, কাদের, গনি, রসুল, রুহ, আনল হক, আদম-হাওয়া, মুহম্মদ-খাদিজা, আলি-ফাতেমা

প্রভৃতি প্রতীকী রূপক গৃহীত হয়েছে। আবার বৌদ্ধ নাথ এবং নিরঞ্জনও পরিত্যক্ত হয়নি। এরসঙ্গে যুক্ত হয়েছে পৌরাণিক উপমা ও কুরআন-হাদিসের বাণীর নানা ইঙ্গিত [যেমন বর্জখ]। অবশ্য বাউল রচনায় এসব শব্দ ও পরিভাষা তাদের মতানুগ অর্থান্তর তথা নতুন ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। বৈষ্ণব ও সূফী সাধনার সঙ্গে বাউল মতের মৌলিক পার্থক্য বর্তমান। সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি পরিহার করে যে মিলন-ময়দান তারা তৈরি করল, তাকে সার্থক ও স্থায়ী করার জন্য পরমাত্মা বা উপাস্যের নামেও এক সর্বজনীন পরিভাষা তারা সৃষ্টি করেছে। তাদের ভাষায় 'পরমতত্ত্ব' পরমেশ্বর বা সচ্চিদানন্দ হচ্ছেন মানুষ, অটল মানুষ, সহজ মানুষ, অধর মানুষ, রসের মানুষ, ভাবের মানুষ, অলখ সাঁই, অচিন পাখি, মনুরা প্রভৃতি পরমাত্মা- আত্মারই পূর্ণাঙ্গ রূপ। বাউল মতে, দেহস্থিত আত্মাকে কিংবা আত্মা সম্বলিত নরদেহকে যখন 'মানুষ' বলে অভিহিত করা হয়, তখন পূর্ণাঙ্গ বা অখ- আত্মা বা পরমাত্মাকে মানুষ বলতে বাধা থাকে না।

বাউল সাধনার এই প্রকৃতি বিচারে ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মতে জানা যায়, খ্রিষ্টীয় সতেরো শতকের মধ্যভাগ হতে বাউল মতের উদ্ভব। গুরু, মৈথুন ও যোগ তিনটিই সমগুরুত্ব পেয়েছে বাউল মতে। তাই গুরু, বিন্দুধারণ ও দম বা শ্বাস-প্রশ্বাসের কথা বাউল গানে অত্যাধিক। সৎগুরুর কাছে দীক্ষা না নিলে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করা অসম্ভব এবং বিন্দুধারণে সামর্থ্যই সিদ্ধির প্রকৃষ্ট নিদর্শন। বাউল মতে আত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন। এই দেহস্থিত আত্মাই মানুষ, মানের মানুষ, রসের মানুষ, অলখ সাঁই। বাউলের 'রসস্বরূপ' হচ্ছে সাকার দেহের মধ্যে নিরাকার আনন্দস্বরূপ আত্মাকে স্বরূপে উপলব্ধি করার প্রয়াস। এটিই আত্মতত্ত্ব। এর মাধ্যমে অরূপের কামনায় রূপ সাগরে ডুব দেয়া, স্বভাব থেকে ভাবে উত্তরণ। সহজিয়াদের 'সহজ'ই সহজ মানুষ। মৈথুন মাধ্যমে বিন্দুধারণ ও উর্ধ্বে সঞ্চালনের সময়ে গঙ্গা (ইড়া) ও যমুনা (পিঙ্গলা) বেয়ে সরস্বতীতে (সুষু¤œায়) ত্রিবেণঅ (মিলন) ঘটাতে হয়। তারপর সেখান থেকে সহ¯্রায় (মস্তকস্থিত-সহ¯্রদল পদ্মে) যখন বিন্দু গিয়ে পড়ে, তখনই সৃষ্টি হয় মহাভাব বা সহজ অবস্থা। বাউলগণ মূলত সাধনায় সেই মহাভাব অর্জন করেন।

বাউলের শাব্দিক অর্থ ভেদ: বাংলার বাউল, বাউল মত ও বাউল সংগীত তথা বাউল গান নিয়ে নানা জনের নানা মত প্রচলিত। এই মতানৈক্যের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে "বাউল" শব্দটি। আসলে, "বাউল" শব্দটির অর্থ, তাৎপর্য, উৎপত্তি ইত্যাদি নিয়ে অদ্যাবধি গবেষকেরা যেমন কোনো সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত দিতে পারেন নি, তেমনি "বাউল মত"-এর স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও কোনো সুনির্দিষ্ট ধারণা প্রদান করতে পারেন নি। নানা জনের নানা মত নিয়েই "বাউল মত" বিষয়ে অমীমাসিংত আলোচনা চলছে এবং চলমান থাকবে বলেই আমাদের ধারণা।

বাউল মত ও তার উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে কোনো কোনো গবেষক বলেছেন- সংস্কৃত "বায়ু" থেকে বাউল শব্দটির উৎপত্তি, তাঁদের মতে সংস্কৃত বায়ু= বাঙ্গালা "বাই", "বাউ" শব্দের সাথে স্বার্থে "ল" প্রত্যয়যোগে বাউল শব্দটির উৎপত্তি, এই মতানুসারি গবেষকদের ভাষ্যে জানা যায়- বাংলার যে সব লোক "বায়ু" অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার সাহায্যে সাধনার মাধ্যমে আত্মিক শক্তি লাভ করার চেষ্টা করেন, তাঁরাই বাউল।২

গবেষকদের কেউ কেউ আবার বলেছেন- সংস্কৃত "বাতুল" শব্দ থেকে বাউল শব্দটির উৎপত্তি, প্রাকৃত ব্যাকরণ মতে- দুই স্বরবর্ণের (এখানে "আ" এবং "উ") মধ্যবর্তী ব্যঞ্জনবর্ণ (এখানে "ত") লোপ পায়, আসলে এঁই সূত্রমতেই "বাতুল" শব্দটি "বাউল" হয়ে গেছে, গবেষকদের মতে- যে সব লোক প্রকৃতই পাগল, তাই তাঁরা কোনো সামাজিক বা ধর্মের কোনো বিধিনিষেধ মানে না, তাঁরাই বাউল।

বাউল মতের স্বরূপ নির্ধারণের প্রশ্নে গবেষকদের অন্য দল বলেন- প্রাকৃত "বাউর" শব্দ হতে "বাউল" শব্দটি উৎপত্তি লাভ করেছে, "বাউর" অর্থ এলো-মেলো, বিশৃঙ্খল, পাগল। এই দলের গবেষক-মতে, বাংলার বাউলদের মতো একদল বিশৃঙ্খল চিন্তাজীবী লোক উত্তর-ভারতে প্রত্যক্ষ করা যায়, বাংলার বাউল চিন্তার দিক হতে তাদেরই এক গোষ্ঠীভুক্ত।

সুতরাং উত্তর-ভারতীয় প্রাকৃত শব্দ "বাউর" বাংলাদেশে "বাউল" শব্দে পরিণত হয়ে থাকবে, কেননা লোকায়ত সমাজে উচ্চারণ-ধ্বনির দিক দিয়ে "র" এবং "ল" বর্ণের সাদৃশ্য থাকায় অনেক ক্ষেত্রে এই দুটি বর্ণ পরস্পরের রূপ গ্রহণ করে থাকে।

আরেক শ্রেণীর গবেষকদের ভাষ্যমতে- "বাউল" শব্দকে "আউল" শব্দের পৌনঃপুনিক অপভ্রংশ বলে মনে করেন, তবে তাঁরা এ কথা মনে করেন না যে "আউল" শব্দটির উৎপত্তি সংস্কৃত "আকুল" শব্দ হতে, তার বদলে মুসলমান সাধক অর্থে আরবি "অলী" শব্দের বহুবচন "আউলিয়া" শব্দ হতে "ইয়া" প্রত্যয়ের পতনে উৎপত্তি বলে মনে করে থাকেন। তাঁদের মতে- বাংলার যে সব লোক মুসলমান দরবেশদের মতো লম্বা আল্খল্লা পরে, তাঁদের বাণী ও বিশ্বাসে আস্থাপরায়ণ হয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়, তাঁরাই বাউল। এই জন্যই নাকি বাউল-সন্ন্যাসীদের "ফকির" বলা হয়।

গবেষক মুহম্মদ এনামুল হক "বাউল" শব্দের উৎপত্তি ও তার অর্থ সম্পর্কে উপর্যুক্ত নিষ্পত্তিগুলো উদ্ধৃতি দিয়ে সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, "বাউল সম্প্রদায়ের নাম বাউলেরা নিজে গ্রহণ করে নাই। সাধারণ বাউল-বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করিয়াই, দেশের লোক তাহাদিগকে এই নাম দিয়াছে।"

মুহম্মদ এনামুল হকের এই বক্তব্যের সাথে একথা যুক্ত করা অসঙ্গত হবে না যে, বাউলেরা নিজেরা যেহেতু নিজেদের বাউল নামটি দেন নি সেহেতু "বাউল" শব্দটির উৎপত্তি ও ব্যাখ্যা নিয়ে নানা ধরনের মত প্রচলিত রয়েছে, কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে বাউল মতের মর্মকথা অনুধাবন করা অত্যন্ত দুরুহ ব্যাপার।

বাউল গানে বাউলের সংজ্ঞা : বাউলের প্রকৃতি সম্পর্কে বাউল গানে নানা ধরনের তথ্য বিবৃত হয়েছে। এ পর্যায়ে বাউল-সাধকের রচিত সংগীতের বাণীকে আশ্রয় করেই বাউল মতের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হচ্ছে। যেমন, একটি বাউল সংগীতের বাণীতে পাওয়া যাচ্ছে-

যে খুঁজে মানুষে খুদা
সেই তো বাউল
বস্তুতে ঈশ্বর খুঁজে
পাই তার উল॥
পূর্ব জন্ম না মানে
ধরা দেয় না অনুমানে
মানুষ ভজে বর্তমানে
হয় রে কবুল॥
বেদ তুলসী মালা টেপা
এসব তারা বলে ধুকা
শয়তানে দিয়ে ধাপ্পা
করে ভুল॥
মানুষে সকল মেলে
দেখে শুনে বাউল বলে
দীন দুদ্দু কি বলে

বাংলাদেশের ঝিনাইদহ অঞ্চলের বাউল-সাধক দুদ্দু শাহ কর্তৃক উপর্যুক্ত সংগীতের বাণীতে "বাউল মত" তথা বাউলতত্ত্বের মূল-কথাটা অত্যন্ত সহজ-সরলভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কেননা, বাংলার বাউলদের মূল পরিচয়ের প্রধানতম একটি দিক হলো- তাঁরা মানুষেই শ্রষ্টার সন্ধান করেন। দ্বিতীয়ত দিক হলো- তাঁরা প্রচলিত ধর্মগোষ্ঠীর লোকদের মতো অনুমানে বিশ্বাস করেন না, এমনকি পূর্বজন্ম বা জন্মান্তরবাদকে মানতে নারাজ; তৃতীয়ত- বেদ তুলসী মালা টেপাকে তাঁরা ধোক্কার কাজ বলে গণ্য করেন। আসলে, প্রচলিত ধর্মীয় চেতনার বাইরে দাঁড়িয়ে বাংলার বাউল মত মূলত 'মানুষে সকল মেলে' এই তত্ত্বের জন্ম দিয়েছে।

বাউল-গবেষক শক্তিনাথ ঝা তাঁর ব্যাখ্যায় বলেছেন- 'বাউল মতবাদ কোন ধর্ম নয়। সম্প্রদায় কথাটি শিথিলভাবে এখানে ব্যবহৃত হতে পারে। বিভিন্ন ধর্ম গোষ্ঠী ও সামাজিক স্তরের ব্যক্তি বিশেষ গুরুর কাছ থেকে এ মতবাদ, গান ও সাধনা গ্রহণ করে নিজ নিজ সামর্থ্য ও সংস্কারানুযায়ী তা পালন করতে চেষ্টা করে এবং এক শিথিল স্বেচ্ছামূলক ম-লী গঠন করে। সাধক আবার গুরু হিসাবে বিশ্লিষ্ট হয়ে পৃথক এক বৃত্ত নির্মাণ করে। এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য ও বৈচিত্র্য দুই-ই আছে। বাউল তত্ত্বে এবং সাধনায় প্রচলিত মূল্যবোধ ও আচারকে বিপরীত রূপে আদর্শায়িত করা হয়, প্রচলিত শাস্ত্রবিরোধী সাধনা নানা বৈচিত্র্য-মত রূপে বাউল জীবনচর্যা রচনা করেছে। অলৌকিক ঈশ্বর, দেহব্যতিরিক্ত আত্মা, স্বর্গাদি পরলোকে অবিশ্বাসী বাউল ইহবাদী, দেহবাদী। আর্থ- সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিধিবিধানের প্রতিবাদী মানুষেরা বাউল মতবাদ গ্রহণ করে।'

বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র বাউল মতের প্রভাব রয়েছে। তবে, এক এক অঞ্চলের বাউল মত এক এক রকমভাবে বিকাশ লাভ করেছে। যেমন- কুষ্টিয়া অঞ্চলের লালনপন্থী বাউল-সাধকদের সাধনা-পদ্ধতি, জীবনাচার-বেশ-বাস, সাধুসঙ্গ, এমনকি গায়কী ও গানের সুর-বাণী ইত্যাদির সাথে বৃহত্তর সিলেট, ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা ইত্যাদি অঞ্চলের বাউলদের তেমন কোনো সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করা যায় না। কিন্তু ভাবের দিক দিয়ে ও সাধনার ঘর হিসেবে দেহকে আশ্রয় করার বিষয়ে কিছুটা মিল রয়েছে। আসলে, সব অঞ্চলের বাউলেরাই সাধনার আশ্রয় হিসেবে দেহকে অবলম্বন করে থাকেন এবং দেহ-ঘরের মধ্যে তাঁরা সৃষ্টি-শ্রষ্টার অবস্থান পর্যবেক্ষণ করেন, আর গুরু-শিষ্য পরম্পরায় প্রায় সব অঞ্চলের বাউলেরা সাধনার ধারা অব্যাহত রাখেন। এক্ষেত্রে গুরুকে তাঁরা শ্রষ্টার সমতুল্য বিবেচনা করেন। তাঁরা মনে করেন গুরু বা মুর্শিদকে ভজনা করার ভেতর দিয়ে শ্রষ্টার সাথে সাক্ষাৎ করা যায়। গুরু-শিষ্যের এই পরম্পরাভেদকে লালন সাঁইজি প্রকাশ করেছেন এভাবে-

যেহি মুর্শিদ সেই তো রাছুল
ইহাতে নেই কোন ভুল
খোদাও সে হয়;
লালন কয় না এমন কথা
কোরানে কয়॥

বাংলাদেশের বাউলেরা এভাবেই অকাট্য যুক্তির আলোকে শরিয়তি গ্রন্থকে সামনে রেখেই গুরুবাদী ধারার সাধনচর্চাকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। শুধু তাই নয়, মানুষ-গুরু ভজনা এবং মানুষকে সেজদার যোগ্য বিবেচনা করে, তার ভেতর দিয়েই যে শ্রষ্টার শ্রেষ্ট ইবাদত সম্ভব বাংলার বাউল-সাধকেরা সেকথা ব্যক্ত করতেও দ্বিধা করেন নি।

এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, বাংলার বাউল মত কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির সৃষ্টি নয়। তাই বাউলেরা বৈষ্ণব, চিশতিয়া প্রভৃতি সাধক-শ্রেণীর মতো কোনো বিশিষ্ট সম্প্রদায় নয়। বৈষ্ণব ও বিভিন্ন শ্রেণীর সুফি মতের অনুসারীরা যেমন তাঁদের প্রতিষ্ঠাতার নাম বলতে পারেন, বাউলেরা তা পারেন না। অতএব, আদি বাউল কে- তা নিয়ে বির্তকের কোনো শেষ নেই। বাউল-গবেষক শক্তিনাথ ঝা অবশ্য বিভিন্ন গবেষকের সূত্র মিলিয়ে বাংলার বাউল মতের প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত দিয়েছেন চর্যাপদ, বৈষ্ণব পদাবলী, মঙ্গলকাব্য ইত্যাদি সাহিত্য নিদর্শনের উদ্ধৃতি ও ব্যাখ্যা সহকারে। তাঁর মতে, বাউলদের আদিগুরুর নাম সঠিকভাবে নির্ধারণ করা না গেলেও এ কথা অন্তত বলা যায়- বাংলার 'বাউল পন্থা কোন অর্বাচীন মতবাদ নয়।'

বাউলদের স্বরূপ ও পরিচয় দিতে গিয়ে মুহম্মদ এনামুল হক বলেন "বাউল"-দিগকে "বাতুল" অর্থাৎ পাগল বলা হয়। বাউলেরা যাঁহার সন্ধানে পাগল, তাঁহার কোন নাম নাই,- তিনি "অনামক"। তবে তাঁহারা তাঁহাকে যখন যাহা খুশী সেই নামে অভিহিত করে। তাই দেখিতে পাই, তাহারা তাঁহাকে "মন-মনুরা", "আলেক্", "আলেখ্ সাঁই", "অচিন পাখী", "মনের মানুষ", "দরদী সাঁই" ও "সাঁই" প্রভৃতি কত নামেই না পরিচিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। এইরূপ যে নামেই তাহারা তাঁহাকে পরিচয় দিক না কেন, তিনি তাহাদের নিকট চিরদিনই "অনামক"। হিন্দুর "ব্রহ্ম", বৈষ্ণবের "কৃষ্ণ", বা মুসলমানের "আল্লাহ"-এর ন্যায় কোন একটি বিশিষ্ট নাম আরোপ করা তাহাদের স্বভাব নয়।" একই সঙ্গে সেই পরমসত্তাকে বাংলার বাউলেরা সাধারণ ধর্মাচারী মানুষের মতো তারা ভীতিকর এবং দেহ ও নিজের আত্মগত সত্তার বাইরের বস্তু বলেও মনে করে না। বরং দেহকেন্দ্রিক ষটচক্র যোগে সাধনায় আত্ম তথা স্রষ্টা দর্শনের অপূর্ব প্রশান্তি খুঁজে ফেরেন।

বাউলের আঞ্চলিক বৃত্ত : বাংলার বাউলদের আঞ্চলিক সীমারেখা হল বাংলাদেশের কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, ফরিদপুর, যশোর, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, টাঙ্গাইল, জামালপুর, ঢাকা, মানিকগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম ইত্যাদি অঞ্চল এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, বাকুড়া, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, চব্বিশপরগণা ইত্যাদি। এই যে বিশাল এলাকা জুড়ে বাউলদের বিস্তার ঘটেছে, তাতে সবখানে একই ধরনের বাউল প্রত্যক্ষ করা যায় না। আসলে, অঞ্চলভেদে বাউলদের বেশ-বাস হতে শুরু করে গানের কথায়, সুরে, এমনকি সাধন-পদ্ধতিতে, করণ-কার্যে নানা ধরনের বৈসাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করা যায়। যেমন রাঢ় অঞ্চলের বাউলদের সাথে মধ্যবঙ্গের বাউলদের অন্তর্গত সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া খুব মুশকিল। আসলে, পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া-মুর্শিদাবাদ বা বীরভূম-বাকুড়া অঞ্চলের বাউলেরা বৈষ্ণবপ্রভাবিত, তারা বৈষ্ণবদের মতো যেমন গেরুয়া-হলুদ পোশাক পরিধান করেন, তেমনি গানের শুরুতে বা পরে মুখে বলেন 'হরি হরি' বা 'হরি বোল'; পক্ষান্তরে কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, ফরিদপুর, মাগুরা অঞ্চলের বাউলেরা নাথ, বৈষ্ণব ও সুফি মতবাদের মিশ্রণে সাধনায় নিবিষ্ঠ থাকেন, অন্যদিকে তারা জিন্দাদেহে মুর্দার বেশ তথা সাদা কাপড় পরিধান করেন, আর মুখে বলেন 'আলেক সাঁই', 'আল্লাহ আলেক', 'জয় গুরু', 'সাঁই নিরঞ্জন' ইত্যাদি, এদের সাধন-করণ হিসেবে সাধুসঙ্গ করতে দেখা যায়, সে সাধুসঙ্গের সাথে দিনডাকা, আসন দেওয়া, সেবাগ্রহণ, গান গাওয়া ইত্যাদি স্বতন্ত্র্য কিছু নিয়ম মেনে সম্পন্ন করা হয়। অন্যদিকে সিলেট, চট্টগ্রাম, ঢাকা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের বাউলেরাও ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়েই তাদের সাধন-ভজন করেন। তবে, এ সকল অঞ্চলের বাউলদের সঙ্গে সুফিদের নিকট সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করা যায়। তবে, করণ-কার্যের অনেক কিছুতেই তারাও সুফিদের থেকে স্বতন্ত্র্য পরিচয়ের অধিকারী।

বাউল-সাধক ও পদকর্তা : বাংলার বাউল-সাধক পদকর্তাদের মধ্যে শ্রেষ্টত্বের দাবীদার হলেন- ফকির লালন সাঁই। তিনি আনুমানিক ১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ধরাধামে ছিলেন। লালন সাঁই তাঁর সমগ্রজীবন ব্যয় করেছেন বাউল-সাধনার স্থায়ী ও একটি গানগত রূপ দিতে, তাঁর গানে বাউল-সাধনার করণ-কার্যের নানাবিধ নির্দেশনা আছে। তিনি দৈন হতে শুরু করে গোষ্ঠ, গৌর, আত্মতত্ত্ব, আদমতত্ত্ব, নবীতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব ইত্যাদি পর্বের গানের পাশাপাশি সমাজ-সংস্কারমূলক মানবিকতার উদ্বোধনমূলক গান রচনা করেছেন। বাউল-সাধনার গুরু-শিষ্য পরম্পরার লালন প্রবর্তিত ধারাটি অদ্যাবধি বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গে অত্যন্ত বেগবান রয়েছে। লালনপন্থী সাধকদের মধ্যে পদ রচনায় অন্যান্য যারা শ্রেষ্টত্ব অর্জন করেছেন, তারা হলেন- দুদ্দু শাহ, খোদাবকশ শাহ, বেহাল শাহ, মকছেদ আলী সাঁই, মহিন শাহ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশ ও ভারতের বাউল-সাধক, পদকর্তা ও সংগীতশিল্পী হিসেবে যাদের স্বীকৃতি রয়েছে, তাঁরা হলেন যাদু বিন্দু, দ্বিজ দাস, পাঞ্জু শাহ, গোসাই গোপাল, হাছন রাজা, নবনী দাস বাউল, পূর্ণদাস বাউল, শাহ আবদুল করিম প্রমুখ। বাউল-সাধনা ও বাউল গান রচনার ধারা বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গে এখনও প্রবহমান ও সজীব একটি ধারা, যুগে যুগে কালে কালে শত সহ ্র বাউলেরা পূর্বে যেমন এই সাধনা ও গানের ধারা চর্চা করেছেন, বর্তমান কালেও অসণিত বাউল-সাধক-ভক্তগণ এই ধারা অব্যাহত রেখে চলেছেন, বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে গেলে এখনও তাই বাউলের দেখা মেলে, এমনকি চলতে পথে রাস্তায়, ট্রেনে, বাসে বা শহরাঞ্চলেও বাউলশিল্পীদের প্রসার চোখ এড়িয়ে যায় না, কেননা তাদের কণ্ঠে থাকে সুমধুর গান আর ভাবের বিস্তার।

ভাওইয়া:

ভাওয়াইয়া মূলত বাংলাদেশের রংপুর এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহারে ও আসামের গোয়ালপাড়ায় প্রচলিত এক প্রকার পল্লীগীতি। এসকল গানের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এ গানগুলোতে স্থানীয় সংস্কৃতি, জনপদের জীবনযাত্রা, তাদের কর্মক্ষেত্র, পারিবারিক ঘটনাবলী ইত্যাদির সার্থক প্রয়োগ ঘটেছে।

ভাওয়াইয়া গানের আকরভূমি রংপুর। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের নদী-নালা কম থাকায় গরুর গাড়িতে চলাচলের প্রচলন ছিল। আর গরুর গাড়ির গাড়োয়ান রাত্রে গাড়ি চলাবস্থায় বিরহ ভাবাবেগে কাতর হয়ে আপন মনে গান ধরে। উঁচু-নিচু রাস্তায় গাড়ির চাকা পড়লে তার গানের সুরে আধো-ভাঙ্গা বা ভাঁজ পড়ে। এই রকম সুরে ভাঙ্গা বা ভাঁজ পড়া গীতরীতিই 'ভাওয়াইয়া' গানে লক্ষণীয়। প্রেম-বিয়োগে উদ্বেলিত গলার স্বর জড়িয়ে যেরকম হয়, সেরকম একটা সুরের ভাঁজ উঁচু স্বর হতে ক্রমশঃ নিচের দিকে নেমে আসে। সুরে ভাঁজ পড়া ভাওয়াইয়া গানের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য।

এই গানের উৎসভূমি বাথান সংস্কৃতি। বাথান সংস্কৃতি থেকে উঠে এসেছে মৈষালি জীবন। যে মৈষালি জীবনের মধ্যে রয়েছে এই অঞ্চলের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রত্নরূপ। ধরা যাক, একজন জোতদারের অধীনে চারটে বাথান রয়েছে। এই চারটে বাথানের দেখাশোনার জন্য চারজন মৈষাল বা বাথানের তত্ত্বাবধায়ক দরকার। এই মৈষালেরা আদপে সংসারি। কিন্তু তাঁরা সংসার ত্যাগ করে একা চলে আসতেন বাথানে। এই বাথানকে কেন্দ্র করে মৈষাল-জীবনের যে বিরহ-বেদনা বা প্রেম, তারই সুরকাঠামো এবং বাণীরূপ পাওয়া যায় ভাওয়াইয়া গানে।

ভাওয়াইয়া শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, ‘ভাওয়া’ শব্দ থেকে ভাওয়াইয়ার উৎপত্তি। ‘ভাওয়া’ মানে গোচারণভূমি। এই গোচারণভূমি কেন্দ্রিক গানই ভাওয়াইয়ায় রূপ পেয়েছে।। ভাওয়াইয়া লোকসঙ্গীত। বিশ্বের যে

কোনও লোকসংগীত সৃষ্টির মূলে রয়েছে ছোট ছোট ধারা-উপধারা। ধারা-উপধারাই বৃহৎ নদীর ক্যানভাস। তেমনই উত্তরবঙ্গের প্রেক্ষাপটে সেই বৃহৎ নদীর নাম ভাওয়াইয়া। পরবর্তীকালে গাড়িয়াল, মৈষাল ও মানুষের মধ্যে দিয়ে উঠে এসেছে ত্রিধারা। যে ত্রিধারার মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলের মানুষের সংস্কৃতি এবং মাতৃতান্ত্রিক ভাবনা ভাওয়াইয়ার প্রাণসত্তায় সিঞ্চিত।

ভাওয়াইয়ার জগতে বিচরণ করতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে আব্বাসউদ্দিন আর নায়েব আলির কথা। মনে পড়ে সুরেন বসুনিয়ার কথাও। উত্তরের লোকসংস্কৃতির এই ধারাকে আজও লালন করছেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুখবিলাস বর্মা, দীপ্তি রায়, দুর্গা রায়, ধনেশ্বর রায়, সুমিত্রা রায়, সন্তোষ বর্মণ, জিনাত আমন, চৈতন্য দেব রায়, হৈমন্তী পাটোয়ারি, প্রতিমা দাস, নগেন শীল শর্মা, যুথিকা রায়, মনা রায় প্রমুখ।

বৃহত্তর বা অখণ্ড উত্তরবঙ্গের রংপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং অসমের গোয়ালপাড়া জেলায় ছড়িয়ে আছে ভাওয়াইয়া গানের সুরের সুবাস। তবে, সমাজসংস্কৃতির বিবর্তনের ধারায় ভাওয়াইয়াও অনেকাংশে বিবর্তিত। পুরনো দিনের গায়কি আর তেমন খুঁজে পাওয়া অনেক ক্ষেত্রেই। বদলে যাচ্ছে ভাওয়াইয়া গানের ভাষাও। তাতে স্থান পাচ্ছে পরিশীলিত বাংলা। বাহিরানা থেকে ক্রমশ ঘরমুখী হতে চলেছে ভাওয়াইয়া। ‘ভাত না চড়ায়া, ভাত না আন্ধিয়া, ভাত না বাড়িনু রে / তবু বন্ধু মোর আসিল না রে’— এখানে ‘না’ অব্যয় পদ। এই অব্যয় পদের ব্যবহার আজকের ভাওয়াইয়া গানে ক্রমশ কমে আসছে। বদল ঘটছে আবহ ও যন্ত্রানুষঙ্গেও। ভাওয়াইয়ার আদি বাদ্যযন্ত্র দোতারা, খোল আর বাঁশি। সাম্প্রতিক কালে আধুনিক বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োগ লক্ষ করা যাচ্ছে। বর্তমানে ভাওয়াইয়া গানের বাণীতে উঠে আসছে রিকশা, টোটো এবং সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতও।

লোকসংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ দীপককুমার রায় মনে করেন, ভাওয়াইয়া উত্তরবঙ্গের অতি-গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। যে সংস্কৃতির মধ্যে অবিভক্ত উত্তরবঙ্গ ও নিম্ন-অসমের সমাজ, সংস্কৃতি, নৃতাত্ত্বিক ঐতিহ্য এবং ইতিহাস জড়িয়ে আছে। উত্তরবঙ্গের প্রকৃতি ও মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভাওয়াইয়া সঙ্গীতধারা। এই অঞ্চলের গাড়িয়াল, দফাদার মৈষাল, মাহুতের কথা যেমন ভাওয়াইয়া গানে জড়িয়ে আছে, তেমনই স্থান পেয়েছে তিস্তা-তোর্সার উথালপাথাল ঢেউয়ের কথাও। উত্তরবঙ্গের নদীগুলি খরস্রোতা। নদীর সুর ও ছন্দে, লোকজীবনের জীবনচর্যার মধ্যে দিয়ে গীতিময় রূপজগৎ বাধা পড়েছে ভাওয়াইয়ায়। গাছগাছালি আর অরণ্যভূমি যেমন ধরা পড়েছে, তেমনই ধরা পড়েছে শস্যশ্যামলা কৃষিভূমিও, যেখানে তৈরি হয় গামছাবান্ধা দই, বিন্নিধানের চিঁড়ে। কৃষিফসলের বিস্তৃত ভাণ্ডারের সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে ভাওয়াইয়া গানের বাণীতে।

‘তিস্তানদী উথালপাথাল কার-বা চলে নাও’— উচ্চারণমাত্রে বোঝা যায়, প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে ভাওয়াইয়ার ভাণ্ডার অসম্পূর্ণ। ভাওয়াইয়ার মধ্যে নিহিত আছে রাজবংশী সমাজের ভাষা-সংস্কৃতি। এ ধারার মধ্যে নিহিত রয়েছে মুসলিম ও হিন্দু সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক মিলিত সংস্কৃতি। অশান্ত এই সময়ে ভাওয়াইয়ার চর্চা তাই খুব জরুরি। কারণ, এর মধ্যে বাংলার আবহমান পরিচয়টি গাঁথা রয়েছে।

দুঃখের বিষয়, ভাওয়াইয়া নিয়ে আগ্রহ আজ অনেকটাই তলানিতে। আশঙ্কা ঠিক এখানেই। ইতিহাসবিস্মৃত মানুষ হতভাগ্যই! যুগের হাওয়ায় ভাওয়াইয়া সংস্কৃতি যদি হারিয়ে যায় বা বিকৃত হয়ে পড়ে, তা হলে এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অস্তিত্বের সঙ্কটই গাঢ়তর হবে, ক্ষুণ্ন হবে ঐক্যভাবনা আর সম্প্রীতি।
তাই এই সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সরকারি ও বেসরকারি প্রয়াস খুব জরুরি। একই সঙ্গে এগিয়ে আসতে হবে উত্তরবঙ্গের মানুষজনকেও। ভাওয়াইয়াকে রক্ষা করা, তাকে লালন করার প্রধান দায় এবং দায়িত্ব ভাওয়াইয়ার মাটির মানুষজনেরই।

ভাদু:

ভাদু উৎসব ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমা এবং ঝাড়খণ্ড রাজ্যের রাঁচি ও হাজারিবাগ জেলার লৌকিক উৎসব।

ভাদু উৎসব নিয়ে মানভূম অঞ্চলে বেশ কিছু লোককাহিনী প্রচলিত রয়েছে। পঞ্চকোট রাজপরিবারের নীলমণি সিংদেওর তৃতীয়া কন্যা ভদ্রাবতী বিবাহ স্থির হওয়ার পর তার ভাবী স্বামীর অকালমৃত্যু হলে মানসিক আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে তিনি আত্মহত্যা করেন, এই কাহিনী মানভূম অঞ্চলে সর্বাধিক প্রচারিত। বিয়ে করতে আসার সময় ভদ্রাবতীর হবু স্বামী ও তার বরযাত্রী ডাকাতদলের হাতে খুন হলে ভদ্রাবতী চিতার আগুনে প্রাণ বিসর্জন করেন বলে ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার পুরুলিয়া গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। ভদ্রাবতীকে জনমানসে স্মরণীয় করে রাখার জন্য নীলমণি সিংদেও ভাদু গানের প্রচলন করেন। কিন্তু এই কাহিনীগুলি ঐতিহাসিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়। রাজপুরোহিত রাখালচন্দ্র চক্রবর্তী রচিত পঞ্চকোট ইতিহাস নামক গ্রন্থে এই ধরনের কোন ঘটনার উল্লেখ নেই। নীলমণি সিংদেও তিনজন পত্নীর গর্ভে দশজন পুত্রসন্তানের জন্ম দিলেও তার কোন কন্যাসন্তানের ছিল কিনা সেই বিষয়েও সঠিক তথ্যের অভাব রয়েছে।[১]:১৬ বীরভূম জেলায় ভদ্রাবতীকে হেতমপুরের রাজার কন্যা হিসেবেও কল্পনা করা হয়েছে। এই জেলায় প্রচলিত রয়েছে যে, ভদ্রাবতীর সাথে বিবাহ স্থির হওয়ার পর ইলামবাজারের নিকটে অবস্থিত চৌপারির শালবনে ডাকাতদের আক্রমণে বর্ধমানের রাজপুত্রের মৃত্যু হলে ভদ্রাবতী তার সাথে সহমরণে যান।

পয়লা ভাদ্র কুমারী মেয়েরা গ্রামের কোন বাড়ীর কুলুঙ্গী বা প্রকোষ্ঠ পরিষ্কার করে ভাদু প্রতিষ্ঠা করেন। একটি পাত্রে ফুল রেখে ভাদুর বিমূর্ত রূপ কল্পনা করে তারা সমবেত কণ্ঠে ভাদু গীত গেয়ে থাকেন। ভাদ্র সংক্রান্তির সাত দিন আগে ভাদুর মূর্তি ঘরে নিয়ে আসা হয়। ভাদ্র সংক্রান্তির পূর্ব রাত্রকে ভাদুর জাগরণ পালিত হয়ে থাকে। এই রাত্রে রঙিন কাপড় বা কাগজের ঘর তৈরী করে এই মূর্তি স্থাপন করে তার সামনে মিষ্টান্ন সাজিয়ে রাখা হয়। এরপর রাত নয়টা বা দশটা থেকে ভাদু গীত গাওয়া হয়। কুমারী ও বিবাহিত মহিলারা গ্রামের প্রতিটি মঞ্চে গেলে তাদের মিষ্টান্ন দিয়ে আপ্যায়ন করা হয় ও তারা এই সব মঞ্চে ভাদু গীত পরিবেশন করে থাকেন। ভাদ্র সংক্রান্তির সকালে দলবদ্ধভাবে মহিলারা ভাদু মূর্তির বিসর্জন করা হয়।

পূর্বে ভাদুর কোন মূর্ত রূপ ছিল না। একটি পাত্রে ফুল রেখে বা গোবরের ওপর ধান ছড়িয়ে ভাদুর রূপ কল্পনা করে উৎসব পালন করা হত। পরবর্তীকালে বিভিন্ন রকমের মূর্তির প্রচলন হয়েছে। মূর্তিগুলি সাধারণতঃ হংস বা ময়ূর বাহিনী বা পদ্মের ওপর উপবিষ্টা মূর্তির গায়ের রঙ হলুদ, মাথায় মুকুট, হাতে পদ্মফুল, গলায় পদ্মের মালা ও হাতের তলায় আলপনা থাকে। কখনো মূর্তির কোলে কৃষ্ণ বা রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্তি থাকে।

পঞ্চকোট রাজপরিবারের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় রাজদরবারে হারমোনিয়াম, পাখোয়াজ, তবলা, সানাই সহযোগে মার্গধর্মী উচ্চ সাহিত্য গুণ নির্ভরএক ধরনের ভাদু গাওয়া হত হয়। এই পরিবারের ধ্রুবেশ্বরলাল সিংদেও, প্রকৃতীশ্বরলাল সিংদেও এবং রাজেন্দ্রনারায়ণ সিংদেও দরবারী ভাদু নামক এই ঘরানার সৃষ্টিকর্তা। কিন্তু অন্যান্য সকল ভাদু গীত লৌকিক সঙ্গীত হিসেবেই জনপ্রিয় হয়েছে। লিখিত সাহিত্য না হওয়ায় এই গান লোকমুখেই প্রচারিত হয়ে এসেছে।

এরকম একটি ভাদু গান হল-

হলুদ কনের ভাদু তুমি হলুদ কেন মাখনা,
শাশুড়ি ননদের ঘরে হলুদ মাখা সাজে না।
কলগাছে চাবি ছিল, হলুদ বল্যে মেখেছি
ও শাশুড়ি গাল দিওনা পাশা খেলতে বসেছি।

টুসু ও ঝুমুর গানের বিপরীতে ভাদু গানগুলিতে প্রেম এবং রাজনীতি সর্বতোভাবে বর্জিত। সাধারণতঃ গৃহনারীদের জীবনের কাহিনী এই গানগুলির মূল উপজীব্য। পৌরাণিক ও সামাজিক ভাদু গানগুলি বিভিন্ন পাঁচালির সুরে গীত হয়। সাধারণতঃ রামায়ণ, মহাভারত ও কৃষ্ণ-রাধার প্রেম পৌরাণিক গানগুলির এবং বারোমাস্যার কাহিনী সামাজিক গানগুলির বিষয় হয়ে থাকে। এছাড়া চার লাইনের ছড়া বা চুটকি জাতীয় ভাদু গানগুলিতে সমাজ জীবনের বিভিন্ন অসঙ্গতির চিত্র সরস ভঙ্গীতে ফুটিয়ে তোলা হয়।

অন্যান্য অঞ্চলের পালিত উৎসব থেকে বীরভূম জেলার ভাদু উৎসবের বৈশিষ্ট্য বহুলাংশে পৃথক। পয়লা ভাদ্র গ্রামের একজন ছেলেকে মেয়ে সাজিয়ে তার কোলে মাটির তৈরী ভাদু মূর্তি দিয়ে পুরুষদের একটি দল ভাদু গান গেয়ে ও নাচ করে বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরে অর্থ আদায় করেন। ভাদ্র সংক্রান্তিতে ভাদুর জাগরণ পালিত হয়। এই রাতে একটি জায়গাকে সজ্জিত করে ভাদু মূর্তি স্থাপন করা হয়। পরের দিন সকাল বেলায় মূল গায়েনকে অনুসরণে পুরুষদের দল ঢোল, হারমোনিয়াম, তবলা, কাঁসি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে ভাদু গীত গাইতে গাইতে মূর্তি বিসর্জন করেন। এই জেলায় মহিলারা এই গানে অংশগ্রহণ করেন না। বর্তমানে সামাজিক সচেতনা মূলক প্রচারের জন্য ভাদু গান গাওয়া হয়ে থাকে।

টুসু:

টুসু উৎসব বা মকর পরব একটি লোকউৎসব, যা বাংলা অগ্রহায়ণ মাসের শেষ দিনে শুরু হয় আর শেষ হয় পৌষ সংক্রান্তি বা মকর-সংক্রান্তির পুণ্যলগ্নে। টুসু এক লৌকিক দেবী যাকে কুমারী হিসেবে কল্পনা করা হয় বলে প্রধানত কুমারী মেয়েরা টুসুপূজার প্রধান ব্রতী ও উদ্যোগী হয়ে থাকে। এটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পুরুলিয়া জেলা,ঝাড়গ্রাম জেলা,বাঁকুড়া জেলা,পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা এবং ঝাড়খণ্ড রাজ্যের পূর্ব সিংভূম জেলা,পশ্চিম সিংভূম জেলা, সাঁওতাল পরগনা, ধানবাদ জেলা,সরাইকেল্লা খরসোয়া জেলা, রাঁচি ও হাজারিবাগ জেলার এবং ওড়িশা রাজ্যের ময়ূরভঞ্জ জেলা,সুন্দরগড় জেলা,কেন্দুঝর জেলা এর কৃষিভিত্তিক উৎসব।

টুসু অনুষ্ঠান উপলক্ষে মেয়েরা টুসু সঙ্গীত পরিবেশন করে, যা এ উৎসবের বিশেষ অঙ্গ ও মূল আকর্ষণ। টুসু গান আকারে ছোট হয় এবং গ্রাম্য নিরক্ষর নারীরা সেগুলি তাৎক্ষণিকভাবে মুখে মুখে রচনা করে। গানগুলি পল্লিবাসীর লোকায়ত সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসার এক অনন্য প্রকাশ। উৎসবান্তে প্রতিমা বিসর্জন খুবই বৈচিত্র্যময় ও বেদনাদায়ক হয়। এ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গ্রাম্য মেলাও বসে। টুসু দ্রাবিড় অস্ট্রিক ভাষাবর্গের কোল, মুন্ডা, ওরাওঁ, সাঁওতাল, ভূমিজ, ভুঁইয়া, কুর্মি, মাহাতো প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবী বলে সাধারণ জনমত প্রচলিত।

পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান ও হুগলি জেলার গ্রামাঞ্চলে টুসু পূজা প্রচলিত। বাংলার লোকসঙ্গীত ও সংস্কৃতিতে টুসু গান ও টুসু উৎসবের বিশেষ স্থান রয়েছে।

টুসুর নামকরণ সম্বন্ধে সর্বজনগ্রাহ্য কোন মত নেই। ডঃ বঙ্কিমচন্দ্র মাহাতোর মতে, তুষ থেকে টুসু শব্দটি এসেছে। টুসু শব্দটি তুষ থেকে এসেছে। তাতে কোন সন্দেহ নেই। ধানের তুষ যাদুক্রিয়ার যেমন অঙ্গ তেমনি মৃত ধানেরও প্রতীক। টুসুকে জলে বিসর্জন দেওয়ার অর্থ হল তাঁকে কবর দেওয়া। আদিম মানুষ মৃত্যু ও পুনর্জন্মকে পরস্পরের সম্পর্কযুক্ত দুটি ঘটনার অতিরিক্ত কিছু মনে করত না।

দীনেন্দ্রনাথ সরকারের মতে তিষ্যা বা পুষ্যা নক্ষত্র থেকে অথবা উষা থেকে টুসু শব্দটি এসেছে, আবার কখনো তিনি বলেছেন যে, মধ্যপ্রাচ্যের প্রজনের দেবতা টেষুব থেকে টুসু শব্দটি তৈরী হয়েছে।

টুসু উৎসব অগ্রহায়ণ সংক্রান্তি থেকে পৌষ সংক্রান্তি পর্যন্ত এক মাস ধরে পালিত হয়। ধানের ক্ষেত থেকে এক গোছা নতুন আমন ধান মাথায় করে এনে খামারে পিঁড়িতে রেখে দেওয়া হয়। অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তির সন্ধ্যাবেলায় গ্রামের কুমারী মেয়েরা একটি পাত্রে চালের গুঁড়ো লাগিয়ে তাতে তুষ রাখেন। তারপর তুষের ওপর ধান, কাড়ুলি বাছুরের গোবরের মন্ড, দূর্বা ঘাস, আল চাল, আকন্দ, বাসক ফুল, কাচ ফুল, গাঁদা ফুলের মালা প্রভৃতি রেখে পাত্রটির গায়ে হলুদ রঙের টিপ লাগিয়ে পাত্রটিকে পিড়ি বা কুলুঙ্গীর ওপর রেখে স্থাপন করা হয়। পাত্রের এই পুরো ব্যবস্থা প্রতিদিন সন্ধ্যার পরে টুসু দেবী হিসেবে পূজিতা হন। পৌষ মাসের প্রতি

সন্ধ্যাবেলায় কুমারী মেয়েরা দলবদ্ধ হয়ে টুসু দেবীর নিকট তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক অভিজ্ঞতা সুর করে নিবেদন করেন ও দেবীর উদ্দেশ্যে চিঁড়ে, গুড়, বাতাসা, মুড়ি, ছোলা ইত্যাদি ভোগ নিবেদন করেন।

টুসু উৎসব পালনের সময় পৌষ মাসের শেষ চারদিন চাঁউড়ি, বাঁউড়ি, মকর এবং আখান নামে পরিচিত। চাঁউড়ির দিনে গৃহস্থ বাড়ির মেয়েরা উঠোন গোবরমাটি দিয়ে নিকিয়ে পরিষ্কার করে চালের গুঁড়ো তৈরী করা হয়। বাঁউড়ির দিন অর্ধচন্দ্রাকৃতি, ত্রিকোণাকৃতি ও চতুষ্কোণাকৃতির পিঠে তৈরী করে তাতে চাঁছি, তিল, নারকেল বা মিষ্টি পুর দিয়ে ভর্তি করা হয়। স্থানীয় ভাবে এই পিঠে গড়গড়্যা পিঠে বা বাঁকা পিঠে বা উধি পিঠে ও পুর পিঠা নামে পরিচিত। বাঁউড়ির রাত দশটা থেকে টুসুর জাগরণ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। মেয়েরা জাগরণের ঘর পরিষ্কার করে ফুল, মালা ও আলো দিয়ে সাজায়। এই রাতে কিশোরী কুমারী মেয়েরা ছাড়াও গৃহবধূ ও বয়স্কা মহিলারাও টুসু গানে অংশগ্রহণ করেন। এই রাতে টুসু দেবীর ভোগ হিসেবে নানারকম মিষ্টান্ন, ছোলাভাজা, মটরভাজা, মুড়ি, জিলিপি ইত্যাদি নিবেদন করা হয়।

পৌষ সংক্রান্তি বা মকরের ভোরবেলায় মেয়েরা দলবদ্ধভাবে গান গাইতে গাইতে টুসু দেবীকে বাঁশ বা কাঠের তৈরী রঙিন কাগজে সজ্জিত চৌডল বা চতুর্দোলায় বসিয়ে নদী বা পুকুরে নিয়ে যান। সেখানে প্রত্যেক টুসু দল একে অপরের টুসুর প্রতি বক্রোক্তি করে গান গাইতে দেবী বিসর্জন করে থাকেন। টুসু বিসর্জনের পরে মেয়েরা নদী বা পুকুরে স্নান করে নতুন বস্ত্র পরেন। ছেলেরা খড়, কাঠ, পাটকাঠি দিয়ে ম্যাড়াঘর বানিয়ে তাতে আগুন লাগান\

টুসু সংগীত

টুসু উৎসবের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ টুসু সংগীত। এই সংগীতের মূল বিষয়বস্তু লৌকিক ও দেহগত প্রেম। এই গান গায়িকার কল্পনা, দুঃখ, আনন্দ ও সামাজিক অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করে। কুমারী মেয়ে ও বিবাহিত নারীরা তাদের সাংসারিক সুখ দুঃখকে এই সঙ্গীতের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলেন। গানের মাধ্যমে মেয়েলি কলহ, ঈর্ষা, অভীপ্সা, দ্বেষ, ঘৃণা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করা হয়। এছাড়া সমকালীন রাজনীতির কথা ব্যাপক ভাবে এই গানে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এই সমস্ত গানে পণপ্রথা, সাক্ষরতা সম্বন্ধে সচেতনতা, বধূ নির্যাতনের বিরুদ্ধতা প্রভৃতি সামাজিক দায়িত্বের কথাও বলা হয়।

টুসু গীতকে ভনিতাযুক্ত ও ভনিতাবিহীন এই দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। ভণিতাবিহীন টুসু গীতকে মূল টুসু পদ এবং টুসু পদের রঙ এই দুইটি অংশে ভাগ করা যায়। টুসু পদের রঙ অংশটি কখনো মূল পদের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে রচনা করা হয়, কখনো বা স্বতন্ত্র ভাবে রচিত হয়। ভণিতাবিহীন টুসু পদ মূলতঃ চার চরণে বাঁধা থাকে, যার মধ্যে রঙের জন্য মাত্র দুইটি চরণ নির্দিষ্ট থাকে।

বিখ্যাত শিল্পী হলেন, শিলিগুড়ির বিপ্লব দে এবং ওঁর ছাত্রীসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রীতি, রিয়া, সঙ্গীতা প্রমুখ।

ঝাড়খণ্ড রাজ্য ও পুরুলিয়া জেলার অধিকাংশ স্থানে পুরাতন প্রথা অনুযায়ী টুসু উৎসবে কোন মূর্তির প্রচলন নেই, কিন্তু পুরুলিয়া জেলার বান্দোয়ান থানা এবং বাঁকুড়া জেলার খাতড়া থানার পোরকুলের টুসু মেলায় টুসু মূর্তির প্রচলন রয়েছে। বিভিন্ন ভঙ্গীতে অশ্ব বাহিনী বা ময়ূর বাহিনী মূর্তিগুলির গায়ের রঙ হলুদ বর্ণের ও শাড়ি নীল রঙের হয়ে থাকে। মূর্তির হাতে কখনো শঙ্খ, কখনো পদ্ম, কখনো পাতা বা কখনো বরাভয় মুদ্রা দেখা যায়।

ঝুমুর

ঝুমুর গান ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা; ঝাড়খণ্ড রাজ্যের সাঁওতাল পরগণা, সিংভূম, রাঁচি, হাজারিবাগ, পালামৌ, গিরিডি, ধানবাদ ও বোকারো জেলা এবং উড়িষ্যা রাজ্যের ময়ূরভঞ্জ, সুন্দরগড়, কেঁওনঝাড় ও সম্বলপুর জেলা ইত্যাদি এক বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রচলিত।

ঝুমুর গানের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে খুব একটা তথ্য পাওয়া যায় না, তবে সাহিত্যরত্ন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মতে এই গান প্রায় হাজার বছর ধরে চলে আসছে। তার মতে ঝুমুরের সঙ্গে কীর্তন মিশে পরবর্তীকালে যাত্রার উদ্ভব ঘটেছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় তার *পশ্চিম সীমান্তবঙ্গের লোকগীতি* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে মধ্যযুগে ঝুমুর শব্দের প্রচলন ছিল। মধ্যযুগের পদকল্পতরু গ্রন্থের একটি পদে লেখা রয়েছে, 'যুবতী যুথ শত গায়ত ঝুমরী'। বিদ্যাপতি তার পদাবলীতে লিখেছেন, 'গওই সহি লোরি ঝুমরি সঅন - আরাধনে যাঞা'। গোবিন্দদাসের পদেও পাওয়া যায়, 'মদনমোহন হরি মাতল মনসিজ যুবতী যুথ গাওত ঝুমরী

পূর্বে ঝুমুর গানগুলি মুখে মুখে রচিত হত, দাঁড় নাচের গান হিসেবে ব্যবহৃত হত এবং কোন ভণিতা বা পদকর্তার উল্লেখ থাকতো না। কিন্তু চৈতন্য পরবর্তী যুগে ভণিতাযুক্ত ঝুমুরের সূচনা হয় এবং ধীরে ধীরে নৃত্যে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ হলে পুরুষদের মহিলা সেজে দাঁড় নাচে অংশগ্রহণের প্রচলন শুরু হয়। এই সময় ঝুমুর গানের ওপর ভিত্তি করে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ও কীর্তনের সুরে নাচনী নাচ ও দরবারী ঝুমুরের প্রচলন হয়। এই সময়ের ঝুমুরে পুরাণকাহিনি, সহজিয়া বাউলতত্ত্ব এবং রাধা কৃষ্ণের প্রেম বিষয়ক

বৈষ্ণব ভক্তিতত্ত্ব স্থান পায়। ভারতের স্বাধীনতা পরবর্তী ঝুমুর গান বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার ওপর রচিত হওয়া শুরু হয়।

নৃত্য, গীত ও বাদ্য সহযোগে ঝুমুর গাওয়া হলেও এতে গীতের প্রাধান্য থাকে। গানের সুর উচ্চগ্রাম থেক নিম্নগ্রামে অবরোহণ করা হয়, যা ঝুমুরের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। তালকে অগ্রাহ্য করে মাত্রা অনুসরণ করে সুর দেওয়া হয়। সম থেকে শুরু না করে ফাঁক থেকে গান শুরু করা হয়। সাধারণতঃ সমঝদারের আসর ও নাচের আসর এই দুই জায়গায় ঝুমুর গাওয়া হয়। সমঝদারের আসরে বৈঠকী, ছুট ও পালাবদ্ধ ঝুমুর গাওয়া হয়। বৈঠকী ঝুমুরে গায়ক একজন, কোন নাচ থাকে না এবং বাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় হারমোনিয়াম ও পাখোয়াজ। ছুট ঝুমুর নাচ, গান, বাজনা সহযোগে একটি পূর্ণাঙ্গ ঝুমুর। পালা ঝুমুর একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে গাওয়া হয়। নাচের আসরে নাচ, গান, বাজনা সহযোগে একটি পূর্ণাঙ্গ ঝুমুর গাওয়া হয়। এই আসরে রসক্যা বা রসিক সহযোগে নাচনী নাচ হয়ে থাকে। ঝুমুরকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু সুর ও তালের প্রচলন হয়েছিল, যার মধ্যে অধিকাংশের অস্তিত্ব বর্তমানে নেই। তবে ডহরওয়া, পতরতুলা, বেঁগাড়ি, পাটিয়ামেধা, রিঁঝামাঠা, ঝুমরা, ঝুমটা, একডাঁড়িয়া, গোলোয়ারি, নাগপুরিয়া, তামাড়িয়া, শিখারিয়া, পাঁচপরগণিয়া, মুদিআরি প্রভৃতি সুরের অস্তিত্ব বর্তমানে রয়েছে।

ঝুমুরকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু সুর ও তালের প্রচলন হয়েছিল, যার মধ্যে অধিকাংশের অস্তিত্ব বর্তমানে নেই। তবে ডহরওয়া, পতরতুলা, বেঁগাড়ি, পাটিয়ামেধা, রিঁঝামাঠা, ঝুমরা, ঝুমটা, একডাঁড়িয়া, গোলোয়ারি, নাগপুরিয়া, তামাড়িয়া, শিখারিয়া, পাঁচপরগণিয়া, মুদিআরি প্রভৃতি সুরের অস্তিত্ব বর্তমানে রয়েছে।

ঝুমুর গানের প্রকারভেদ

বিষয়বস্তু ও রচনার বৈশিষ্ট্য অনুসারে ঝুমুর গানকে নানা ভাগে বিভক্ত করা হয়।

মার্জিত ভাষায় রচিত

বিষয়বস্তু: দেহতত্ত্ব, কৃষ্ণলীলা, পুরাণ ইত্যাদি; পয়ার বা ত্রিপদী ছন্দে রচিত; চারটি কলি; ধুঁয়া, রঙ ও ভণিতাযুক্ত

উদাহরণ: দরবারী বা বৈঠকী ঝুমুর

লৌকিক

কলির সংখ্যা তিন বা তিনের কম; সুরবৈচিত্র্য নেই; আকস্মিক আবেগে রচিত

উদাহরণ: টাঁড়, উধোয়া, ডমকচ, ডহরিয়া, দাঁড় প্রভৃতি

সুর, তাল, নৃত্য অনুসরণ করে ঝুমুর

উদাহরণ: বাউলছোঁয়া, ঢুয়া, কীর্তনছোঁয়া, দাঁড়শালিয়া, খেমটি, আড়হাইয়া প্রভৃতি

ঋতু অনুসারে

উদাহরণ: ভাদরিয়া, চৈতারি, আষাঢ়ি, বারমেসা প্রভৃতি

অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যানুসারে

উদাহরণ: বরাবাজারিয়া, বাগমুড়্যা, ঝালদোয়া, সিলিয়াড়ি, গোলায়ারি, তামাড়িয়া প্রভৃতি

জাতি অনুসারে

উদাহরণ: কুড়মালি, মুণ্ডারি প্রভৃতি

Unit-8: Manasamangal, Bolan and Leto Jhapan, Gambhira, Banbibi pala

মনসামঙ্গল:

মনসামঙ্গল মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের মঙ্গলকাব্য ধারার অন্যতম প্রধান কাব্য। এই ধারার অপর দুই প্রধান কাব্য *চণ্ডীমঙ্গল* ও *ধর্মমঙ্গল* কাব্যের তুলনায় *মনসামঙ্গল* প্রাচীনতর। এই কাব্যের আদি কবি কানাহরি দত্ত সম্ভবত ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ বা চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের কবি।

মনসামঙ্গল কাব্যের প্রধান দেবতা সর্পদেবী মনসা। মনসা মূলগতভাবে অনার্য দেবী। ভারতের আদিবাসী ও অন্ত্যজ সমাজে সর্পদেবী মনসার পূজা সুপ্রচলিত। বিশেষজ্ঞদের অনুমান, খ্রিষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীতে বাংলায় মনসার পূজা প্রবর্তিত হয়। *পদ্মপুরাণ, দেবীভাগবত পুরাণ* ও *ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ*-এর মতো কয়েকটি আধুনিক উপপুরাণ গ্রন্থে দেবী মনসার উল্লেখ

পাওয়া যায়; এই গ্রন্থগুলি অবশ্য খ্রিষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বে রচিত হয়নি। লৌকিক দেবী হলেও কালক্রমে মনসা ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক হিন্দুসমাজেও প্রতিপত্তি অর্জন করে; এমনকি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক কালে শিক্ষিত বাঙালি সমাজেও মনসার পূজা প্রচলিত হয়।

মনসামঙ্গল একটি আখ্যানকাব্য। এই কাব্যের প্রধান আখ্যানটিও আবর্তিত হয়েছে মর্ত্যলোকে মনসার নিজ পূজা প্রচারের প্রয়াসকে কেন্দ্র করে। কাব্যের মূল উপজীব্য চাঁদ সদাগরের উপর দেবী মনসার অত্যাচার, চাঁদের পুত্র লখিন্দরের সর্পাঘাতে মৃত্যু ও পুত্রবধূ বেহুলার আত্মত্যাগের উপাখ্যান। এই কাব্যে সেযুগের হিন্দু বাঙালি সমাজের সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি সম্পর্কে নানা অনুপুঙ্খ বর্ণনা পাওয়া যায়। চাঁদ সদাগর শুধুমাত্র এই কাব্যেরই নয়, বরং সমগ্র বাংলা সাহিত্যের অন্যতম বলিষ্ঠ চরিত্র; বেহুলা-লখিন্দরের করুণ উপাখ্যানটিও তার মানবিক আবেদনের কারণে আজও বাঙালি সমাজে জনপ্রিয়।
মনসামঙ্গল কাব্যের আদি কবি হরিদত্ত। বিজয়গুপ্ত এই কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। অন্যান্য কবিদের মধ্যে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, বিপ্রদাস পিপলাই প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আধুনিক কালে *মনসামঙ্গল* অবলম্বনে বিশিষ্ট নাট্যকার শম্ভু মিত্র *চাঁদ বণিকের পালা* নামে একটি নাটক রচনা করেন।

বাংলায় প্রচলিত নাটকের মধ্যে অন্যতম হল ঐতিহাসিক নাটক, পৌরাণিক নাটক, সামাজিক নাটক প্রমুখ। বাংলার এই মঙ্গলকাব্যগুলিকে কেন্দ্র করে যে নাটকের প্রচার হয়েছে তাকে আমরা পৌরাণিক নাটক বলে অভিহিত করতে পারি। পৌরাণিক বাংলা নাটকের অন্যতম একটি শাখা। উল্লেখ্য বাংলার নাট্যকারদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, শম্ভু মিত্র পৌরাণিক নাটক নিয়ে কাজ করেছেন।

পৌরাণিক নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল দেবী দেবতার সাথে মানুষের দ্বন্দ্ব, দেবী দেবতার পুজো প্রচলন এবং লোক সমাজে দেবী দেবতার প্রভাব। মনসামঙ্গলকে কেন্দ্র করে একাধিক আধুনিক নাটক রচিত এবং অনুষ্ঠিত হয়েছে যথা -
১. অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় - সওদাগরের নৌকা (১৯৭৬)
২. শম্ভু মিত্র - চাঁদ বণিকের পালা (১৯৭৮)
৩. শেখর দেবরায় - মনসা কথা (২০০২)

উল্লেখ্য, এই পৌরাণিক নাটকগুলি কেবলমাত্র মনসামঙ্গলের কাহিনী উপস্থাপিত করেছে এমন নয় বরং তৎকালীন সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, স্বাধীনতার দাবিও তুলে ধরতে চেয়েছে নাটকের মাধ্যমে। মন্মথ রায়ের নির্দেশনায় ১৯২৭ সালে প্রথম অনুষ্ঠিত হয় 'চাঁদ সদাগর' নাটকটি। মন্মথ রায়ের নাটকের প্রথমাংশেই চাঁদ সদাগর এবং দেবী মনসার দ্বন্দ্বের দৃশ্য তুলে ধরেছেন। পুত্রদের মৃত্যু এবং বেহুলার একনিষ্টতায় ও দেবী মনসার কৃপায় তাঁর পুত্রদের জীবন ফিরে পাওয়ার পর যখন চাঁদ সদাগর বাম হাতে দেবীর পুজো করছেন, তখন তার অন্তর্দ্বন্দ্ব নাট্যকার খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। মঙ্গলকাব্যের উপর ভিত্তি করে নাটক রচিত হলেও মন্মথ রায় কিন্তু তার নাটকে চাঁদ সদাগর এবং দেবী মনসাকে দুই প্রতিপক্ষ শক্তি হিসাবে প্রতীকী রূপে তুলে ধরতে চেয়েছেন।

মন্মথ রায়ের পাশাপাশি শম্ভু মিত্র, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ও তৎকালীন সমাজের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন মনসামঙ্গল কাব্যের নাট্যাভিনয় এর মাধ্যমে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের সামাজিক চিত্র ফুটে উঠেছে তাঁদের নাটকে।

বোলান গান:

বোলান গান বা *বোলান* হল প্রধানত পশ্চিমবঙ্গের লোকগান তথা বাংলার এক প্রাচীন লোকগান। বোলান গান বাংলার লোকস্কৃতির একট অনন্য অবদান। এক সময় বীরভূম, নদিয়া, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদের বিস্তীর্ণ এলাকায় বোলান গান প্রচলিত ছিল। বিশিষ্ট লোক সংস্কৃতি গবেষক *ওয়াকিল আহমেদ* তার 'বাংলার লোকস্কৃতি' বইতে লিখেছেন, বোলান গান বাঁধা হয় পালার আকারে। এতে লঘু, গুরু উভয় বিষয়েরই স্থান আছে। গুরু বিষয় খণ্ডগীতি, আর লঘু বিষয় রঙপাঁচালি নামে পরিচিত। এখানে একটি দল যখন গায়, অন্য দল ধুয়া দেয়। এ ভাবেই এগিয়ে চলে বোলান।বোলান গানের জনক : স্বর্গীয় শ্রী প্রাণ বল্লভ দে পণ্ডিত সাটুই নিবাসী ।তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার বেশির ভাগ লোকোগান, যেমন- ভাদু, আলকাপ প্রভৃতি লোকশিল্পের মতোই বোলানের ঐতিহ্যও ফিকে হয়ে এসেছে। 'বোলান' শব্দের অর্থ সম্ভাষণ বা প্রবচন। মতান্তরে 'বুলা' বা ভ্রমণ থেকেও বোলান গানের উৎপত্তি হতে পারে বলে মনে করেন একদল লোক গবেষক।

বাংলায় তুর্কি আক্রমণের পর থেকে শিবের গাজন উপলক্ষে বোলান গান গাওয়া শুরু হয়। বোলান গানের মূলত ৪টি প্রকার— দাঁড় বোলান, পালা বোলান, সখী বোলান ও শ্মশান বোলান।বোলান গান একটি দল হিসাবে গাওয়া হয়। এই গান ঢোল এর বাজনার তালে গাওয়া হয়। ঢোল বাদকরা ঢোল বাজায় আর দলপতি গান করে। অনেক সময় এই গানের সঙ্গে নৃত্য শিল্পী থাকে যারা গানের তালে তালে নৃত্য করে। দলপতির সঙ্গে সহযোগিরাও গান করে। সহযোগিদের গান গাওয়াকে বলা হয় ধৌয়া তোলা। বোলানগান সামাজিন ও পৌরানিক বা দেবদেবীদের নিয়ে পালা আকারে উপস্থাপন করা হয়। পালা বাদার জন্য একজন থাকেন প্রতিটি দলে। দুর্গা ও শিবের বোলান পালা বেশ জনপ্রীয়। গাজনের অনুষ্ঠানে বোলান গান হিসাবে বোলান গান গাওয়া হয়।

বোলান গানের দল গঠিত হয় গায়ক-বাদকদের সমন্বয়ে। একজন ওস্তাদ দলের নেতৃত্ব দেয়। অল্প বয়সের কিশোর নটিবেশে নর্তকী ও গায়িকার ভূমিকা পালন করে। এদিক থেকে আলকাপ গানের সঙ্গে এর মিল রয়েছে। তফাৎ এই যে, আলকাপ গান নির্ধারিত আসরে গাওয়া হয়, আর বোলান দলের সদস্যরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে গান পরিবেশন করে।
বোলান গান বাঁধা হয় পালার আকারে। এর মুখ্য বিষয় পৌরাণিক কাহিনী। তবে সামাজিক বিষয় ও সমসাময়িক ঘটনা নিয়েও গান রচনা করা হয়। এতে লঘু-গুরু উভয় বিষয়েরই স্থান আছে। গুরু বিষয় খন্ডগীতি, আর লঘু বিষয় রঙপাঁচালি নামে পরিচিত। রঙপাঁচালিতে কৌতুক ও হাল্কা রসের বিষয় থাকে, কিন্তু তা কোনোক্রমেই ভাঁড়ামি বা অশ্লীলতার পর্যায়ে পৌঁছায় না।

বন্দনাগীতির মাধ্যমে বোলান গান শুরু হয় এবং পরে পাঁচালির ঢঙে মূল পালা গীত হয়। গানের পর সংলাপ ও উক্তি-প্রত্যুক্তির মাধ্যমে কিছু তত্ত্বকথা ব্যক্ত করা হয় এবং শেষে থাকে লঘু রসের রঙপাঁচালি। এ অংশে নাচ-গানেরও আয়োজন করা হয় দর্শকদের আনন্দ দেওয়ার জন্য।
বোলান গানের শিল্পীরা হয় অপেশাদার। অবকাশ সময়ে গ্রামের উৎসাহী যুবকরা দল গঠন করে এবং বিশিষ্ট কোনো ব্যক্তি গান বেঁধে দেন। যন্ত্রীর অভাব হলে সে ক্ষেত্রে ভাড়া করে আনা হয়। সবটাই অস্থায়ী। যুগের পরিবর্তন এবং পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বোলান গান ক্রমশ লোপ পেয়ে যাচ্ছে

লেটো গান:

লেটো গান পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানে প্রচলিত এক প্রকার লোকসঙ্গীত। এটি যাত্রাগানের প্রকারভেদ। যাত্রাগানের মতোই পালার আকারে রচিত এ গান নৃত্য ও অভিনয়সহ পরিবেশন করা হয়; সঙ্গে থাকে বাদকদল।
লেটো গান শুরু হয় বন্দনা দিয়ে। সখি, সঙদার, পাঠক বিভিন্ন নামে নট-নটীরা গান ও নাচ পরিবেশন করে। কিশোর বালকরা মেয়েদের পোশাক পরে নটী সাজে। এর বিষয়বস্তু সামাজিক রঙ্গরস ও আটপৌরে গ্রামীণ জীবন; পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বিষয় নিয়েও পালা রচিত হয়। কাজী নজরুল ইসলাম শৈশবকালে লেটোদলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর রচিত রাজপুত্রের সঙ, চাষার সঙ, আকবর বাদশা প্রভৃতি লেটো গানের সন্ধান পাওয়া গেছে।
লেটো গানে অনেক সময় দুটি দলের মধ্যে প্রতিযোগিতাও হয়; দলের প্রধানকে বলা হয় ‘গোদা কবি’। সাধারণত শীতের ফসল ওঠার পরে কৃষকের অবসর সময়ে লেটো গানের আসর বসে। লোকমনোরঞ্জনই এর প্রধান উদ্দেশ্য। প্রধানত মুসলমান সমাজে লেটো গানের সমাদর বেশি; তবে সব ধরনের শ্রোতাই এ গান উপভোগ করে।

চর্যাগীতির পরে বাংলা সাহিত্যে ও সঙ্গীতে একটি বড় ধরনের ধাক্কা বখতিয়ার খিলজির বাংলা অভিযানের মাধ্যমে। ১২০৪-০৫ খ্রীষ্টাব্দে গৌড় দখলের মধ্য দিয়ে শুরু হয় বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা। ইলিয়াস শাহ বাংলা স্বাধীন সুলতান হিসাবে রাজ্যপাট শুরু করেন ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দ থেকে। এইসময় এসে অস্থিরতা কিছুটা কমে। তাঁর শাসনকালে তার রাজত্বের অঞ্চলসীমানা বাড়িয়ে অধিকার করেন। তাঁরই সময় বাঙালি কবি চন্ডীদাস জীবিত (ডঃ মহম্মদ শহিদুল্লাহর মতে)। বাংলা সাহিত্য চর্চা আবার শুরু হয়।
১৩৫০ থেকে ১৪৫০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে আমরা বিদ্যাপতির পদাবলী, বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বিকশিত হয়ে গেছে। এর সাথে আদি ঝুমুর, বাউল তো ছিলো বলেই ধরে নেওয়া হয়। এরপরেই মঙ্গকাব্যের জনমানষকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এরপর কৃত্তিবাস ওঝা (১৩৯৯-১৪৩৩) বাংলা সাহিত্যের নবতর ধারার সূচনা করেন বাংলায় রামায়ন রচনার মধ্য দিয়ে। ১৪৫০ থেকে ১৭০০ সালের মধ্যে রাঢ় বাংলাইয় ঝুমুর, পূর্ববঙ্গের ভাটিয়ালি, উত্তরবঙ্গের ভাওইয়া গানের সুত্রপাত হয়েছিল। গুরুর মাধ্যমে বাউল গান, মুসলমান সম্প্রদায়ের জারি গান এসময়েরই ফসল।
এরপর বর্গীর আক্রমণ এবং দ্বিতীয় আঘাত সিরাজদৌল্লার পতন, সব মিলিয়ে বাংলার সাহিত্য ও সংগীত জগতে বিপর্যয়। ১৭০০ থেকে ১৮০০ সালের মধ্যে বাংলা গানে যুক্ত হয়েছিল ‘কবিগান’।
১৭৫০ থেকে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দের ভিতরে যখন আখড়াই গান অশ্লীল হিসেবে সুধীজনদের কাছে অপাংক্তেয় হয়ে উঠেছিল, সে সময় নিধুবাবু আখড়াই গানের অশালীন তকমা সরিয়ে ফেলে, নতুন ধরনের আখড়াই গানের সূচনা করলেন। ১৮০৪

খ্রিষ্টাব্দে দিকে তিনি এই নবতর আখড়াই গানের ধারা কলকাতায় প্রচলন করেন। ১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দে বড়বাজারের রামসেবক মল্লিকের বাড়িতে সর্বসাধারণের সামনে প্রথম হাফ-আখড়াই গানের আসর বসেছিল। নিধুবাবু প্রথম দিকে হাফ আখড়াই গানের প্রতি বিরক্ত হয়েছিলেন, তবু শিষ্যের এই প্রচেষ্টাকে আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন। এই গানে তিনি কবিগানের মতো উত্তর-প্রত্যুত্তর ও সখীসংবাদ যুক্ত করেছিলেন। টপ্পা অঙ্গের আখড়াই গানে ছিল রাগের নানারূপ আলঙ্করিক প্রয়োগ। হাফ আখড়াই গানের শিল্পীরা সেখান থেকে সরে এসে সরল সুরের গান বাঁধতেন। এই গানে অন্তরা থাকত না। হাফ-আখড়াই গানের পদ রচিত হতো চিতেন, পরচিতেন, ফুকা, ডবল ফুকা, মেলতা, মহড়া, খাদ, দ্বিতীয় ফুকা, দ্বিতীয় ডবল ফুকা, দ্বিতীয় মেলতা ইত্যাদি এই ধারাক্রমে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে হাফ আখড়াই গান জনপ্রিয়তা হারাতে থাকে এবং এক সময় বিলুপ্ত হয়ে যায়।

নিধুবাবু (১৭৪১-১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দ) এবং তাঁর শিষ্যদের দ্বারা টপ্পা যখন কলকাতার নগরকেন্দ্রিক সঙ্গীতজগত নিমগ্ন, সে সময়ে বাংলাগানের ভিন্ন রসের সঞ্চার করলেন শ্রীধর কথকের কথক গান। সুরে সুরে গল্প বলার রীতি প্রচলিত হয়েছিল মধ্যযুগের পাঁচালির সূত্রে। কথক তারই একটি প্রকরণ মাত্র। এই ধারাটি শ্রীধর কথকের (১৮১৬-? খ্রিষ্টাব্দ) আগে থেকেই অল্পবিস্তর ছিল। শ্রীধরের পিতামহ লালচাঁদ বিদ্যাভূষণও কথক ছিলেন। কিন্তু শ্রীধর কথক এই গানকে উচ্চতর সঙ্গীতশৈলীতে পরিণত করেছিলেন। উল্লেখ্য, কথক গানের মতই তিনি টপ্পাতেও সমান কৃতিত্ব দেখান।
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে আখড়াই, হাফ আখড়াই, কবিগান সংমিশ্রণে জন্ম নিয়েছিল নব্যধারার পাঁচালি। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে দাশরথি রায় (১৮০৬-১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দ) পাঁচালির এই মিশ্ররূপ দান করেন। নাগরিক সাহিত্যের পাশাপাশি বঙ্গদেশে লোকসাহিত্য ও সঙ্গীতে ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল। বঙ্গদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতই রাঢ় অঞ্চলেও এর প্রভাব পড়েছিল।

সেকালের রাঢ় অঞ্চলের শ্রমজীবী প্রান্তিক গোষ্ঠীর কাছে এইসব গান ও লোকনৃত্য চিত্তবিনোদনের অন্যতম মাধ্যম ছিল। আর রাঢ় বাংলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর একটা বড় অংশই ইসলাম ধর্মের। অচিরেই ইসলামী গানের জন্ম হল। এবং মনসামঙ্গলের আদলে তৈরি হল সত্যপীরের গান।
পাঁচালির অনুকরণে হল সত্যপীরের পাঁচালী, হোসেনের পাঁচালী। কৃষ্ণযাত্রা হল ইমামযাত্রা। সনাতন ধর্মীদের পটুয়া গানের চিত্রাংশে থাকতো পৌরাণিক কাহিনী, কিন্তু মুসলমান পটুয়ারা তাদের গান ব্যাবহার করে, সত্যপীর ও গাজীপীরের চিত্রকর্ম রাখতো।
কোনো কোনো গবেষকের মতে-লেটোগানের উদ্ভব হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। এই গানের উদ্ভাবক ছিলেন- মুর্শিদাবাদ জেলার একঘরিয়া গ্রামের মুন্সি আহমদ হোসেন। কিন্তু তাঁর গানের কোন নমুনা পাওয়া যায় নি। লেটোগানের উদ্ভবের সময়টা মেনে নিলেও- উল্লেখযোগ্য প্রমাণাদি ছাড়া উদ্ভাবকের নাম নিয়ে সংশয় থেকেই যায়। বাংলা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে অন্যান্য সকল উপকরণের মতই বাংলা লোকসঙ্গীতও গড়ে উঠেছে কালানুক্রমিক ক্রমবিকাশের ধারায়। তাই লেটোগানের উদ্ভবের ক্ষেত্রে আমাদেরকে অষ্টাদশ শতাব্দের পূর্বের বাংলা গানের ধারাকে অনুসরণ করতে হবে। বিশেষ করে চর্যাপদ-উত্তর বাংলা গানের অন্ধকার যুগ এবং বাংলা গানে মুসলমানদের অবদান নিয়ে ভাবতেই হবে।

কাজী নজরুল ইসলামের লেটো গান-বিষয়ক গবেষণার সূত্রে যে কয়েকজন লেটোগান রচয়িতা বা গোদাকবির নাম পাওয়া যায়, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আকাই মিঞা, অখু শেখ, আব্দুল খাঁ, আমীর খাঁ, আরশেদ আলি, ইজ্জত আলি, ঋষি বাউরী, এলাহী বকশ, কাজী আবু তাহের, কাজী আব্দুর রহমান, কাজী বজলে করীম, কাজী ফজলে আহমদ, খলিল আহমদ মণ্ডল, গোলাম রহমান, গোলাম রহমান মাজী, জমিরুদ্দিন শেখ, জুম্মন খাঁ, ধরু হাজরা, নবাব মণ্ডল, নাসের সাহেব, পেসকার আলী. ফকির আহমদ মণ্ডল, ফকির শেখ, বাবুল্লাহ, বারু বাউরী, মজিদ খাঁ. মলিন্দ বাউরী, মহাম্মদ আমিন, মোসলেম খাঁ, রুস্তম শেখ, রহিমুদ্দিন সাখা, শেখ খোদানে ওয়াজ, শুকু শেখ, সাম শেখ, হবিব মণ্ডল. প্রমুখ।
এঁদের ভিতরে লেটোগানে সমকালীন গোদাকবিদের ভিতরে নিজ প্রতিভার গুণে দীর্ঘদিন খ্যাতির শীর্ষস্থান ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। বজলে করীম ছিলেন এই অঞ্চলের স্বনামধন্য এবং অপরাজেয় গোদাকবি। এখন পর্যন্ত তাঁর যে কয়েকটি লেটো লেটোপালা বা চাপান সং-এর সন্ধান পাওয়া গেছে, তার সূত্র তাঁর অসামান্য কবি-প্রতিভা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। তাঁর রচনায় পাওয়া যায়-সমকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপট ও আর্থ-সামাজিক দ্বন্দ্বের কথা,কাব্য রচনার অসাধারণ ক্ষমতা, অতুলনীয় রসবোধ এবং প্রতিপক্ষ গোদাকবিকে ঘায়েল করার জন্য তীব্র বিদ্রূপ এবং বাক্যাঘাত। তিনি তাঁর দল নিয়ে নানা স্থানে চাপান-উতোর সং পালায় যোগদান করেছেন। তিনি বিশেষভাবে জানত ইসলাম ধর্মের শরিয়তি, মারফতি ও সুফি দর্শন, বাউল দর্শন, হিন্দু পৌরাণিক কাহিনি, বৈষ্ণব ও শাক্ত দর্শন। এছাড়া ছিল বিষয়ভিত্তিক অতুলনীয় বিশ্লেষণী ক্ষমতা।
লেটোপালা কবিদের লড়াই-য়ের ক্ষেত্রকে উজ্জীবিত করেছিল। এই সময় আসরে দুজন কবিয়াল আসরে নামতেন নিজ নিজ দলবল নিয়ে। এঁরা একটি কাহিনি সংক্ষেপে গানে গানে উপস্থাপন করতেন। এরপর তিনি প্রতিপক্ষের কবিয়ালের প্রতি একটি প্রশ্ন রেখে আসর থেকে অবসর নিতেন। এরপর আসরে অবতীর্ণ হতেন প্রতিপক্ষ কবিয়াল। তিনি প্রথম কবিয়ালের রেখে যাওয়া প্রশ্নের উত্তর দিতেন এবং আসর ত্যাগ করার সময় প্রতিপক্ষের প্রতি একটি প্রশ্ন রেখে যেতেন।

লেটোর লড়াইয়ে পালার এই অংশকে বলা হতো- চাপান সং। প্রতিপক্ষ দলের প্রশ্নের উত্তর প্রদানকারী অংশের নাম ছিল উতোর। চাপান ও উতোর পরিবেশনার মধ্য দিয়ে লেটোর লড়াই চলতো। লেটোগানের লড়াইয়ে জয়লাভ করে কোনো কোনো গোদাকবি বিপুলভাবে সমাদৃত হতেন। লড়াইয়ে জেতা কবিয়ালের খ্যাতির সূত্রের অন্যান্য গ্রামগুলো থেকে আমন্ত্রণ পেতেন। এই সূত্রে অনেক সময় গোদাকবি ধনবান এবং অভিজাত শ্রেণির আমন্ত্রণ পেতেন। এসব আমন্ত্রণের সূত্রে পাওয়া সম্মানীই ছিল, দলের আয়ের উৎস। এছাড়া বিজয়ী দলের গোদাকবিকে সম্মানিত করা হতো- পদক ও নগদ অর্থ দিয়ে।

সাধারণত, স্বনামধন্য কোনো লেটো দলের সাথে যুক্ত থেকে কোনো প্রতিভাবান কবি, গান পরিবেশন এবং গান রচনা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যখন সুনাম অর্জন করতেন, তখন নিজের মতো করে পালা পরিবেশনের আকাঙ্ক্ষায় নিজের নামে দল তৈরি করতেন। অনেক সময় দলের গোদাকবি বার্ধ্যক্যজনিত কারণে বা মৃত্যুতে দলের গোদাকবির স্থান দখল করতেন নিতেন দলের দ্বিতীয় কবি। অন্য দলের খ্যাতি বা নিজ দলের প্রতি বিতৃষ্ণা থেকে অনেকে দলে যোগদান করতেন 'আসামী' হয়ে।

লেটো দলের বিন্যাস

পালাধর্মী গান হিসেবে লেটো দল তৈরি হতো একাধিক কণ্ঠশিল্পী ও বাজনদার নিয়ে। এই দলটি পরিচালনা করতেন একজন প্রধান কবিয়াল। যিনি গোদা কবি নামে পরিচিত ছিলেন। দলে অংশগ্রহণকারীরা বিষয় অনুসারে নানা নামে অভিহিত হয়ে থাকে। যেমন-

- ডাকসুরা: চাপান সং দিয়ে লেটোপালা শুরু হয়। এই পালার সূত্রপাত হয়ে থাকে একজন উপস্থাপকের গানের মাধ্যমে। যিনি এই সূচনা সঙ্গীত পরিবেশন করেন, লেটোপালায় তাঁর নাম 'ডাকসুরা'।
- গোদা কবি: দলের পরিচালক এবং প্রধান কবির নাম 'গোদা কবি'। কবিগানের মতো লেটো গানে দুটি প্রতিযোগী দল আসরে নামে। উভয় দলের প্রধান কবি ও পরিচালক গোদাকবি নামে অভিহিত হন। মূলত 'গোদা কবি' দলের প্রাণশক্তি। অনেক সময় গোদা কবির নামানুসারে দলের নামকরণ করা হয়। তিনি গোদা কবি নামেই আসরে অবতীর্ণ হন।
- বাই, ছোকরা বা রাঢ়: সাধারণত দলের সুদর্শন কিশোর মেয়েদের পোশাক পড়ে নারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এদের ভিতরে রাজকন্যা বা রাজরানির চরিত্রে যারা অভিনয় করে, তাদের বলা হয় 'রানি'। অন্য মেয়ে চরিত্রের অভিনয়কারী বালকদের বলা হয় বাই, ছোকরা বা রাঢ়।
- পাঠক: রাজা, মন্ত্রী, রাজপুত্র, সেনাপতি ইত্যাদি চরিত্রের পুরষদের বলা হয় পাঠক।
- সংগাল: নাচ, গান, অভিনয়, নৃত্য ইত্যাদির মাধ্যমে যারা শ্রোতাদের হাসায়, তাদের বলা হয় সংগাল। সং সেজে এর হাসানোর কাজ করার কারণে, এদের এরূপ নামে ডাকা হয়।

সাধারণত লেটোর আসর বসতো স্থানীয় কোনো ফাঁকা জায়গায়। লড়াইয়ে জেতা কবিয়াল খ্যাতির সূত্রের দূরের দূরের গ্রামগুলোতে আমন্ত্রণ পেতেন। আর এসবই আমন্ত্রণের সূত্রে এঁদের জীবিকা নির্বাহ হতো। সাধারণত লেটোর আসর বসতো স্থানীয় কোনো ফাঁকা জায়গায়। লড়াইয়ে জেতা কবিয়াল খ্যাতির সূত্রের দূরের দূরের গ্রামগুলোতে আমন্ত্রণ পেতেন। আর এসবই আমন্ত্রণের সূত্রে এঁদের জীবিকা নির্বাহ হতো।

কাজী নজরুল ইসলাম ও লেটো গান

কাজী বজলে করীমের হাত ধরে, নজরুল যখন লেটো গানের জগতে আসেন তাঁর বয়স বার-তের বৎসর, এই সময় তাঁর গুরু বজলে করীম ছিলেন এই অঞ্চলের স্বনামধন্য এবং অপরাজেয় গোদাকবি। এখন পর্যন্ত তাঁর যে কয়েকটি লেটো লেটোপালা বা চাপান সং-এর সন্ধান পাওয়া গেছে, তার সূত্র তাঁর অসামান্য কবি-প্রতিভা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। তাঁর রচনায় পাওয়া যায়-সমকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপট ও আর্থ-সামাজিক দ্বন্দ্বের কথা,কাব্য রচনার অসাধারণ ক্ষমতা, অতুলনীয় রসবোধ এবং প্রতিপক্ষ গোদাকবিকে ঘায়েল করার জন্য তীব্র বিদ্রূপ এবং বাক্যাঘাত।

পালার গানগুলি হল- চাষার সঙ, শকুনীবধ, রাজা যুধিষ্টিরের সঙ, দাতা কর্ণ, আকবর বাদশাহ, কবি কালিদাস, বিদ্যাভুতুম, রাজপুত্রের গান ইত্যাদি।

ঝাঁপান গান

পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জিলায় প্রধানতঃ পশ্চিম সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে শ্রাবণ মাসে বিশেষতঃ শ্রাবণ-সংক্রান্তির দিন কোন কোন নির্দিষ্ট স্থানে সাপের ওঝা কিংবা গুণিগণ একত্র হইয়া জীবন্ত সর্প সহ সমবেত কৌতূহলী জনসাধারণের সম্মুখে সর্পবিষ দূর করিবার কৌশল দেখাইয়া থাকে। এই উপলক্ষে কোন কোন স্থানে বিরাট মেলার অধিবেশন হয়। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে ওঝা বা গুণীরা যে'গান গাহিয়া থাকে, তাহাকেই ঝাঁপান গান বলা হয়।

ঝাঁপান গানের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা হয়, কশ্যপ মুনি স্বর্গের দেবতা; ভগবানের কৃপাবলে তিনি বহু তন্ত্রমন্ত্র পাইয়ছিলেন, তাহা দ্বারা সাপে কামড়ানো লোকের প্রাণ রক্ষা হইত। একদিন স্বয়ং মহাদেবের আদেশে কশ্যপ মুনি মর্ত্যধামে ঐ মন্ত্রাদি প্রচার করিতে আসিবেন স্থির হইল। সেই সময় সুর ও অসুর মিলিয়া সমুদ্র মন্থন করেন। কশ্যপ মুনি ঐ সময় সুধাপাত্র হাতে সমুদ্রে অধিষ্ঠিত হন। সেই সুধাপাত্র সহ দেবতাগণ তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া যান। তখন সেখানে হইতে তাঁহাকে পুনরায় উক্ত কাজের জন্য মর্ত্যে আসিতে হয়। এখানে আসিয়া তিনি প্রথমে শঙ্খপুরে বসতি স্থাপন করেন। তখন তাঁর নাম ছিল ধন্বন্তরি। সেখানে আসিয়া তিনি ক্রমে ক্রমে ১২৬ জন শিষ্য তৈরী করেন। তিনি ঐ শিষ্যদিগকে মনসা দেবীর জন্মকথা ও তৎসম্পর্কিত নানা কাহিনী, সাপের মন্ত্র ইত্যাদি শিক্ষা দেন। তাঁহার প্রথম দুই শিষ্যের নাম সুষেণ ও সুমান। ঐ সঙ্গে ঔষধ স্বরূপ কিছু গাছের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। গাছগুলির নাম অস্থি-সকারিণী, জীব-সঞ্চারিণী জ্যোতিরূপী, তেজোময়, বিশল্যকরণী ইত্যাদি। তারপর হইতে মর্ত্যধামে ঐ সমস্ত মন্ত্র ও ঔষধ প্রচলিত হয়। যাঁহারা এই মন্ত্রতন্ত্র শিক্ষা করেন তাঁহারা মনসাদেবীর অর্চনা করেন। তাই মনসাদেবীর পুজার সময় ঝাঁপান গান হইয়া থাকে।

মা, মনসা, মন আশা পিপাসা পুরাও জননী।
আমি অতি মূঢ় মতি ভজন সাধন নাহি জানি।
তন্ত্র ফুলে গেঁথে মালা, এনেছি মনসা বালা,
দিয়ে মন্ত্র বরণ ডালা, পুজির চরণ দুখানি।
করুণা করে কটাক্ষে, অহিকুল করেছ রক্ষে
নির্দয় যেন পুত্রের পক্ষে, হয়োনা বিশ্ববন্দিনী।
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল পুরে, স্বীয় শক্তি সবিস্তারে
পূজনীয়া ঘরে ঘরে, হয়েছো পুরাণে শুনি।

গম্ভীরা:

গম্ভীরা গান এক প্রকার জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত। সাধারণত বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চলে এ গান প্রচলিত। ‘গম্ভীরা’ হচ্ছে এক প্রকার উৎসব। ধারণা করা হয় যে, গম্ভীরা উৎসবের প্রচলন হয়েছে শিবপূজাকে কেন্দ্র করে। শিবের এক নাম ‘গম্ভীর’,

তাই শিবের উৎসব গম্ভীরা উৎসব এবং শিবের বন্দনাগীতিই হলো গম্ভীরা গান। গম্ভীরা উৎসবের সঙ্গে এ সঙ্গীতের ব্যবহারের পেছনে জাতিগত ও পরিবেশগত প্রভাব রয়েছে।

আদিতে গম্ভীরা ছিল দুপ্রকার: আদ্যের গম্ভীরা ও পালা-গম্ভীরা। দেবদেবীকে সম্বোধন করে মানুষের সুখ-দুঃখ আদ্যের গম্ভীরার মাধ্যমে প্রকাশ করা হতো। কখনও কখনও সারা বছরের প্রধান প্রধান ঘটনা এ গানের মাধ্যমে আলোচিত হতো। পালা-গম্ভীরায় অভিনয়ের মাধ্যমে এক একটা সমস্যা তুলে ধরা হতো। চৈত্র-সংক্রান্তিতে বছরের সালতামামি উপলক্ষে পালা-গম্ভীরা পরিবেশন করা হতো।

বর্তমানে 'গম্ভীরা' বলতে বিশেষ একটি অঞ্চলের লোকসঙ্গীতকে বোঝায়। গম্ভীরা গানের উৎপত্তি পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলায় হিন্দুসমাজে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর মালদহ থেকে গম্ভীরা গান রাজশাহীর চাঁপাইনবাবগঞ্জে চলে আসে।

ওই সময় থেকে এ গানের পৃষ্ঠপোষক হয় মুসলিম সমাজ। তখন স্বাভাবিকভাবে গানের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুতে পরিবর্তন সূচিত হয়। ক্রমে রাজশাহী, নবাবগঞ্জ, নওগাঁ প্রভৃতি স্থানে এ গান জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

গম্ভীরা গানে সমসাময়িক বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরা হয় এবং তার সমাধানও বলে দেওয়া হয়। পূর্বে গম্ভীরা গানের আসরে শিবের অস্তিত্ব কল্পনা করা হতো। বর্তমানে শিবের পরিবর্তে 'নানা-নাতি'র ভূমিকায় দুজন অভিনয় করে। তাদের সংলাপ ও গানের মধ্য দিয়ে দ্বৈতভাবে গম্ভীরা গান পরিবেশিত হয়। আঞ্চলিক ভাষায় রচিত সংলাপ ও গানের মাধ্যমে কোনোও একটা বিষয় তুলে ধরা হয়। গানের একটি ধুয়া থাকে; সংলাপের ফাঁকে ফাঁকে গানগুলি ধুয়ার সুরে গীত হয়। এভাবে নানা-নাতির নাচ, গান, কৌতুক, অভিনয়, ব্যঙ্গ প্রভৃতির মাধ্যমে গম্ভীরা গানে সমাজের অসঙ্গতি তুলে ধরা হয়। এ সময় তাদের বাকচাতুরী, উপস্থিত বুদ্ধি এবং অঙ্গভঙ্গি সবাইকে মুগ্ধ করে। নানার পোশাক হলো লুঙ্গি; এ ছাড়া তার মুখে থাকে পাকাদাঁড়ি, মাথায় মাথাল, হাতে লাঠি; আর নাতির পোশাক ছেঁড়া গেঞ্জি, কোমরে গামছা ইত্যাদি।

এক সময় গম্ভীরা গান একতাল, ত্রিতাল, দাদরা, খেমটা, কাহারবা প্রভৃতি সুরে গাওয়া হতো। বর্তমানে সুরের পরিবর্তন ঘটেছে এবং তাতে হিন্দি ও বাংলা ছায়াছবির গানের সুর প্রাধান্য পাচ্ছে। এ ছাড়া লোকনাট্যের বহু বিষয়, চরিত্র ও সংলাপও গম্ভীরা গানে সংযুক্ত হয়েছে। নবাবগঞ্জের কুতুবুল আলম, রকিবউদ্দীন, বীরেন ঘোষ, মাহবুবুল আলম প্রমুখ গম্ভীরা গানের বিশিষ্ট শিল্পী। তাঁরা নতুন নতুন সুর সৃষ্টির মাধ্যমে গম্ভীরা গানকে সারা বাংলাদেশে জনপ্রিয় করে তুলেছেন।

বাংলা লোকসঙ্গীত শিল্পের একটি অন্যতম ধারা। প্রাচীন বাংলার মালদা শহরের জামতলি, কালীতলা ও বর্মনপাড়ায় প্রতিবছর ১৬ই বৈশাখ গম্ভীরা উৎসবের আয়োজন দেখা যায়। চৈত্র থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত এই উৎসব চলে যতক্ষণ না পর্যন্ত নতুন ফসলের কাজ আরম্ভ হয়। এই উৎসবের শুভ সূচনা হয়ে গম্ভীরা পূজার মধ্যে দিয়ে।

নিষ্ঠা, আচার-বিচার মেনে পূজার বিধিকে বজায় রেখে শিবের আবাহনই গম্ভীরা পূজার প্রাথমিক পর্ব। এরপর সারা শহর জুরে নানান গম্ভীরা তলায় তারা এই সময় ধরে গম্ভীরা শিল্পের প্রদর্শন করে যান। আর এই শিল্পের প্রতি সাধারণ মানুষের অনুরাগ বা আকর্ষণ চোখে পড়ার মতো। এই পূজার নানাবিধ পর্যায় বা স্তর। প্রত্যেকটি স্তরে রয়েছে উৎসবের আঙ্গিক। শেষ পর্বে গম্ভীরা গান পরিবেশিত হয়। এই গানের মধ্য দিয়েই সমকালীন জীবনের ও সমাজের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। গম্ভীরা উৎসব মালদহ জেলার প্রধানত চার দিনের উৎসব। গম্ভীরা পুজোকে কেন্দ্র করে গম্ভীরা মণ্ডপ বা প্রচলিত নামে গম্ভীরা তলা তৈরি করা হয়। প্রথম দিনের উৎসবের নাম 'ঘর ভরা'।

সেই দিন শিব ঠাকুরের উদ্দেশে ঢাকঢোল বাজিয়ে নদী থেকে ঘটে জল নিয়ে সেই ঘট স্থাপন করা হয় মণ্ডপে। দ্বিতীয় দিনের উৎসব 'ছোট তামাশা'। এই দিনে শিব ও পার্বতীর পুজো হয়। পুজোর অনুষ্ঠান রং, তামাশা, আনন্দ, রসিকতার মধ্যে দিয়ে গম্ভীরা প্রদর্শিত। তৃতীয় দিনের উৎসব 'বড় তামাশা'। সে দিন হয় মুখোশনৃত্য উৎসব। চামুণ্ডা, নরসিংহী, কালীর মুখোশ পড়ে ঢাকের তালে তালে নৃত্য হয়। মুখোশ পড়ে উদ্দাম নৃত্যের মধ্য দিয়ে গম্ভীরার বিশেষ রূপ প্রকাশ পায়। আর, চতুর্থ দিনের উৎসবের নাম 'আহারা'। সে দিন দুপুরে/ বিকেলে সঙ বেরোয়।

বিভিন্ন সাজে সেজে সঙ গ্রাম-শহর পরিক্রমা করে। এই সঙ আবার দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম রীতিতে গান গেয়ে অভিনয় করা হয়। নাটকীয় গুণ সব রকম ভাবে প্রকাশ পায় এখানে। এই রীতিটিই গম্ভীরা লোকনাট্য। গম্ভীরা গানের শুরুতে দেবাদিদেব শিবকে বন্দনা করার রেওয়াজ আছে। শিবরূপী অভিনেতাকে মঞ্চে নিয়ে এসে তাঁকে সমস্ত বিষয়ে জানানো হয়। সমাজের মঙ্গলের জন্য কী করণীয় বা কোনও সমস্যা থাকলে কী ভাবে তার সমাধান করা যেতে পারে, তার প্রতিকারের নিদান দেন শিব। দর্শকের সামনে শিবকে উপস্তিত করে সমস্যার সমাধান করার মধ্যে দিয়ে সমাজ সচেতন হয়।

বিভিন্ন রকমের গম্ভীরা নৃত্য বিদ্যমান যথা বুড়াবুড়ির নাচ, টাপা নাচ, সারস নাচ, মুখা নাচ, মশান নাচ, কালী নাচ প্রভৃতি। বাংলা গম্ভীরা সাধারণত দুইপ্রকার — আদ্যের গম্ভীরা এবং পালা-গম্ভীরা। প্রথমত দেবদেবীকে সম্বোধন করে মানুষ যখন তার সুখ-দুঃখ পরিবেশন করবে তখন তাকে আদ্যের গম্ভীরা বলা হবে। আর দ্বিতীয়ত পালা-গম্ভীরায় নানা-নাতির ভূমিকায় দুজন ব্যক্তির অভিনয়ের মাধ্যমে সমাজের এক একটা সমস্যা তুলে ধরবে আর মাঝে মাঝে গানের সুরে তা মানুষের অন্তর মজিয়ে দেবে।

দৈনন্দিন জীবনসংগ্রামে সংঘটিত নানা ঘটনা সঙ্গীত ও নৃত্যের মধ্যে দিয়ে উপস্থাপনা ও পর্যালোচনা করাই হচ্ছে গম্ভীরা গানের মূল বৈশিষ্ট্য। সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষামূলক, এমনকি সাম্প্রতিকতম নানা রাজনৈতিক হালচালও যা গম্ভীরা শিল্পের মধ্যে দিয়ে উপস্থাপীত হয়। এবং অবশ্যই উপস্থাপনা উপভোগ্য হয়। এমনকি অনেক গম্ভীরায় বার্ষিক চাওয়া-পাওয়ার হিসাবও দেখতে পাওয়া যায়। সব মিলিয়ে যা উপস্থাপন হয় তা মানুষের জীবনের কথা, মানুষের কষ্টের কথা, অত্যাচারীর অত্যাচারের কথা।

গম্ভীরাকে আরো বেশি মানুষের নিয়ে যেতে, তাকে আকর্ষণীয় করে তুলতে নৃত্যে শিল্পীদের ছৌ-এর ঢঙে দেব-দেবীদের মুখোশ ব্যবহারের প্রচলন শুরু হয়েছে। এই গান সাধারণত পোলিয়া, রাজবংশী, নাগর, কোচ প্রভৃতি আদিবাসী শিল্পীদের কণ্ঠে বেশি শোনা যায়। অর্থাৎ উপরে উল্লিখিত অঞ্চলে নিম্নবর্গীয় হিন্দু, নমঃশুদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে এই নাচের প্রচলন রয়েছে। আধুনিক গম্ভীরা গানের প্রবর্তক-জনক, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গম্ভীরা শিল্পী ওস্তাদ শেখ সফিউর রহমান ওরফে 'সুফি মাস্টার'। ১৮৯৪ সালে তৎকালীন মালদহ (চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও ভারতের কিছু অংশ) জেলার ইংরেজ বাজার থানার ফুলবাড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

বিংশ শতাব্দীর বাঙালি বৌদ্ধিক মননের এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি বিনয়কুমার সরকার যিনি ১৯০৭ সাথে 'জাতীয় শিক্ষা সমিতি' গঠনের মধ্য দিয়ে গম্ভীরা আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। এই আন্দোলনের সোনার ফসল হরিদাস পালিতের লেখা 'আদ্যের গম্ভীরা' যা সারা ভারতবর্ষকে লোকসংস্কৃতির এই বিশেষ ধারার পরিচয় করায়। 'বিনয় সরকারের বৈঠকে' বইয়ে তিনি অকপটে বলেছেন- '··· এ কালে গণতন্ত্র কপচাই। সেই গণতন্ত্রই জীবনে প্রথম দেখেছি জামতল্লীর গম্ভীরার

শাসন কায়দায়। আজকাল সমাজতন্ত্র কপচাই। সেই সমাজতন্ত্রের দম্ভও জীবনে প্রবেশ করেছিল চুনিয়া-নুনিয়া-পাঁজরা-কাঁসারি জাতীয় ভাইদের সঙ্গে নাচানাচি আর লাফালাফির আবেষ্টনে।'

বাঙ্গালি নিম্নবর্গের সেই জনসংস্কৃতি যা প্রতিমূহুর্তে ক্ষমতার প্রতিস্পর্ধী স্বর হয়ে উঠতে চায়, তার শৈল্পিক প্রকাশ হিসেবে গম্ভীরা একটি অববদ্য মাধ্যম। এই শিল্পে ব্যবহৃত গান, নাচ, অভিনয় সবই মানুষের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে জায়গা করে নেয়। অনেক বিতর্কিত সত্য যা আপাত দৃষ্টিতে উস্কানিমূলক মনে হলেও মানুষের উপকারে আসে। সেই সকল কথা শ্রবণে তারা শিক্ষিত হয়, সচেতন হয়, অনেক অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগঠিতও হয়। অর্থাৎ বিনদের পাশাপাশি সমগ্র জাতিকে এক সচেতনতামূলক বার্তা দান করে এই গম্ভীরা।

মালদহের গম্ভীরার বিশেষত্ব হল মুখোশের ব্যবহার। স্থানীয় সূত্রধর সম্প্রদায় নিম এবং ডুমুর গাছের অংশবিশেষের সাহায্যে মুখোশগুলি তৈরি করে। যে মুখোশগুলি সব সম্প্রদায়ের বাধ্যতামুলক নয়, সেখানে তারা স্বাভাবিকভাবেই মুখোশ না পড়ে গম্ভীরা গান বা নাচেন। সাথে গানের দল বা বাদকের সঙ্গত করে।গম্ভীরার ঐতিহাসিক সাবেকিয়ানা কাটিয়ে, সমসাময়িক জীবনের প্রত্যেকটি ঘাত-প্রতিঘাতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গম্ভীরা আজ অনেকাংশেই বদলে গিয়েছে। আধুনিকতার দিকে অনেকটাই এগিয়েছে বাংলার এই লোকশিল্প। গম্ভীরার গান , নাচ ও স্ক্রিপ্ট সবই বাংলা প্রসেনিয়াম থিয়েটারকে প্রভাবিত করেছে। আবার সময়ের তালে আধুনিক যাত্রা ও নাটকের ভাবধারাও কখনও কখনও গম্ভীরা লোকনাট্যকে প্রভাবিত করেছে।

এই পরিবর্তন শুধু লোকনাট্যের ক্ষেত্রেই নয়, সমস্ত লোকসংস্কৃতির মধ্যেই এর প্রভাব পড়ে।। সেই সুত্রে বিষয়ভাবনাতেও আমূল পরিবর্তন ঘটেছে গম্ভীরার। স্মরণাতীত কাল থেকে গম্ভীরা মানুষের মন জয় করে আসছে। আশা করা যায়, নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের হাত ধরে গম্ভীরা এগিয়ে যাবে আপন গতিতে তাদেরই শিল্পের ক্যারিসমায়।

অতএব এই শিল্পকে অবশ্যই বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। আর এইখানেই সাধারণ মানুষের এই শিল্প রক্ষার প্রতি দায়বদ্ধতা এসে যায়। যদি হারিয়ে যায় তা হবে আমাদেরই জন্য, ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না। আমরা বর্তমানে লোক সংস্কৃতির ঢাল ব্যবহার করে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে অনেকেই এই শিল্পের প্রয়োগে যথেচ্ছ পরীক্ষানিরীক্ষা করছি, যা অনেকসময় এই শিল্পের মাধুর্য বিনষ্ট করছে।

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম দেবতা শিব। শিবের অপর এক নাম 'গম্ভীর'। শিবের উৎসবে শিবের বন্দনা করে যে গান গাওয়া হত- সেই গানের নামই কালক্রমে হয়ে যায় ‘গম্ভীরা’। শিব> গম্ভীর> গম্ভীরা।

পরবর্তী সময়ে গম্ভীরা গানের ধরন অনেকাংশে বদলে গেছে। গানের সুরে দেবদেবীকে সম্বোধন করে বলা হয় গ্রামীণ দারিদ্রক্লিষ্ট মানুষের সুখ-দুঃখ। কখনও সারা বছরের প্রধান ঘটনা এ গানের মাধ্যমে আলোচিত হয়। পালা-গম্ভীরায় অভিনয়ের মাধ্যমে এক একটা সমস্যা তুলে ধরা হয়। চৈত্র-সংক্রান্তিতে বছরের সালতামামি উপলক্ষে পালা-গম্ভীরা পরিবেশন করা হয়ে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশে ‘গম্ভীরা’ বলতে বিশেষ একটি অঞ্চলের লোকসঙ্গীতকে বোঝায়।

গম্ভীরা গানের উৎপত্তি পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলায় হিন্দুসমাজে। গম্ভীরা নৃত্যটি উত্তরবঙ্গের অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলা জুড়ে চৈত্র সংক্রান্তির উৎসবের সময় প্রদর্শিত হয়। মালদহের গম্ভীরার বিশেষত্ব হল মুখোশের ব্যবহার। স্থানীয়

সূত্রধর সম্প্রদায় নিম এবং ডুমুর গাছের অংশবিশেষের সাহায্যে মুখোশগুলি তৈরি করে। কখনও কখনও মুখোশগুলি মাটি দিয়েও তৈরি করা হয়।[৮] গম্ভীরা গানের তালে এই মুখোশ পরেই নৃত্য পরিবেশন করা হয়। গম্ভীরা নৃত্যের মুখোশ হিসাবে বিভিন্ন ধরনের মুখোশ ব্যবহৃত হয়। হিন্দু পৌরাণিক চরিত্রের বাণ, কালী, নরসিংহী, বাশুলী, গৃধিনীবিশাল, চামুণ্ডা, উগ্রচণ্ডা, ঝাঁটাকালী, মহিষমর্দিনী, লক্ষ্মী-সরস্বতী, হিরণ্যকশিপুবধ, তাড়কাবধ, শুম্ভনিশুম্ভ বধ ইত্যাদির মুখোশ ব্যবহৃত হয়। এই মুখোশের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় নরসিংহী মুখোশ।

পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলাতে গম্ভীরা বা রাগীনি কৌশলে একাধিক ভাগ থাকে। প্রথম ভাগটি হল *বন্দনা* এই অংশে মঞ্চে *শিব* আসেন এবং শিবকে উদ্দেশ্য করে নানা সমস্যার কথা তুলে ধরে দুটি চরিত্র। শিব সমস্যাগুলির প্রতিকারের উপায় বলে দিয়ে প্রস্থান করেন। পরের ভাগটিতে আসে *দ্বৈত* চরিত্র। পুরুষ ও মহিলা দুটি চরিত্র সংলাপ ও গানের মধ্য দিয়ে সমাজজীবন, রাজনীতি থেকে শুরু করে ঘটনাবহুল নানা বিষয় তুলে ধরেন। পরে *চার ইয়ারি* হিসেবে চারজন অভিনেতা মঞ্চে আসেন। এর মধ্যে একজন উচিত বক্তা থাকেন। সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হয়ে তিনি স্পষ্ট বক্তব্য গান ও কথার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেন। এই চার ইয়ারি বা বন্ধুর বাক্যালাপের মধ্য দিয়ে সামাজিক সমস্যা মেটানোর পথ বেরিয়ে আসে। এর পরের পর্বটি হল *ব্যঙ্গ* একটি চরিত্র ব্যঙ্গের মাধ্যমে জরুরি কিছু কথা বলে। আর শেষভাগে 'সালতামামি' বা রিপোর্টিং। সারা বছরের নানা ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়াই হল সালতামামি। এখানে সারা বছরের কাজের নানা সমালোচনা হয়। শেষে একটি সমাধানের রাস্তা বার করে গম্ভীরা গান শেষ হয়। গম্ভী লোকনাট্যে বিশেষ ভূমিকা বহন করে তালবাদ্য। এছাড়াও ট হারমোনিয়াম, তবলা, করতাল, ট্রাম্পেট প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার করা হয় গম্ভীরা পরিবেশনায়।
যে সমস্ত প্রথিতযশা শিল্পীদের হাত ধরে গম্ভীরা মালদহ জেলাতে স্বমহিমায় বিরাজমান তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নামগুলি হল ধনকৃষ্ণ অধিকারী, কৃষ্ণধনদাস গোস্বামী, মহম্মদ সুফি, গোপালচন্দ্র দাস, সতীশচন্দ্র গুপ্ত, গোলাম গুপ্ত, কিশোরীকান্ত চৌধুরী প্রমুখ। গম্ভীরা গানকে বিশেষ মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছিলেন পুরাতন মালদহের ইটখোলা গ্রামে জন্ম নেওয়া এবং ইংরেজবাজার শহরের কুতুবপুর বাবুপাড়া নিবাসী যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী যিনি *গম্ভীরাসম্রাট* নামে আখ্যায়িত হন । গম্ভীরায় কৌতুক সৃষ্টিকারী অভিনেতা ও গায়ক শিল্পী হিসেবে তাঁর স্থান ছিল অদ্বিতীয়। তাঁর ডাকনাম ছিল মটরা। এক সময় , মালদহ তো বটেই, অবিভক্ত দিনাজপুর তথা গোটা বাংলায় তাঁর অভিনীত গম্ভীরা *মটরার গান* হিসেবে অভিহিত হত। এ ছাড়া গোবিন্দলাল শেঠ, গোপীনাথ শেঠ, অনিল চৌধুরী, রামেশ্বর রায়ের মতো অসংখ্য শিল্পী গম্ভীরাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন মালদহ জেলায়।

বাংলাদেশ

বাংলাদেশে পূর্বে গম্ভীরা গানের আসরে শিবের অস্তিত্ব কল্পনা করা হত। বর্তমানে বাংলাদেশের গম্ভীরা গানের আসরে শিবের পরিবর্তে 'নানা-নাতি'র ভূমিকায় দুজন অভিনয় করে। নানার মুখে পাকা দাঁড়ি, মাথায় মাথাল, পরনে লুঙ্গি; হাতে লাঠি। আর নাতির পোশাক ছেঁড়া গেঞ্জি, কোমরে গামছা ইত্যাদি। একেবারে তৃণমূল পর্যায়ের গ্রামের ছবি। 'নানা-নাতি'র সংলাপ ও গানের মধ্য দিয়ে দ্বৈতভাবে গম্ভীরা গান পরিবেশিত হয়।এক সময় গম্ভীরা গান একতাল, ত্রিতাল, দাদরা, খেমটা, কাহারবা প্রভৃতি সুরে গাওয়া হতো। বর্তমানে সুরের পরিবর্তন ঘটেছে এবং তাতে হিন্দি ও বাংলা ছায়াছবির গানের সুর প্রাধান্য পাচ্ছে। এ ছাড়া লোকনাট্যের বহু বিষয়, চরিত্র ও সংলাপও গম্ভীরা গানে সংযুক্ত হয়েছে। নবাবগঞ্জের

কুতুবুল আলম, রকিবউদ্দীন, বীরেন ঘোষ, মাহবুবুল আলম প্রমুখ গম্ভীরা গানের বিশিষ্ট শিল্পী। তারা নতুন নতুন সুর সৃষ্টির মাধ্যমে গম্ভীরা গানকে সারা বাংলাদেশে জনপ্রিয় করে তুলেছেন।

গম্ভীরা নৃত্য মূলত দুই ধরনের :

১. মুখোশ সহ নৃত্য
২. মুখোশ বিহীন নৃত্য

পূর্বে মুখোশ সহ নৃত্যে মুখোশ গুলি নিম কাঠ এবং ডুমুরকাঠ দিয়ে নির্মিত হত, তবে এখন কাগজের মন্ড বা মাটি দিয়েও তৈরী হয়ে থাকে এই মুখোশ। তবে উল্লেখ্য, গম্ভীরা নাচের মুখোশ কিন্তু মুখোশ শিল্পের অঙ্গ হয়ে উঠতে পারেনি সেই অর্থে।

এছাড়াও গ্রাম বাংলায় মূলত পাঁচ রকমের গম্ভীরা নৃত্য দেখা যায় যথা:
সামাজিক (মাতাল, মেমসাহেব, বয়স্ক মানুষ), প্রাণী বিষয়ক (ববাঘ , সাপ , হরিণ), গ্রামীণ (মহিষ-রাখাল, বক), পৌরাণিক (কালী, চামুন্ডা, উগ্রচণ্ডা, ঝাঁটাকালী, মহিষমর্দিনী, মিশ্র রীতি (বাদশা, সাপ, জাদুকর, পরী)
বাণনৃত্য গম্ভীরা নাচের ভূমিকা। বাদ্যযন্ত্র হিসাবে এতে ব্যবহৃত ঢাকের বোলেও রয়েছে বৈচিত্র্য, যাকে বলা হয় সূত্র। এই পঞ্চসূত্র হল: আবাহন, পূজাবাদ্য, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনা, লহর ও বিদায়।
এই পঞ্চসূত্র কালী, চামুণ্ডা, নারসিংহী, বাশুলী, উগ্রচণ্ডা, গৃধিনীবিশাল ও মহিষমর্দিনী — এই সাত ধরনের নৃত্যে প্রকাশিত।
এই নৃত্যের দুটি ভাগ:

- পৌরাণিক,
- মাধ্যমিক।

চারিত্রিক দিক থেকেও গম্ভীরা নৃত্য তিনভাগে বিভক্ত: সাধারণ, ঐন্দ্রজালিক ও লোকায়ত।
এগুলির মধ্যে একক নৃত্য হল নারসিংহী; ১২/১৩ মিনিট ধরে নানা ভঙ্গিমায় কখনো একেবারে তর্জনী নির্দিষ্ট দিকে হেলান বা নির্দেশিত, কখনো শয়ান, কখনো উদ্দামরূপে, কখনো ভ্রামরীতে ঘোরে, কখনো এগিয়ে বিশিষ্ট 'স্থানকে' ভঙ্গি নিয়ে দাঁড়ায় নর্তক।
আগেকার দিনে নর্তকরা সোনার গয়না পরতো, পায়ে বাঁধত নুপূর। এখন ঘুঙুর ব্যবহৃত হয়। নৃত্যে ব্যাঘ্রপদ, সিংহপদ বিশেষ লক্ষণীয়।

বনবিবির পালা:

বনবিবি হলেন বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত সুন্দরবন অঞ্চলে মৎস্যজীবী, মধু-সংগ্রহকারী ও কাঠুরিয়া জনগোষ্ঠীর দ্বারা পূজিত এক লৌকিক দেবী তথা পিরানি। উক্ত জনগোষ্ঠীর মানুষেরা বাঘের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে বনবিবির পূজা করে। বনবিবি বনদেবী, বনদুর্গা, ব্যাঘ্রদেবী বা বণচণ্ডী নামেও পরিচিত।
কোনও কোনও মন্দিরে তিন ব্যাঘ্র-দেবদেবী বনবিবি, দক্ষিণরায় ও কালুরায় একসঙ্গে পূজিত হন। আবার কোথাও বনবিবি-শাজঙ্গুলির যুগ্ম বিগ্রহও পূজিত হতে দেখা যায়। জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর গভীর ফরেস্টের প্রতি বছর শীতে এই বন দুর্গা পুজো তথা মেলার আয়োজন হয়

ভারত ও বাংলাদেশ উভয় দেশের সুন্দরবন অঞ্চলেই মৎস্যজীবী, মধু-সংগ্রহকারী ও কাঠুরিয়া জনগোষ্ঠীর মানুষেরা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঘের হাত থেকে রক্ষা পেতে বনবিবির পূজা করেন। ইতিহাসবিদ সতীশচন্দ্র মিত্রের *যশোহর খুলনার ইতিহাস*গ্রন্থের তথ্য অনুযায়ী, ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ সুন্দরবন এলাকায় দক্ষিণরায়, বণিক ধোনাই ও মোনাই এবং গাজীর অস্তিত্বের কথা জানা যায়। বনবিবি ছিলেন ইব্রাহিম (মতান্তরে বেরাহিম) নামে এক আরবের কন্যা। ইব্রাহিমের স্ত্রী গুলাল বিবি সতীনের প্ররোচনায় সুন্দরবনে পরিত্যক্ত হলে সেখানেই বনবিবির জন্ম হয়। কথিত আছে, গুলাল বিবি মদিনা এবং ইব্রাহিম মক্কা হতে আগত ছিলেন। দক্ষিণরায় ছিলেন যশোহরের ব্রাহ্মণনগরের রাজা মুকুট রায়ের অধীনস্থ ভাটির দেশের সামন্ত। দক্ষিণরায়ের সঙ্গে বনবিবির একাধিক যুদ্ধ হয়। শেষে দক্ষিণরায় পরাজিত হয়ে সন্ধি করেন। দক্ষিণরায়ের পরাজয়কে এই গ্রন্থে বাঘ বা অপশক্তির পরাজয় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমানে উভয় দেশের সুন্দরবন অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলেন বনবিবি।
বনবিবির মাহাত্ম্যবিষয়ক কাব্যের নাম "বনবিবির জহুরানামা"। এই কাব্য মঙ্গলকাব্যের শৈলীতে রচিত হলেও এতে আল্লাহ্-রসুল, মক্কা, পির-পিরানি ইত্যাদি প্রসঙ্গ যুক্ত হয়েছে। অরণ্যচারী মানুষের ধর্মবিশ্বাস ও জীবনযাত্রার একটি চিত্র এতে পাওয়া যায়।[৪] গবেষকদের মতে, বনবিবি প্রকৃতপক্ষে হিন্দু দেবী বনদুর্গা, বনচণ্ডী, ষষ্ঠী বা বিশালাক্ষী। বাংলায় ইসলামি প্রভাবে তিনি বনবিবিতে পরিণত হয়েছেন।

বনবিবির কিংবদন্তিগুলি "বনবিবির কেরামতি" (বনবিবির অলৌকিক কার্যাবলি) ও "বনবিবির জহুরানামা" (বনবিবির গৌরবগাথা) নামে কয়েকটি লোককাব্যে পাওয়া যায়। এই কাব্যের কবিদের মধ্যে বায়ানউদ্দীন ও মোহাম্মদ খাত্তর বিশেষ পরিচিত এবং উভয়ের গ্রন্থের বিষয়বস্তুর মধ্যে অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়।

বনবিবির মূর্তি:

বনবিবি হিন্দুসমাজে বনদুর্গা, বনচণ্ডী বা বনদেবী নামেও পূজিতা হন। তিনি মাতৃদেবতা, ভক্তবৎসলা ও দয়ালু। তাঁর মূর্তিও সুশ্রী ও লাবণ্যময়ী। হিন্দুদের পূজিতা মূর্তিতে তাঁর গায়ের রং হলুদ, মুকুট, কণ্ঠহার ও বনফুলের মালা পরিহিতা এবং লাঠি অথবা ত্রিশূলধারিণী। মুসলমান সমাজে বনবিবি পিরানি হিসেবে পরিচিত। ইসলামি-প্রভাবান্বিত মূর্তিগুলিতে তিনি টিকলির

সঙ্গে টুপি পরিধান করেন, চুল বিনুনি করা, ঘাগরা-পাজামা বা শাড়ি এবং জুতো পরিহিতা। তবে উভয় মূর্তিকল্পেই তাঁর কোলে পুত্র রূপে দুখেকে দেখা যায়। বনবিবির বাহন বাঘ বা মুরগি।

জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্টে বনদুর্গার পূজা ও মেলা

শিলিগুড়ি শহর লাগোয়া ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি বিধানসভার অন্তর্গত বৈকণ্ঠপুর জঙ্গলে প্রায় দুই থেকে আড়াই কিলোমিটার ভেতরে গেলে দেখা মিলবে বনদুর্গা মন্দিরের। অথবা জলপাইগুড়ির বেলাকোবা থেকে 21 কিমি দূরে গাজোলডোবা সংলগ্ন জঙ্গলের এলাকা পথ দিয়ে যাওয়া যায় এখানে।এই পুজোয় লক্ষাধিক ভক্তের সমাগম হয়। এই বনদূর্গা পূজো দেখতে জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কোচবিহার এমনকি পার্শ্ববর্তী রাজ্য আসাম এবং বাংলাদেশ থেকেও প্রচুর মানুষ এসে থাকেন এই পুজো দেখতে।
দিল্লি ভিটা, চাঁদের খাল জায়গাটি সকলের কাছে অপরিচিত হলেও বন দুর্গার মন্দির হিসেবে সকলের কাছে পরিচিত । পৌষ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে, এই মন্দিরে বনদুর্গা পূজা হয়ে থাকে। কথিত রয়েছে দেবী চৌধুরানী নৌকা করে করতোয়া নদী হয়ে এখানে আসতেন। ভবানী পাঠক এবং দেবী চৌধুরানীর গোপন আস্তানা ছিল এই জায়গা। তখন অবশ্য ঠুনঠুনি মা বলে এখানে দেবী পুজিত হতো। এখন এটি বনদুর্গা বলেই সকলের কাছে পরিচিত। বৈকুণ্ঠপুর এর জঙ্গলের মাঝে এর অবস্থান।

জানা গিয়েছে, ব্রিটিশ আমলে এই পুজোর সূচনা করেছিলেন দেবী চৌধুরানী ও ভবানী পাঠক। সেই থেকে এখন পর্যন্ত প্রতি বছর বৈকুণ্ঠপুরের গভীর জঙ্গলে এই পুজো হয়েছে আসছে।প্রথমে এই পুজোকে ঠুনঠুনির পুজো বলা হতো।পরবর্তীতে ৪১ বছর ধরে একটি নতুন কমিটি গঠন করে মা বনদূর্গা পূজোর নাম করে পুজোর আয়োজন করে আসছেন উদ্যোগতারা। তবে বর্তমানে একে বনদুর্গা মায়ের পুজো বলে এখানে প্রতি বছর পৌষমাসে এর পুজো করা হয়। রাজগঞ্জে বৈকণ্ঠপুর জঙ্গলে দিল্লী ভিটা চাঁদের খালে অনুষ্ঠিত হয় বনদুর্গা পুজো।

বনবিবি অরণ্যের দেবী রূপে কল্পিত এবং অরণ্যচারী মানুষের দ্বারা পূজিত। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, তিনি কখনও মুরগি বা কখনও বাঘের রূপ ধারণ করেন। ভক্তবৎসলা এই দেবীর কারও প্রতি আক্রোশ নেই বলেই কথিত। সুন্দরবনের মৎস্যজীবী, ‘বাউয়ালি’ (কাঠুরিয়া) ও ‘মৌলে’রা (মধু-সংগ্রহকারী) তাঁকে রক্ষয়িত্রী জ্ঞানে পূজা করেন। তাঁদের ধারণা, বনের বাঘ ও ভূত-প্রেত প্রভৃতি অপশক্তির উপর কর্তৃত্ব করেন বনবিবি। তাই গভীর বনে কাঠ, গোলপাতা, মধু ও মোম সংগ্রহ করতে বা মাছ ধরতে যাওয়ার আগে তাঁরা বনবিবির উদ্দেশ্যে সিন্নি, ক্ষীর ও অন্নভোগ নিবেদন করেন। প্রতি বছর মাঘ-ফাল্গুন মাস নাগাদ বনবিবির বাৎসরিক পূজা হয়। এই পূজায় ব্রাহ্মণেরা পৌরোহিত্য করেন না, করেন নিম্নবর্ণীয় হিন্দুরা। বনবিবির পূজায় নিরামিষ নৈবেদ্য নিবেদনের রীতি আছে, বলি হয় না; কখনও বা তাঁর নামে জীবন্ত মুরগি ছেড়ে দেওয়া হয়।

ড. দেবব্রত নস্করের মতে, বৃহত্তর চব্বিশ পরগনার পার্শ্ববর্তী মেদিনীপুর অঞ্চল এবং সেই সঙ্গে বাঁকুড়া ও হুগলি প্রভৃতি জেলার আদিবাসী ও উচ্চবর্ণীয় হিন্দুরা পৌষ সংক্রান্তি বা ১ মাঘ যে বড়াম বা বড়ামচণ্ডীর পূজা করেন, তার সঙ্গে চব্বিশ পরগনার বনবিবি-পূজার সাদৃশ্য পাওয়া যায়। হাতি ও বাঘের আক্রমণ থেকে রক্ষালাভের উদ্দেশ্যে বড়ামচণ্ডীর পূজা

প্রচলিত এবং এই পূজাতেও ঘুড়ি ওড়ানোর চল রয়েছে। বনবিবির পূজা করা হয় বাঘের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে এবং এই পূজাতেও ঘুড়ি ওড়ানোর প্রথা রয়েছে। বড়ামচণ্ডীর সঙ্গে চব্বিশ পরগনার অপর দেবী নারায়ণীর সাদৃশ্যও লক্ষিত হয়। বড়ামচণ্ডী ও নারায়ণী উভয়েরই লতাপাতা আঁকা মুণ্ডমূর্তির পূজা প্রচলিত। উভয় পূজাতেই পশুপাখি বলি ও নাচগানের আয়োজন করা হয় এবং উভয় পূজায় আয়োজিত হয় পৌষ সংক্রান্তি বা ১ মাঘ। এছাড়া পশ্চিম রাঢ় অঞ্চলে রঙ্কিনী দেবীর পূজার সঙ্গেও বনবিবি, নারায়ণী ও বড়ামচণ্ডীর পূজার সাদৃশ্য রয়েছে।

চাঁপাতলার বনবিবি মেলা

পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার বারুইপুর থানার অন্তর্গত বেগমপুর মৌজার একটি ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন মেলা হল চাঁপাতলার বনবিবি মেলা। পিয়ালি নদীর তীরে প্রফুল্ল সরোবরের কাছে একটি অশ্বত্থ গাছের গোড়ায় বনবিবির থানটি অবস্থিত। স্থানীয় অধিবাসীদের বিশ্বাস, চাঁপাতলার বনবিবির থানটি ২০০-২৫০ বছরের প্রাচীন। বারুইপুরের চৌধুরী পরিবারকে এই থানের প্রতিষ্ঠাতা বলে উল্লেখ করা হলেও উক্ত পরিবারের দেবোত্তর সম্পত্তি দানের নথিপত্রে এই থানের উল্লেখ পাওয়া যায় না। পূর্বে এখানে থান বলতে দু'টি অনাচ্ছাদিত মাটির ঢিপি ছিল। বর্তমানে এটি ১০/৬ ফুট, ইটের দেওয়াল ও টালির ছাউনি-যুক্ত একটি পূর্বদ্বারী ঘর। ১৯৯০-এর দশকে জনৈক মুসলমান ভক্ত এই ঘরটি নির্মাণের জন্য সমস্ত ইট দান করেন এবং গ্রামবাসীরা চাঁদা তুলে টালির চালটি তৈরি করেন। ১ মাঘ বাৎসরিক পূজার দিন একটি অস্থায়ী খড়ের চাল তৈরি করে বেদীর কাছে বনবিবি-শাজঙ্গুলীর মূর্তি স্থাপন করে পূজা করা হয়। বর্তমানে নতুন মূর্তি গড়ে পূজা প্রচলিত হয়েছে। তবে পূজার দিন শতাধিক 'দেবী ছলন' (মানতকারীদের দান করা মূর্তি) আসে। সেগুলিকে মন্দিরের মধ্যে প্রায় ঠাসাঠাসি করে রাখা হয়। পূজার পর উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে সেগুলি ঘরের মধ্যেই নষ্ট হয়ে যায়। পার্শ্ববর্তী মাছ চাষের লভ্যাংশের একাংশ দেবীর বাৎসরিক পূজায় ব্যয় করা হয়।

বনবিবির 'ছলন'গুলিতে দেবীর রূপের ভিন্নতা লক্ষ্যতা করা যায়। মূর্তিগুলি মাটির এবং মূর্তির অলংকারগুলিও কৃত্রিম। কোনও মূর্তিতে দেবী দ্বিভূজা ও ব্যাঘ্রবাহিনী, কোনও মূর্তিতে সিংহবাহিনী। ব্যাঘ্রবাহিনী বনবিবির কোলে শিশু এবং একই কাঠামোয় মুগুর বা গদা হাতে মুসলমানী পোষাকে দাড়িওয়ালা এক পুরুষের মূর্তিও দেখা যায়। বনবিবির পালায় এই শিশুটিকে দুখে ও পুরুষটিকে দেবীর ভাই শাহ জঙ্গুলী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সিংহবাহিনী দেবীমূর্তিটিকে সাধারণত বনবিবির সখী নারায়ণী মনে করা হয়। কোনও মূর্তিতে বনবিবিকে বাহনহীন মুসলমান কিশোরীর বেশে কল্পনা করা হয়; তাঁর পরনে ঘাগরা, পায়ে জুতো, কানে কুণ্ডল, গলায় হার, মাথায় মুকুট ইত্যাদি অলংকার থাকে। আবার কোনও কোনও মূর্তিতে তাঁকে পদ্মের উপর দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখা যায়। ড. দেবব্রত নস্করের মতে, স্থানীয় শিল্পীরা নিজস্ব খেয়ালখুশি মতো এই মূর্তিগুলি গড়েন বলেই এগুলির মধ্যে এহেন ভিন্নতা দেখা যায়। তবে ১ মাঘের বাৎসরিক পূজার দিন এই সকল মূর্তিই বনবিবির মূর্তি হিসেবে পূজিত হয়।

চাঁপাতলার বনবিবির পূজা-হাজত করেন পুঁড়ির শুবেদালী মোল্লা। স্থানীয় হিন্দুরা এই পূজার আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা করেন। দেবীর পূজায় মন্ত্রতন্ত্রের কোনও বিধি নেই, নামাজের কলমা পড়ে ভক্তদের জন্য 'দোয়াদরিত মাঙা' হয়। ভক্তেরা ধূপ জ্বেলে এবং ফলমূল, বাতাসা, সন্দেশ ও দক্ষিণা দিয়ে পূজা করেন। গণ্ডি দেওয়া ও চন্দন মৃত্তিকা গ্রহণ পূজার একটি বিশেষ অঙ্গ। স্থানীয়দের বিশ্বাস, দেবী জাগ্রত এবং ভক্তের সকল প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই এখানে পূজা-হাজত দেন ও 'দোয়াদরিত' প্রার্থনা করেন। এছাড়া ভক্তেরা রোগমুক্তির জন্য দেবীর থানে ঢিল বেঁধে মানত করেন। পরে রোগমুক্তি ঘটলে থানে গণ্ডি দেওয়া, বাতাসা লুট, বুক চিরে রক্ত দেওয়া ইত্যাদি আচার পালন করা হয়। অধিক ফলনের জন্য মানত করলে খেতের প্রথম ফসল ধানের আঁটি বা বিচালি, মুলো, বেগুন ইত্যাদি থানে

দেওয়া হয়। আবার হাঁস-মুরগির ডিম থেকে বাচ্চা ফোটানোর জন্য মানত করে কৃতকার্য হলে পূজাস্থানে হাঁস-মুরগির বাচ্চা ছেড়ে দেওয়ারও রীতি আছে। এছাড়া জমি বা কৃষি যন্ত্রপাতি কিনে তা থেকে ভালো পরিষেবা পাওয়ার আশায় মানত করলে মানতপূর্তিতে ছলন ও বাজনা-সহ বনবিবির পূজা দেওয়া হয়।

চাঁপাতলার বনবিবির মেলার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল ঘুড়ি ওড়ানো ও ঘুড়ি লোটার প্রথা। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায় সরস্বতী পূজার দিন এবং পার্শ্ববর্তী কলকাতা ও শহরতলি অঞ্চলে বিশ্বকর্মা পূজায় ঘুড়ি ওড়ানোর প্রথা থাকলেও, চাঁপাতলায় স্থানীয় কিশোর ও যুবকেরা বনবিবির মেলা উপলক্ষ্যে ১ মাঘ দিনের বেলা এই আচার পালন করেন। ঘুড়ি ওড়ানো দেখতে এখানে প্রচুর দর্শনার্থীরও সমাগম হয়। রাতে গান, নাটক, যাত্রা ইত্যাদির আয়োজন করা হয়। মেলায় মনিহারি, লোহার কৃষি যন্ত্রপাতি, গৃহস্থালির জিনিসপত্র থেকে শুরু করে রেডিমেড পোষাক, মিষ্টি, ফুচকা, তেলেভাজা খাবার ইত্যাদির দোকান বসে। সারা রাত 'ফড়'-এর (জুয়া) আসর চলে।

ধোপাগাছির বিবি মার মেলা

বারুইপুর শহরের নিকটবর্তী ধোপাগাছিতেও ১ মাঘ বনবিবির বাৎসরিক পূজা ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলাটি 'বিবি মার মেলা' নামে পরিচিত। এখানে বিবি মার পূজা উপলক্ষ্যে পরিবার, পাড়া বা গ্রামভিত্তিক বনভোজন আয়োজিত হয়। বনভোজনে সাদা বেগুন ও আলুসিদ্ধ ভাত খাওয়া হয়। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ এই উৎসবে যোগ দেন। পূজা উপলক্ষ্যে দুশোরও বেশি বনবিবির 'ছলন' আসে। আশেপাশের গ্রামের মানুষজন এখানে দেবীর থানে পূজা-হাজত দেন এবং পূজা উপলক্ষ্যে মেলার আয়োজন করা হয়।

দুই বাংলার সুন্দরবনের ভেতরে বিভিন্ন জায়গায় অধিবাসীরা বনবিবির মন্দির স্থাপনা করেছেন। সজনেখালি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, দো বাঁকি অভয়ারণ্য ও দয়াপুর গ্রামে বনবিবির মন্দির চোখে পড়ে।

বনবিবি পালাগান হল একটি নাটকীয় অভিনয় ঐতিহ্য যা অবশ্যই দেবী বনবিবির পুজোর সঙ্গে যুক্ত। মালঙ্গি, মৌলে, বাউলে, নৌজীবী, শিকারী নামগুলির সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের বাঙালিরা কোনো না কোনোভাবে পরিচিত। দক্ষিণবঙ্গে সর্ববৃহৎ দ্বীপ সুন্দরবনকে ঘিরে এ নামগুলি বারবারই আবর্তিত হয়। পৌষ মাসের শেষ ও মাঘের পয়লায় বনবিবির পুজো হয়। ওই দিনই বনবিবি পালাও হয় সুন্দরবন ও তৎসংলগ্ন জায়গাগুলিতে। গ্রামবাংলার ইতিহাস সম্পর্কে খোঁজ নিলেই জানা যাবে, একদল পালাকার সম্প্রদায় এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রাম ঘুরে ঘুরে দেব দেবীদের গল্পের কথা শোনাতো গান গেয়ে গেয়ে, সুন্দরবনের প্রায় ১৮ টি জায়গার দেবী বনবিবির পালাও সেভাবেই প্রচলিত হয়েছিল নিম্ন বদ্বীপ অঞ্চলে। উল্লেখ্য পীর ফকিরদের বিভিন্ন গানের সমাগম হয়েছে বনবিবির পালায়। বনবিবির পালাগানে ঢোল, করতাল, বাঁশি, সানাই প্রমুখ বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

পালাগান দুরকমের হয় যথা:

অভিনয় পালা

পটপালা

অভিনয় পালায় বাদ্যযন্ত্র সহ কোরাস গানের মধ্যে দিয়ে দেব দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয় এবং পটপালায় পটের ছবি দেখিয়ে গান গাইতে গাইতে দেবীর মহিমা বর্ণনা করা হয়। পাঁচালির সুরে গান গাইতে গাইতে মানুষের দুঃখ কষ্ট এবং দেবীর মহিমা ফুটিয়ে তোলেন পালাকাররা।

বনবিবি-আর পালাগান, যে কোনো লোক পরিবেশনার ফর্মের মতো, সময়ের সাথে সাথে প্রকৃতিতে পরিবর্তিত হয়েছে। বনবিবি-র পালাগান এখন দুটি রূপে গড়ে উঠেছে - ঐতিহ্যবাহী বনবিবি-র পালাগান এবং সমসাময়িক বনবিবি-র পালাগান। ঐতিহ্যবাহী বনবিবি-র পালাগানকে আরও দুটি ধরণের উপস্থাপনায় শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে *:* একনি পালা এবং বনবিবি-র পালাগান। ' *একনি*' শব্দটি এসেছে ' *এক*' শব্দ থেকে , যার অর্থ 'এক'। একানি পালা হল একজন শিল্পীর একক পরিবেশনা যিনি গান করেন, গল্প বর্ণনা করেন এবং আখ্যানের কিছু অংশও অভিনয় করেন। প্রধান গায়ককে *গায়েন* বলা হয় , এবং সাধারণত *দোহার* বা সঙ্গী হয়। দোহার গান বাজায় এবং মাঝে মাঝে পারফরম্যান্সের সময় *গায়েনের সাথে* কথোপকথনে লিপ্ত হয়।

ঐতিহ্যবাহী বনবিবি-আর পালাগানের রূপটি ঐতিহ্যবাহী পালাগানের রূপকে অনুসরণ করে, যেখানে *দোহার* এবং *গায়েন* গান গায় এবং গল্প বর্ণনা করে। প্লটের বিকাশে গান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পালাগান লিপিটি মূলত তরল এবং ইম্প্রোভাইজেশনের জন্য জায়গা দেয় যা অভিনয়কারীকে পাঠ্যগুলিতে স্বতঃস্ফূর্ত সংযোজন করতে সক্ষম করে। এটি অ্যারিস্টোটেলিয়ান কাজ এবং দৃশ্যে বিভক্ত নয় এবং এটি আচার অনুষ্ঠানের একটি রূপ। অপেশাদার অভিনেতারা মূলত বনকর্মী যারা দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য পালাগান পরিবেশন করে।

সমসাময়িক পালাগানের রূপটি সমসাময়িক যাত্রা (বাংলার জনপ্রিয় লোকনাট্য) থেকে উপাদানগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা 19 শতকের ইউরোপীয় থিয়েটার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। সমসাময়িক বনবিবি-আর পালাগান এখন আর শুধুমাত্র আচার-অনুষ্ঠান নয়, বনবিবির পূজা করার জন্য করা হয়। পেশাদার অভিনেতা এবং অপেশাদার বনকর্মীরা সমসাময়িক বনবিবি-র যাত্রা পালাগান পরিবেশন করে। এটি সুন্দরবনের বাসিন্দাদের বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে তৈরি করা হয়। এটি এইভাবে শহুরে চিৎপুর যাত্রা অনুষ্ঠানের অনেক বৈশিষ্ট্যকে আত্মস্থ করেছে যা একটি প্রসেনিয়াম মঞ্চের মতো কাঠামোতে অনুষ্ঠিত হয়। প্লটটিও অভিনয় এবং দৃশ্যে বিভক্ত। যাত্রা অনুষ্ঠানের জনপ্রিয় চরিত্র যেমন বিবেক, বিশ্বকর্মা, ঝন্টুরাম এবং ঝন্টুরামকে স্ক্রিপ্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যাতে অনুষ্ঠানটিকে দর্শকদের মধ্যে আরও জনপ্রিয় করে তোলা হয়। তাই সমসাময়িক বনবিবি-র পালাগানকে বনবিবি-র যাত্রাপালা বা দুঃখে যাত্রাপালা নামেও অভিহিত করা হয়।

বনবিবির পালাগানের রচনা

বনবিবি-আর পালাগান জহুরানামায় উল্লিখিত বর্ণনার বাইরে যায় এবং স্থানীয় পুরাণ থেকে এর উপাদান আঁকে। গল্পের বর্ণনাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়:

- *জনমখণ্ড* বা জোয়ারের জমিতে বনবিবির জন্ম
- *নারায়ণী-র জঙ্গ* বা নারায়ণীর সাথে যুদ্ধ
- *দুখে যাত্রা* বা দুঃখের কষ্ট

জনমখণ্ড বা জোয়ারের জমিতে বনবিবির জন্ম

কিংবদন্তি অনুযায়ী, বনবিবি হলেন মক্কা থেকে আসা ইব্রাহিম ফকিরের (স্থানীয় নামে বেরাহিম) কন্যা। ইব্রাহিমের প্রথমা পত্নী ফুলবিবি নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি এক শর্তে স্বামীকে পুনরায় বিবাহের অনুমতি দেন। ইব্রাহিম বিবাহ করেন গুলালবিবিকে। এই সময় আল্লাহ্ বিশেষ উদ্দেশ্যে স্বর্গ থেকে বনবিবি ও শাহ জঙ্গলীকে গুলালবিবির সন্তান রূপে জন্মগ্রহণের নির্দেশ দিয়ে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। গুলালবিবি গর্ভবতী হলে ইব্রাহিম ফুলবিবির শর্তানুসারে তাঁকে বনভূমিতে ফেলে আসেন। এই বনেই বনবিবি ও শাহ জঙ্গলী জন্মগ্রহণ করেন। তাদের যত্ন নেওয়ার জন্য আল্লাহ্ স্বর্গ থেকে চারজন দাস প্রেরণ করেন। গুলালবিবি শাহ জঙ্গলীর হাতে বনবিবিকে রেখে চলে গেলেন। বনবিবি বনেই বড়ো হতে থাকেন। সাত বছর পর ইব্রাহিম নিজের ভুল বুঝতে পেরে দুই সন্তানসহ গুলালবিবিকে মক্কায় ফিরিয়ে নিয়ে যান।

নারায়ণী-র জঙ্গ বা নারায়ণীর সাথে যুদ্ধ

একবার প্রার্থনার সময় বনবিবি ও শাহ জঙ্গলী দু'টি জাদু-টুপি পেয়েছিলেন। ওই টুপির সাহায্যেই তাঁরা হিন্দুস্তানে আঠারো ভাটির দেশে (সুন্দরবন) চলে যান (অপর বর্ণনা অনুসারে, তাঁদের জিব্রাইলের আঠারো জনের দেশে আনা হয়েছিল)। সেখানে পৌঁছে শাহ জঙ্গলী প্রার্থনায় বসেন। আঠারো ভাটির দেশে সেই সময় দানবরাজ দক্ষিণরায়ের নিয়ন্ত্রণে ছিল। শাহ জঙ্গলীর প্রার্থনার শব্দ পেয়ে তিনি বন্ধু সনাতন রায়কে খোঁজ নিয়ে পাঠান। পরে সনাতনের বনবিবি ও শাহ জঙ্গলীর কথা শুনে দক্ষিণরায় তাঁদের এলাকা থেকে বিতাড়ণের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি যখন যুদ্ধে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর মা নারায়ণী তাঁকে বাধা দেন এবং নিজেই ভূত-প্রেতের সেনাবাহিনী নিয়ে বনবিবির বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাত্রা করেন। দীর্ঘ যুদ্ধের পর বনবিবি নারায়ণীকে পরাজিত করেন। কিন্তু করুণাবশত তিনি নারায়ণীকে রাজ্যের অর্ধেক ও পুত্রকে ফিরিয়ে দেন। এরপর নারায়ণীর সঙ্গে বনবিবির সখ্যতা স্থাপিত হয়।[৬] সুন্দরবনের অধিবাসীরা এখানকার জনবসতি অঞ্চলকে বনবিবির রাজ্য হিসেবে স্বীকার করলেও দক্ষিণরায়কে তাঁরা গভীর জঙ্গলের শাসক মনে করেন।

দুখে যাত্রা বা দুঃখের কষ্ট

বারিজহতি গ্রামে ধনাই ও মানাই নামে দুই 'মৌলি' (মধু-সংগ্রহকারী) বাস করত। তারা ছিল দুই ভাই। আঠারো ভাটির দেশের একটি 'মহলে' (ঘন জঙ্গল) মধ্য সংগ্রহের জন্য ধনাই সাতটি নৌকা নিয়ে এক অভিযানের ইচ্ছা প্রকাশ করে। কিন্তু মানাই তাকে বাধা দেয়। অবশেষে গরিব মেষপালকের ছেলে দুখেকে সঙ্গে নিয়ে ধনাই অভিযান করে। নৌকা ছাড়ার আগে দুখের মা দুখেকে বিপদে পড়লে বনবিবিকে স্মরণ করতে বলেছিলেন। ডাকাত রায়ের রাজত্বের অংশ কেন্দুখালির চরে পৌঁছে তারা দক্ষিণরায়কে উপঢৌকন দিতে ভুলে গিয়েছিল। তাই তিন দিন তারা মধু সংগ্রহে অসমর্থ হয়। তৃতীয় রাতে দক্ষিণরায় স্বপ্নে দেখা দিয়ে তাদের নরবলির নির্দেশ দেয়। দক্ষিণরায়ের সঙ্গে কিছু কথা-কাটাকাটির পর লোভী ধনাই মধু ও মোমের বিনিময়ে দুখেকে উৎসর্গ করতে রাজি হয়। তারপর প্রচুর পরিমাণে মোম ও মধু সংগ্রহ করে সে দুখেকে ফেলে রেখে গ্রামে ফিরে আসে। এদিকে বাঘের ছদ্মবেশে দক্ষিণরায় দুখেকে হত্যা করতে গেলে সে দেবীকে স্মরণ করে। দুখের প্রার্থনা শুনে বনবিবি ও তাঁর ভাই জঙ্গলী এসে উপস্থিত হন। দক্ষিণরায়কে পরাজিত করেন জঙ্গলী। পরাজিত দক্ষিণরায় খান গাজীর (গাজী পীর) আশ্রয় নেন। বনবিবি ও শাহ জঙ্গলী দক্ষিণরায়কে ধাওয়া করে খান গাজীর কাছে উপস্থিত হন। অবশেষে গাজী দক্ষিণরায়ের ক্ষতি না করার জন্য বনবিবিকে রাজি করান। পরিবর্তে গাজী দুখেকে সাতটি

মূল্যবান কার্টুলি দিয়েছিলেন এবং দক্ষিণরায় তাকে দিয়েছিলেন প্রচুর মো ও মধু। বনবিবির আদেশে তাঁর পোষাক মুরগিরা দুখেকে তার গ্রামে রেখে আসে। গ্রামে ফিরে দুখে বনবিবির পূজাকে জনপ্রিয় করে তোলে। পরবর্তীকালে সে ধনাইয়ের মেয়ে চম্পাকে বিয়ে করে এবং গ্রামের 'চৌধুরী' (প্রধান) হয়।

বাংলাদেশের বাগেরহাট জেলার সুন্দরবন অঞ্চলে বনবিবিকে নিয়ে একটি কিংবদন্তি প্রচলিত আছে:
এক সওদাগরের দুই সুন্দরী স্ত্রী ছিলেন। ছোটো বউয়ের চক্রান্তে সন্তানসম্ভবা বড়ো বউ গুলালবিবি সুন্দরবনে নির্বাসিতা হন। কয়েকদিন পর সেখানেই যমজ পুত্র-কন্যার জন্ম দিয়ে তার মৃত্যু হয়। সদ্যোজাত শিশু দু'টির কান্না শুনে বনের বাঘ, কুমির, হরিণ, অজগর, বানস সবাই ছুটে আসে। তারাই দুই ভাইবোনকে লালনপালন করে বড়ো করে তোলে। ছেলেটি বড়ো হয়ে বাঘের রাজা এবং মেয়েটি বনবিবি নামে পরিচিত হয়। স্থানীয় বিশ্বাসে এই বনবিবি হলেন মানুষের রক্ষাকর্ত্রী। তারা মনে করেন, বনের বাওয়ালি-মৌলেরা বাঘের মুখে পড়লে বনবিবির নাম স্মরণ করে মন্ত্র পড়ে আর সঙ্গে সঙ্গে বাঘও দৌড়ে পালিয়ে যায়। অদ্যাবধি স্থানীয় মানুষ বনে কাজে যাওয়ার আগে বনবিবির পূজা করে।

বর্তমানে বনবিবি-আর পালাগান, সময়ের সাথে সাথে বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। পৌরাণিক মৌখিক আখ্যানগুলি লিপিবদ্ধ, লিখিত এবং *জহুরানামা* আকারে মুদ্রিত হয়েছিল । বাংলার যাত্রাপালা অনেকাংশে প্রভাবিত করেছে পালাগানকে। সুন্দরবনে পর্যটনের আগমনে বনবিবির পালাগান আরও পরিবর্তিত হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে, সরকার বনবিবি-র পালাগানকে রাজ্য ও দেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ফোরামে প্রদর্শন করেছে। সুন্দরবনের পালাগান শিল্পীরাও অনেক সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছেন। আজ বনবিবি-র পালাগান সুন্দরবনে পর্যটন প্রচারের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে স্বীকৃত। বিনিময়ে পর্যটন যেভাবে পালাগান উপস্থাপন ও পরিবেশিত হয় তা প্রভাবিত করেছে। উদাহরণস্বরূপ, বনবিবির পালাগান এখন পর্যটকদের জন্য ভ্রমণ যাত্রাপথের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। রাতারাতি পারফরম্যান্স এখন এক বা দুই ঘন্টার মধ্যে সংকুচিত হয় এবং পর্যটকদের জন্য শুধুমাত্র কয়েকটি পর্ব সঞ্চালিত হয়। এইভাবে, পূর্বে দেবতার উপাসনা করার একটি অনুষ্ঠান হিসাবে পরিবেশিত অনুষ্ঠানটি পর্যটনের ফলে বিনোদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হয়ে উঠেছে। পারফরম্যান্সের সবচেয়ে আকর্ষণীয় তথ্য হল যে ঐতিহ্যগত আচার-অনুষ্ঠান বনবিবি-র পালাগান এবং সমসাময়িক বনবিবি-র যাত্রাপালা বা পর্যটকদের জন্য ছোট পালা সবই একই সাথে বিদ্যমান।

পুতুল নাচ :

পুতুল নাচ হ'ল থিয়েটার বা পারফরম্যান্সের একটি রূপ যেখানে পুতুলের মাধ্যমে কাহিনী বলা হয়। ভারতের পশ্চিমবঙ্গে এবং বাংলাদেশে এটি প্রচলিত একটি প্রাচীন ঐতিহ্য। গ্রামীণ জনপদে আবালবৃদ্ধ বনিতার বিনোদনে বিশেষ করে শিশুদের বিনোদনে পুতুল নাচ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।
ভারতীয় উপ-মহাদেশে বিপিন পাল প্রথম পুতুল নাচের প্রচলন করেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার তিতাস নদীর কূল ঘেঁষে গড়ে ওঠা জনপদে কৃষ্ণ নগর নামে পল্লীতে বিপিন পালের জন্ম। বিপিন পাল তৎসময়ে সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় পৌরানিক কাহিনী অবলম্বন করে পুতুল নাচ করতেন বলে জানা যায়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জনপদে আরো কয়েকজনের নাম জানা যায়, তারা হলেন জেলার কৃষ্ণ নগর গ্রামের গিরীশ আচার্য্য, মো. তারু মিয়া, ব্রাহ্মণ বাড়িয়া শহরের মেন্ডা বা মেরুড়া এলাকার ধন মিয়া, কালু মিয়া, মো. রাজ হোসেন ও পৌর শহরের কাজীপাড়া এলাকার শরীফ মালদার। ধন মিয়ার পুতুল নাচ দলের নাম ছিলো রয়েল বীনা অপেরা। ধন মিয়া পুতুল নাচ দল দেশে বিদেশে ব্যাপক সুনাম অর্জন করেছে। এ ছাড়াও সুমী বীনা পুতুল নাচ ঝুমুর পুতুল নাচ দল পুতুল নাচ প্রদর্শন করে চলেছে বলে জনশ্রুতি রয়েছে। যতোদূর জানা যায়, পৌরানিক কাহিনী অবলম্বনে পরিচালিত পুতুল নাচ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জনপদের এক ঐতিহ্য। বছরের বিশেষ সময়ে মেলা পল্লীতে পুতুল নাচ প্রদর্শন হয়ে থাকে। শিল্প ও বাণিজ্য মেলায় পুতুল নাচ হয়ে থাকে

পুতুল নাচের পুতুলগুলি সাধারণত চার ধরণের হয়ে থাকে: তারের পুতুল, লাঠিপুতুল, বেণীপুতুল ও ছায়াপুতুল। তারের পুতুল সূক্ষ্ম তার বা সুতার সাহায্যে এবং লাঠিপুতুল লম্বা সরু লাঠির সাহায্যে নাচানো হয়; আর দুই বা ততোধিক পুতুল যখন একসঙ্গে বেঁধে হাত দিয়ে নাচানো হয় তখন তাকে বলে বেণীপুতুল।

যেকোনো গল্প বা কাহিনী অবলম্বনে পুতুলগুলি দর্শকদের সামনে উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন চরিত্র রূপায়িত করে। চরিত্রানুযায়ী পোশাক-পরিচ্ছদ, রূপসজ্জা এবং নানাবিধ উপকরণ সংযোজন করে পরিচালক পুতুলের অভিনয়শৈলী তুলে ধরেন। মানুষের মতোই পুতুলগুলি হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, রাগ-দুঃখ ইত্যাদির অভিনয় করে। সাধারণ নাটকে স্থানের সীমাবদ্ধতা থাকলেও পুতুলনাচে তার বিস্তৃতি অনেক। জলের প্রাণী, আকাশের পাখি, ডাঙ্গার মানুষ, বনের পশু সবই কাহিনীর প্রয়োজনে একমঞ্চে এক সঙ্গে অভিনয় করে। নির্বাক পুতুলসহ সব প্রাণীই নিজস্ব আচার-আচরণের পাশাপাশি মানুষের ভাষায় কথা বলে। ফলে পুতুলনাচ হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত ও আনন্দময় এবং সব বয়স ও শ্রেণীর দর্শকরা তা সানন্দে উপভোগ করে।

বিশ শতকে আধুনিক শিল্পকলা হিসেবে পুতুলনাচ স্বীকৃত হয় এবং টেলিভিশন আবিষ্কারের পর তা বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা লাভ করে। চারু ও কারুকলা শাখার প্রায় সব কয়টি ফর্মের ব্যবহার ও প্রয়োগ একে টোটাল আর্ট ফর্মের পর্যায়ে উন্নীত করেছে।

গল্প, কবিতা, নাটক, অভিনয়, গান, নৃত্যকলা, ভাস্কর্য এবং অন্যান্য দৃশ্যমান আর্টের সার্থক মিলন ঘটেছে পুতুলনাচে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পুতুলনাচ একটি পুরাতন শিল্পকলা হিসেবে পরিচিত। ইউরোপে পুতুলনাচের সবচেয়ে প্রাচীনতম ধারক জার্মানি। মধ্যযুগে ইটালিতে ‘পুলসিনেলো’ নামে আবির্ভাব ঘটে সুতা পাপেটের, ফ্রান্সে যার নতুন নাম হয় ‘পলসিনেল’। দস্তানা পাপেটের জনপ্রিয় চরিত্র হিসেবে জন্ম নেয় ‘পাঞ্চ’। এই পাঞ্চ চরিত্রের প্রতিরূপ দৃষ্ট হয় রাশিয়া, জাপান ও ব্রাজিলে। জার্মানি ও সুইডেনে পাঞ্চের নাম ‘কাসপার’, হল্যান্ডে ‘ইয়ান ক্লাসেন’ এবং হাঙ্গেরি ও রোমানিয়ায় ‘ভাসিলচে’। এছাড়াও মিশর, চীন, কোরিয়া, ফিলিপাইন, মায়ানমার, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং শ্রীলঙ্কায় পুরানো ও আধুনিক ধারার পুতুলনাচের অস্তিত্ব বিদ্যমান। ভারতের পশ্চিমবঙ্গে ক্যালকাটা পাপেট থিয়েটার, পিপলস থিয়েটার, ডলস থিয়েটার এবং বর্ধমান পাপেট থিয়েটার আধুনিক ধারায় পুতুলনাচের চর্চা চালিয়ে যাচ্ছে।

বাংলায় পুতুলনাচের প্রায় হাজার বছরের ঐতিহ্য রয়েছে। এখানে তারের পুতুল, লাঠিপুতুল ও বেণীপুতুল এই তিন ধরণের পুতুলনাচের প্রচলন আছে। এসব পুতুল তৈরি করা হয় শোলা এবং হালকা কাঠ দিয়ে। তাতে কাপড় ও বিভিন্ন অলঙ্কার পরানো হয়। এক সময় হিন্দু-সম্প্রদায়ভুক্ত পেশাজীবী পুতুল-নাচিয়ে দল গ্রামে-গঞ্জে পুতুলনাচ প্রদর্শন করত এবং তারাই

বংশপরম্পরায় ঐতিহ্যবাহী এই শিল্পমাধ্যমটিকে বাঁচিয়ে রাখে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কয়েকটি দল পুতুলনাচের প্রাচীন ধারাকে আজও ধরে রেখেছে। এখন অনেক পেশাদার শিল্পী ধর্মনিরেপেক্ষভাবে পুতুলনাচের দল গঠন ও পরিচালনা করছেন।

বাংলাদেশে তারের পুতুল ও লাঠিপুতুলের চর্চাই বেশি হয়। এক্ষেত্রে শিল্পী দুহাতে সর্বোচ্চ তিনটি পুতুল ধরে সংলাপ বা সুরের তালে তালে পুতুলকে নাচান। পুতুলনাচে সাধারণত রাধাকৃষ্ণ, সীতাহরণ বা রামায়ণ-মহাভারতের অন্যান্য কাহিনী এবং লোকজীবনের বিভিন্ন কিসসা, পালাগান ইত্যাদি তুলে ধরা হয়। এছাড়া সমসাময়িক ঘটনাবলি, যেমন শিশু, নারী ও বয়স্ক শিক্ষা, সুখী পরিবার, দাম্পত্যজীবন, প্রেম-বিরহ, জামাই-শাশুড়ি ও বউয়ের কলহ ইত্যাদিও লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন মেলা ও লোকজ উৎসব-অনুষ্ঠানে পুতুল নাচের আসর বসে। এটি এখন লোকমনোরঞ্জনের একটি জনপ্রিয় মাধ্যম। পুতুল নাচে পুতুল নিয়ন্ত্রণ করাকে কেন্দ্র করে বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায় যথা -

Rod Puppet: রড পাপেট বা লাঠি পাপেটে পুতুলকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় নিচ থেকে। যিনি পুতুল গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করেন তার মাথার উপর পুতুলগুলি থাকে। এই পুতুলগুলির চোখগুলি টানা টানা হয় এবং সুন্দর রং এ সজ্জিত হয় এদের চোখ মুখ। পশ্চিমবঙ্গে এই ধরণের পুতুলকে ডাঙ্গের পুতুলও বলা হয়। লাঠি পুতুল গুলি বৃহদ আকারের এবং গোলাকৃতির হয়ে থাকে এবং মূলত কাঠ দিয়ে নির্মিত হয়।

Shadow Puppet: Shadow Puppet অথবা এই ধরণের পুতুল নাচে পুতুল তৈরী হয় টিন, কার্ডবোর্ড এবং চামড়া দিয়ে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে চামড়ার পরিবর্তে প্লাস্টিকও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আলো জ্বালিয়ে আলোছায়ার মধ্যে দিয়ে এই নাচ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এখানে মূলত ছায়ার মধ্যে দিয়েই পুতুল নাচ অনুষ্ঠিত হয়।

Gloves Puppet: Gloves Puppet বা হাত পুতুল বহুল প্রচলিত। এক্ষেত্রে পুতুলের মাথা এবং হাত কাঠ আবার কিছু ক্ষেত্রে মাটি দিয়ে তৈরী করা হয়। এক্ষেত্রে একসাথে দুটো পুতুল নাচানো সম্ভব ।

String Puppet: এক্ষেত্রে পুতুলকে উপর থেকে সুতো দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা হয় । এই ধরণের পুতুল নাচে পুতুল তৈরী হয় কাদামাটি, ন্যাকড়া, লোহার তার, শোলা , গোবর দিয়ে।

মূলত রামায়ণ, মহাভারত বা পৌরাণিক গাথায় পুতুলনাচের বিষয়বস্তু হলেও, বর্তমানে বিভিন্ন রাজনৈতিক অবস্থা, সরকারি প্রকল্প সমূহকেও পুতুল নাচের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরা হচ্ছে বাংলায়।

বাংলাদেশে ঐতিহ্যবাহী এই পুতুলনাচের পুনরুজ্জীবন ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন চিত্রশিল্পী ও নন্দনতাত্ত্বিক মুস্তাফা মনোয়ার। তিনি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পাপেট থিয়েটার নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রদর্শনী করছেন। তাঁর নেতৃত্বে এডুকেশনাল পাপেট ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (ইপিডিসি) পাপেটশিল্পী সৃষ্টি, কুশলীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দান, পাপেটের মাধ্যমে শিশু-কিশোরদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রতকরণ, দেশীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টির সঙ্গে নতুন প্রজন্মের পরিচিতিকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

আলকাপ (Alkaap):

অবিভক্ত বঙ্গদেশের মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের মুসলমান সম্প্রদায়ের নিজস্ব লোকসংগীত। মুর্শিদাবাদ ছাড়াও বীরভূম,মালদহ, বর্তমান বাংলাদেশের রাজশাহী বিভাগের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা ও বৃহত্তর রাজশাহীর বিভিন্ন অঞ্চলে এই গান ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এই গান পালা গান এরই একটি অঙ্গ। অনেকটা কবি গানের মতোই বিভিন্ন আসরে এই গান গাওয়া হয়ে থাকে। এইধরনের গানের প্রধান উপজীব্য হলো ছড়া ও গান। আলকাপ যে বিশেষ কারণে উল্লেখযোগ্য তা হলো মুসলমানদের এই সংস্কৃতিতে সাম্প্রদায়িক মিলনের সূত্র রয়েছে। লৌকিক জীবনের প্রেম-ভালোবাসা, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না নানান ধরনের বিষয় আলকাপ গানের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। তবে রাধাকৃষ্ণের কথা আলকাপ গানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। লৌকিক জীবন নিয়ে যে ছড়া আলকাপের গানে স্থান পায় তা সব সময় শ্লীল হয় না। গ্রাম্য জীবনের সহজ সরলতা এই গানের সহজ বিশেষত্ব। মুসলমান সমাজের বিশাল অংশের মধ্যে একসময় এই গান আদৃত হলেও ধীরে ধীরে আধুনিক সভ্য সংস্কৃতির চাপে এর প্রচলন কমে আসছে।

"আল" শব্দের অর্থ "কাব্যের অংশ" এবং "কাপ" শব্দের অর্থ "কাব্য"।[] আবার, 'আল' শব্দের একাধিক অর্থের মধ্যে একটি হল 'তীক্ষ্ণ', 'তীব্র' বা 'ধারালো'। অপরদিকে, 'কাপ' শব্দের একাধিক অর্থের মধ্যে একটি হল 'সং' — রঙ্গস্থলে বিকৃত আকারে বা অঙ্গভঙ্গিতে দর্শকের কৌতুককর হাস্যোদ্দীপক বিষয়ের বা সামাজিক কুৎসিত বিষয়ের প্রতিমূর্তি বা চিত্র। আলকাপে নাচ, গান এবং এই হাস্য-কৌতুকোদ্দীপক অভিনয়ের সংমিশ্রণ ঘটেছে।

এক-একটি আলকাপ দলে দশ থেকে বারো জন শিল্পী থাকেন। এঁদের নেতাকে বলে "সরদার" বা "গুরু"। দু বা তিন জন অল্পবয়সী শিল্পী থাকে, যাদের "ছোকরা" বলা হয়। এছাড়া এক বা দুই জন করে "গায়েন" (গায়ক), "দোহার", সম্মেলক গায়ক, বাজনাদার থাকে। আলকাপের পাঁচটি অংশ: "আসর বন্দনা", "ছড়া", "কাপ", "বৈঠকী গান" ও "খেমটা পালা"। অনুষ্ঠানগুলিতে গ্রাম্য সমাজ এবং সেই সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থা প্রতিফলিত হয়।

আলকাপ গান অন্যান্য গানের মত না। একটু আলাদা। গানের দলের প্রধানকে সরকার বা মাস্টার বলা হয়[] আর তার সাথে থাকে এক জনভাঁড় যাকে আলকাপের ভাষায় ‘‘কাপ্যাল’’ বলা হয়। আলকাপ গানে সরকার এবং কাপ্যালের চরিত্র সব সময় দুই ভাই হিসেবে দেখা যায়। এই দলে আরও থাকে দুজন পুরুষ মানুষ যারা গানের সময় মেয়ে সেজে নাচ- গান আর অভিনয় করে। লোকজন এদেরকে ‘‘ ছোকরা’’, ‘‘ ছুকরি’’, ‘‘ছুরকি’’ নামে ডাকে। গানের দলে থাকে কয়েকজন যন্ত্র বাদক। তারা বিশেষ করে ঢোলক, হারমোনিয়াম, ডুগি, তবলা, খঞ্জনি, বাঁশি ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে। সম্পূর্ণ গানের দল গানের আসরেই বসে থাকে। যন্ত্রীরা বসে থেকেই বাদ্যযন্ত্র বাজায় আর সরকার, কাপ্যাল, ছোকরা এবং আরও দুই একজন যারা অভিনয় করে তারা অভিনয়ের সময় আসরের মাঝখানে নির্ধারিত জায়গায় অভিনয় করে।

আলকাপ গানের আসর:

এই গানের আসর খুবই সুন্দর হয়ে থাকে। গ্রামের ফাঁকা জায়গায় বিশেষ করে উঠানে এই গানের আসর বসে। গানের দলের সবাই উঠানের মাঝখানে গোল হয়ে বসে এবং তাদের মাঝখানে একটা ফাঁকা জায়গা রাখে যেখানে তারা অভিনয় করে। আর সকল দর্শকের সেই গানের দলকে ঘিরে গোল হয়ে বসে। মহিলা দর্শকেরা পাশে একটু দূরে বসে। গানের আসরে আগে বিদ্যুতের অভাবে হ্যাজাগ বাতি ব্যবহার করা হত। এখন বিদ্যুতের আলো ব্যবহার করা হয়। সাথে হ্যাজাগও থাকে বিদ্যুৎ চলে গেলে ব্যবহার করা হয়। তবে বিদ্যুতের বাতির আলোর চেয়ে হ্যাজাগ ব্যবহারে আসরের ঐতিহ্য বেশি ফুটে উঠে।

আলকাপ গান বাংলাদেশের সংস্কৃতির একটি ঐতিহ্য। বহু আগে থেকে গ্রামীণ বাংলায় এই গান মানুষকে বিনোদন দিয়ে এসেছে এখন বিনোদন দিচ্ছে। মূলত আলকাপ গানের আয়োজন করা বাংলার হিন্দু ধর্মালম্বীদের পূজার সময় , গ্রামের মানুষের নতুন ধান মাঠ থেকে ঘরে তোলার পর। এছাড়া গ্রামের মানুষজন তাদের পারিবারিক কোন অণুষ্ঠান উপলক্ষেও গানের দল বায়না করে নিয়ে আসে। তবে বিশেষ করে পূজার সময় এই গানের আসর বেশি লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে দুর্গা পূজা , লক্ষী পূজা, শ্যামা পূজা , জগৎধাত্রী পূজায় এইসব গানের দল বায়না করে নিয়ে আসা হয়। আলকাপ গান মূলত শুরু হয় গভীর রাতে ও বিকেলে। অর্থাৎ দুপুরের পর বিশেষ করে তিনটা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত একটা পালা হয় এবং রাত ১১ টার পর থেকে আর একটা পালা শুরু হয় এবং শেষ হয়ে একেবারে সকালে। সারারাত ধরে এই গান চলে। বাড়ির উঠানে গানের দল গোল হয়ে বসে এবং মাঝখানে ফাঁকা জায়গা রাখে অভিনয় করার জন্য। দর্শকের গানের দলকে ঘিরে গোল হয়ে বসে। এই গানে সরকার অত্যন্ত বিচক্ষন ও বুদ্ধিমান হয়। তিনি পুরো গান মূলত পরিচালনা করেন। আলকাপ গানে সরকারকে অনেক শিক্ষিত হিসেবে ধরা হয়। আসলেই সরকার যিনি হন তিনি একজন শিক্ষিত মানুষ। কারণ তাকে অনেক বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে হয়। আর তার সাথে তার ভাই হিসেবে থাকে সেই ভাঁড় যে কাপ্যাল নামে পরিচিত। এই কাপ্যালকেও অনেক বিচক্ষন ও বুদ্ধিমান হতে হয়। তার কাজ দর্শককে হাসানো এবং সমাজের বিভিন্নও অসংগতিকে হাসি ঠাট্টার মাধ্যমে তুলে নিয়ে আসে এবং সেগুলো বর্জন করে ভালো কাজ করার পরামর্শ দেওয়া হয়। মাঝে মাঝে এই গান চলার সময় কোন একটি পালা (কাহিনী) পরিবেশন করা হয়। আলকাপ গানের ভাষা মূলত আঞ্চলিক। এই ক্ষেত্রে রাজশাহীর চাপাই নবাবগঞ্জ অঞ্চলের ভাষা ব্যবহার করা হয়। তবে গানের সরকার শুদ্ধ বাংলা ভাষায় কথা বলেন। কারণ তাকে শিক্ষিত হিসেবে দেখানো হয় আর তার ভাইকে (কাপ্যালকে) অশিক্ষিত হিসেবে দেখানো হয়। মূলত সরকার কাপ্যালকে বিভিন্নভাবে পরামর্শ দিয়ে সমাজের অসঙ্গতি তুলে নিয়ে এসে সেগুলো সমাধানে দিক নির্দেশনা দেয়। গানের সময় কাপ্যালকে তার ভাই " পটলা" , " মদনা" এমন বিশেষ ব্যঙ্গাত্মক নামে ডাকে। এই গানে দর্শকেরাও গানের দলের সাথে দোয়ার (একজন গানের কলি গাওয়ার পর সেটা সমবেতভাবে গাওয়া) ধরে। এই গানে মূলত গানের দল আর দর্শক দুই দলই বিনোদন লাভ করে। গানের সময় সরকারের হাতে একটি মোটা কাগজ সিলিন্ডারের মত করে প্যাঁচানো থাকে যেটা সরকার লাঠি হিসেবে ব্যবহার করে কাপ্যালকে পেটায়। আর কাপ্যালের হাতে চিকন ও পাতলা বাঁশের তৈরি একটা লাঠি থাকে যেটা সে সব সময় নিয়ে থাকে আর মাঝে মাঝে আসরের ব্যবহৃত টিনের ছাওনিতে আঘাত করে শব্দ করে। তবে এইভাবে টিনে আঘাত করার মধ্যেও এক ধরনের আর্ট বা শিল্প আছে। গানের শুরু ছোকরাদের নৃত্তের মাধ্যমে। ছোকরারা খেমটা ও ঝুমুর জাতীয় নাচ-গানে বেশ দক্ষ। তাদের এত সুন্দর নাচ দর্শকদের এতটাই মুগ্ধ করে যে মাঝে তারা ছোকরাদের প্রতি বিশেষ ধরনের শব্দ নিক্ষেপ করে, যেমন- " বাহ !! রে কইট্যামুখী (কৌটামুখী) !!" , "ও !! রে সায়লার মাও (শায়লার মা)!!" আসলে আলকাপ গান এত হাসি আর বিনোদনমূলক যে আমি এই লেখাটি লিখতে লিখতেই গানের আসরের কথাগুলো মনে করে হাসছি। দর্শকদের বাক্যবানে সাড়া দিয়ে ছোকরাও নাচতে নাচতে দর্শকদের কাছে এসে জড়িয়ে ধরে। মহিলা দর্শকেরা কেউ কেউ লাজ্জায় মুখে কাপড় দেয়। ছোকরারা এবং কাপ্যাল সহ যারা গান পরিবেশন করেন তারা কেউ কেউ পুরাতন হিন্দি ও বাংলা ছায়াছবির গান গায় ও নৃত্য পরিবেশন করে। গানের সাথে নাচের যা কম্বিনেশন সেটা সত্যিই দেখার মত তার সাথে দর্শকদের উত্তেজনা। সবকিছু মিলে ব্যপারটা এমন যে সরাসরি আসরে না গিয়ে দেখলে আমার এই লেখায় খুব একটা বিনোদন পাবেননা। তবে আমার কাছে ছোকরাদের খেমটা নাচ অসাধারণ লাগে। সবাই এমন নাচ নাচতে পারেনা। প্রথম নাচের শেষে সরকার মঞ্চে উঠে বোল বা ছড়া কাটে। যা সত্যি অসাধারণ ! ছড়া কাটার পর কাপ্যাল কে ডাকে, কইরে পটলা

কথায় আছিস , এইরকম করে কাপ্যাল তখন দর্শকের মধ্যে কোথাও দূর থেকে বিভিন্নভাবে ভাড়ামু করে উত্তর দেয়। আর বলে, আসছি দাদা। এসে দাদাকে প্রণাম করে। প্রণামের ভঙ্গিটাও দেখার মত। মাঝে সরকার তার হাতে থাকা সিলিন্ডার আকৃতির মোটা কাগজ দিয়ে কাপ্যালকে তার বেয়াদবির জন্য ঠাস ঠাস করে বাড়ি দেই। কাপ্যাল কখনও লাফায় আবার দর্শকের মধ্যে দৌড় দেয়। সরকার ও কাপ্যালের স্ত্রী থাকে। ছোকরারা তাদের স্ত্রী সেজে অভিনয় করে। তাদের রঙ্গরস আসরে জমে উঠে। তাদের রঙ্গরসের গানগুলো অত্যন্ত সুন্দর আর বিনোদনমূলক। যেমন- "তুই যে আমার, তুই যে আমার নতুন রেডিও" অথবা "তুই যে আমার নতুন নতুন ট্রানজিস্টার"। এইগানগুলো কাপ্যাল তার স্ত্রীর সাথে গায়। আর সরকারের সাথে গানের মধ্যমেও মনের ভাব প্রকাশ করে। যেমন- "কি আর বলিব দাদা প্রাণে লাগে ভয়"। আর সরকারের ছড়া গান অতুলনীয়। ছড়া গানের মাধ্যমে সমাজের অসঙ্গতি তুলে ধরে। এই ভাবে রাত গভীর হয়। গান চলতেই থাকে। কেউ ঢুলে , কেউ ঘুমায়। এইভাবে সারারাত পাড়ি দিয়ে সবাই নিজ নিজ বাড়ি ফিরে। একসময় রাজশাহী অঞ্চলে এই গানের ব্যাপক প্রচলন ছিল। এই গানের দলে যারা থাকেন তারা এই গানের উপরই নির্ভর করে থাকেনা। কারণ সারা বছর এই গানের আয়োজন করা হয়না। তবে গানের মৌসুমগুলোতে এরা বিভিন্ন জায়গায় গান করার জন্য যায়। এই পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা এই পেশা বাদেও অন্যান্য পেশার সঙ্গে যুক্ত থাকেন। এই গান মূলত টাকা উপার্জনের মানুষজনদের বিনোদন দেওয়ার জন্যই বেশি প্রচলিত। এরা নিজে হাসে অপরকে হাসায়। তবে যারা এই পেশার সাথে অনেকদিন ধরে যুক্ত ছিলেন তারা দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছেন তাদের বয়সের ভারে। আর আমাদের ঐতিহ্যগুলো ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। এখন যারা এইসব গানের সাথে যুক্ত আছেন তারা হয়ত একদিন হারিয়ে যাবেন। তাদের সাথে এই ঐতিহ্যবাহী আলকাপ গান। কারণ কেউ থাকবে না এই গান করার জন্য। কোন গ্রামে হয়ত বসবেনা আলকাপ গানের আসর।

আলকাপ একটি দলীয় ও মিশ্র প্রকৃতির সঙ্গীত প্রদর্শন। এতে নাচ, গান, কথা, ছড়া, অভিনয় ইত্যাদির মিশ্রণ আছে। দশ-বারোজন শিল্পী নিয়ে আলকাপের দল গঠিত হয়। দলের প্রধানকে বলা হয় সরকার, ওস্তাদ বা মাস্টার। অন্যদের মধ্যে থাকে দু-একজন সঙদার, দু-তিনজন ছোকরা এবং বাকিরা দোহার ও বাদ্যকর। আলকাপ গানের প্রধান দুটি অংশ- গান গাওয়া ও বোল বা ছড়া কাটা। গানের বিষয়বস্তু সাধারণত রাধাকৃষ্ণলীলা ও অন্যান্য পৌরাণিক কথা, আর ছড়ার বিষয়বস্তু সমকালের সামাজিক ঘটনা। ছড়া কাটায় অনেক সময় দর্শকরাও অংশগ্রহণ করে। আলকাপের মূল আকর্ষণ ছোকরা নাচ ও গান। যাত্রা-পদ্ধতির সংলাপ, গান ও অভিনয়ের মাঝে মাঝে দর্শককে বিশ্রাম ও আনন্দ দেওয়ার জন্য ছোকরারা নটীবেশে আসরে প্রবেশ করে। সুদর্শন বালকদের তালিম দিয়ে ছোকরা বানানো হয়। তারা খেমটা ও ঝুমুর জাতীয় নাচ-গানে বেশ দক্ষ। গ্রামের তরুণ ও যুবকদের মধ্যে ছোকরারা এক ধরনের মাদকতা এনে দেয়।

তাদের চিত্তবিনোদনের মূল উৎসই ছোকরারা; তাই তারা রাতের ঘুম ও আরাম-আয়েস ত্যাগ করে আলকাপ গান শুনে রাত কাটিয়ে দেয়। সঙদাররাও ভাঁড়ামির মাধ্যমে লঘু হাস্যরস পরিবেশন করে দর্শকদের আনন্দ দিয়ে থাকে। এক কথায় আলকাপের পুরো আয়োজনই হলো রঙ্গ-ব্যঙ্গ-কৌতুকের মাধ্যমে গ্রামের তরুণ সমাজকে আনন্দ দান করা।

আলকাপ গানের মূলে থাকে ছয়টি অংশ। এগুলো হলো- জয়, আসর বন্দনা, দেশ বন্দনা ও অন্যান্য ছড়া, খ্যামটা, ফার্স বা দ্বৈত সঙ্গীত এবং আলকাপ পালা। আলকাপ গানের সূচনাতেই যন্ত্রসহযোগে মিউজিক বাজানো হয়। একে 'গদ' নামে অভিহিত করা হয়। এর পরপরই সমবেত কণ্ঠে দলের সরকার, দেবী সরস্বতী, গনেশ, কার্তিক প্রমুখের নামে 'জয়' দেয়া হয়। বন্দনার পর সরকার দাঁড়িয়ে দেশ বন্দনা ও ছড়াবন্দনা পরিবেশন করে থাকেন। দেশ বন্দনার পর যন্ত্রে প্রথমে খ্যামটার

সুর বাজানো হয়। খ্যামটার সুর অনুসরণ করে ছোকরা নৃত্য ও গান পরিবেশন করতে থাকে এবং এ নাচ-গান দর্শক-শ্রোতাকে এক পর্যায়ে অভিভূত করে তোলে। প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে দুজন শিল্পী ফার্স বা দ্বৈত গান পরিবেশন করে থাকেন। ছোকরার নৃত্য শেষ হলে একজন গায়ক বন্দনা ছড়া পরিবেশন করেন। আর এ ছড়া শেষ হলেই শুরু হয় অভিনয়সহ আলকাপ পালা। মূল আলকাপ গানের দুটি অংশ- গান গাওয়া ও বোল বা ছড়া কাটা। গানের বিষয়বস্তু সাধারণত রাধাকৃষ্ণলীলা ও অন্যান্য পৌরাণিক কথা, আর ছড়ার বিষয়বস্তু হল সমকালের সামাজিক কোনো ঘটনা। ছড়া কাটায় অনেক সময় দর্শকরাও অংশগ্রহণ করেন।

আলকাপ গান ও যাত্রাপালার মধ্যে বেশ পার্থক্য আছে। যাত্রা হলো অভিনয়প্রধান, আর আলকাপ নাচ-গান-তামাসা-প্রধান। যাত্রায় নিয়মিত পালা, চরিত্র, সংলাপ ও অভিনয় থাকে, কিন্তু আলকাপে সংলাপ ও অভিনয় সুনির্দিষ্ট কোনো আঙ্গিক নয়। উপস্থাপনীয় বিষয় সম্পর্কে একটা অস্পষ্ট ধারণা নিয়ে আসরের চাহিদা অনুযায়ী শিল্পীরা তা ফুটিয়ে তোলে। আলকাপের বিষয়বস্ত্ততে হাল্কা রঙ্গ-ব্যঙ্গ এবং নাচে-অভিনয়ে শরীরী আবেদন থাকায় এ গান সাধারণত লোকালয় থেকে দূরে মাঠে-ময়দানে অধিক রাতে পরিবেশিত হয়। বর্তমানে চলচ্চিত্র, টেলিভিশন ইত্যাদি বিনোদনের মাধ্যম গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ায় আলকাপ গানের জনপ্রিয়তা হ্রাস পেয়েছে এবং তা ক্রমশ বিলুপ্ত হওয়ার পথে।

যাত্রা:

বাংলার শক্তিশালী গণমাধ্যম হিসাবে যাত্রার স্বীকৃতি আছে। নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ি (১৮৮৯-১৯৫৯) বলে গেছেন, ‘আমাদের জাতীয় নাট্য বলিয়া যদি কিছু থাকে তাহাই যাত্রা।’ নাট্য বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক জিয়া হায়দার (১৯৩৬-২০০৮) বলেন ‘যাত্রাই হতে পারে আমাদের জাতীয় নাট্য।’ তবে দুঃখজনক যে, এ সম্ভাবনা আদৌ আমাদের দৃষ্টিগোচর হলো না।

রাষ্ট্র বরাবরই এ মাধ্যমটাকে ভয় পেয়েছে। তাই তো বিধিনিষেধ কিংবা কালাকানুন জারি করে সরকারিভাবে যাত্রার যাত্রাপথ বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। অথচ চিরায়ত সত্য এটাই যে, যাত্রা বা যাত্রাগান যুগে যুগে মানুষকে আনন্দ দিয়েছে। যাত্রার আসরে শোনা যেত বীর পুরুষদের কাহিনি, রাজা-বাদশাহর যুদ্ধের গল্প। লেখাপড়া না-জানা মানুষ যাত্রাগান শুনে অনেক কিছু শিখত। বুঝতে পারত। দেশপ্রেম ও অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উজ্জীবিত হতো হাজার হাজার মানুষ।

যাত্রাপালার জন্মকথা বড়ই চমকপ্রদ। গবেষকদের মধ্যেই মতভেদ দেখা যায়। যেমন বৈদিক যুগে বিভিন্ন স্থানে হিন্দু সম্প্রদায়ের দেব-দেবীর উৎসব হতো। ভক্তরা ঢাকঢোল নিয়ে মিছিলসহকারে নাচতে নাচতে-গাইতে গাইতে উৎসবে যোগ দিত। এক জায়গায় এক দেবতার বন্দনা ও লীলাকীর্তন শেষ করে আরেক জায়গায় আরেক দেবতার উৎসবে গান-বাজনার মিছিল নিয়ে যাত্রা শুরু করত। সূর্যদেবকে উপলক্ষ করে সৌরোৎসব, শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীতে কৃষ্ণযাত্রা, জগন্নাথ দেবের উদ্দেশে রথযাত্রা, দোল পূর্ণিমায় দোল যাত্রা এবং মনসামঙ্গলে ভাষান যাত্রা।’ এই যে, দেবদেবীদের উৎসবে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়া- এ ‘যাওয়া’ থেকেই ‘যাত্রা’ কথাটির উৎপত্তি বলে একদল গবেষক মনে করেন। ড. আশরাফ সিদ্দিকীর মতে শব্দটি দ্রাবিড় থেকে এসেছে। কারণ দ্রাবিড়দের মধ্যে এখনো এমন অনেক উৎসব আছে যাকে বলা হয় ‘যাত্রা’ বা ‘যাত্র।’ অন্যদল মনে করেন মধ্যযুগে এ দেশে যে পাঁচালী গান প্রচলিত ছিল, তা থেকে যাত্রার

উদ্ভব। ১৮৮২ সালে যাত্রা বিষয়ে গবেষণা করে সুইজারল্যান্ডের জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন আমাদের বিক্রমপুরের সন্তান নিশীকান্ত চট্টোপাধ্যায় (১৮৫২-১৯১০)। তিনি গবেষণায় আবিষ্কার করেছেন খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকেই কৃষ্ণ যাত্রার অভিনয় হতো। গবেষক গৌরাঙ্গ প্রসাদ ঘোষের মতে খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে সম্রাট অশোক তার অষ্টম শিলালিপিতে উৎসব অর্থে যাত্রা ব্যবহার করেছেন। বহু শতাব্দীব্যাপী উৎসবের ঘেরাটোপে বন্দি থাকার পর অভিনয় অর্থে যাত্রার প্রথম নিদর্শন দেখি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দেবের আমলে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দশকে। ১৫০৯ সালে অভিনীত পালাটির নাম 'রুক্মিণী-হরণ।' মহাপ্রভু স্বয়ং এই পালায় অভিনয় করেন। এটি ছিল শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য একটি উদ্দেশ্যমূলক ধর্মীয় প্রয়াস। তবে যাত্রাভিনয়ের ধারাবাহিক ইতিহাসের জন্য আমাদের আরও প্রায় আড়াইশ বছর অপেক্ষায় থাকতে হয়।

নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের সাড়ে তিন দশক পর ইংরেজশাসিত বঙ্গদেশে বাংলা নাট্যাভিনয়ের সূচনা করেন রুশ নাগরিক হেরাসিম লেবেডেফ। সে সময়ে গ্রামে-গঞ্জে রাত-ভোর করে দেওয়া যাত্রাগানের আসর বসত। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বীরভূম জেলার কেঁদুলী গ্রামের শিশুরাম অধিকারী যাত্রাগানে শোনালেন এক নতুন বার্তা। ভক্তি রসাত্মক ভাবধারার মধ্যে তিনি নিয়ে এলেন নতুন জাগরণ। যাত্রাগানের ইতিহাসে তিনি 'নবযাত্রার পথিকৃৎ' হিসাবে খ্যাত। শিশুরামের পর পরমানন্দ অধিকারী ও গোবিন্দ অধিকারী (১৭৯৮-১৮৭০) বিভিন্ন আঙ্গিকে, বিন্যাসে ও রূপকল্পে যাত্রাকে আরও সময়োপযোগী করে তোলেন। ভাব-বিন্যাসে এবং হৃদয়ের গভীরতায় কৃষ্ণযাত্রার নতুন রূপায়ণ দেখতে পাই উনিশ শতকের মাঝামাঝিতে এবং এ ধারার কৃতিত্বের অধিকারী নবদ্বীপের কৃষ্ণকমল গোস্বামী (১৮১০-১৮৮৮)। সে সময়ে ঢাকায় তার ৩টি পালা- স্বপ্নবিলাস, দিব্যোন্মাদ ও বিচিত্র বিলাস খুব সুনামের সঙ্গে মঞ্চায়ন হয়। এগুলো প্রকাশিত হয় ১৮৭২, '৭৩ ও '৭৪ সালে। উল্লেখ করা যায়, কৃষ্ণকমলের আগে আর কারও পালা মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয়নি এবং এ ৩টি যাত্রাপালা নিয়েই সুইজারল্যান্ড থেকে পিএইচডি ডিগ্রি নিয়েছিলেন নিশীকান্ত চ্যাটার্জি। বিশেষভাবে আরও উল্লেখ করতে হয় যাত্রা বিষয়ে গবেষণা করে বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যে তিনিই প্রথম ডক্টরেট হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' যেমন ঢাকার প্রথম নাটক তেমনি ঢাকা শহরের প্রথম যাত্রাপালা কৃষ্ণকমল গোস্বামীর স্বপ্নবিলাস (১৮৬১)। সুরুচিসম্পন্ন উন্নতমানের পালার পাশাপাশি উনিশ শতকের ৫০ ও ৬০-এর দশকে এক শ্রেণির সস্তা ও বিকৃতির প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল যাত্রাপালায়। সেই অশ্লীলতা ও ভাঁড়ামি থেকে যাত্রাকে মুক্ত করে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুললেন আরেক বিশিষ্ট পালাকার মতিলাল রায় (১৮৩২-১৯০৮)। বিভিন্ন পালায় তিনি কথকতা, সংলাপ, অভিনয় ও সংগীতের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছেন। গানের ছন্দ ও অনুপ্রাস ব্যবহারের কৌশল তিনি নিয়েছেন দাশরথির পাঁচালী থেকে। নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের (১৮৪৪-১৯১২) হাতে পৌরাণিক যাত্রাপালা নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে স্বতন্ত্র মাত্রা পায়। যাত্রা ও নাটকে তার ভাষারীতি যেমন নতুনত্বের দাবি রাখে, তেমনি এক সুললিত ছন্দ আবিষ্কার করে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। এটাই 'গৈরিশী ছন্দ' নামে পরিচিত। মিত্র, অমিত্রাক্ষরের সঙ্গে গৈরিশী ছন্দের ব্যবহারও যাত্রায় অনেকদিন ছিল।

১৮৭২ সালে প্রথম কলকাতায় জাতীয় রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা। এর দু'বছর পর ১৮৭৪ সালে আত্মপ্রকাশ ঘটে বরিশালের মাচরঙ্গের নট্ট কোম্পানি যাত্রা পার্টির। এটিই অবিভক্ত বাংলাদেশে প্রথম পেশাদার যাত্রাদল। স্বত্বাধিকারী ছিলেন দু'জন- শশীচরণ নট্ট ও বৈকুণ্ঠ নট্ট। ১৯৪০ সালের পর নট্ট কোম্পানি ভারতে চলে যায় এবং তাদের স্থায়ী ঠিকানা হয় ১৭, হরচন্দ্র মল্লিক স্ট্রিট, কলকাতা। ১৪৭ বছরের প্রাচীনতম এ দলটি প্রযোজনায়, পালা মঞ্চায়নে, নিত্য নতুন কলাকৌশলে এখনো বাংলাদেশের গৌরব বহন করছে। নট্ট কোম্পানির মা-মাটি-মানুষ, নটি বিনোদিনী, দেবী সুলতানা, অচল পয়সা- এ

পালাগুলোর লং প্লেয়িং রেকর্ড বাংলাদেশেও বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। বরিশালের বিল্বগ্রাম থেকে কালীচরণ নট্টের মালিকানায় আরেকটি নট্ট কোম্পানির জন্মকথা জানা যায়। সেটা ১৮৭৫ সাল।

সৃষ্টির অফুরন্ত সম্ভাবনা নিয়ে বিশ শতকে এগিয়ে চলল যাত্রার রথ। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে 'স্বদেশী যাত্রা' নিয়ে এলেন মুকুন্দ দাশ (১৮৭৮-১৯৩৪)। জন্ম বিক্রমপুরে, প্রতিষ্ঠা বরিশালে। বক্তৃতা ও দেশের গান স্বদেশী যাত্রার বৈশিষ্ট্য। ইংরেজের বিরুদ্ধে মুকুন্দ গাইলেন- 'ভয় কি মরণে রাখিতে সন্তানে/ মাতঙ্গী মেতেছে সমররঙ্গে/ সাজরে সন্তান, হিন্দু মুসলমান/ থাকে থাকিবে প্রাণ/ না হয় যাইবে প্রাণ।' এমন উদ্দীপনামূলক ভাষা ও শব্দ চয়নের মাধুর্যের আগে কোন যাত্রাপালায় দেখা যায়নি। মাতৃপূজা, কর্মক্ষেত্র পথ, পল্লিসেবা, সমাজ- মুকুন্দ'র এ পালাগুলো ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিল।

স্বদেশী যাত্রা থেকে ১৯৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জয়দুর্গা অপেরা। মাঝে আছে চাঁদপুরের উমানাথ ঘোষালের দল (১৯১৯), ঢাকার অক্ষয় বাবুর দল (১৯১০), ফরিদপুরের শংকর অপেরা পার্টি (১৯২৫), শরীয়তপুরের ভোলানাথ অপেরা (১৯৩০), চট্টগ্রামের শ্যামাচরণের দল (১৯৪০), বরিশালের মুসলিম যাত্রাপার্টি (১৯৩০), মানিকগঞ্জের বাসুদেব অপেরা (১৯৩৩) ও অন্নপূর্ণা অপেরা (১৯৪৪)। যাত্রার ঐতিহ্য সমুন্নত রাখার পাশাপাশি এসব দলে ঐতিহাসিক পালার রাজা-বাদশার কাহিনির জমজমাট অভিনয় হতো। মুসলিম যাত্রা পার্টির মালিক মোজাহের আলি শিকদার 'বিষাদ সিন্ধুর' বিভিন্ন পর্ব নিয়ে পালা লিখতেন। যেমন- এজিদ বধ, জয়নাল উদ্ধার, কাসেম-সখিনা প্রভৃতি। লোকের মুখে মুখে এগুলো 'ইমাম যাত্রা' হিসাবে পরিচিতি পায়। বরিশালের ইমাম যাত্রা থেকেই এ দেশে ইসলামী চেতনা ও মুসলিম আখ্যানভিত্তিক কাহিনির পালা মঞ্চায়ন শুরু।

'৪৭ পূর্বকালের খুব নামকরা দুটি দল ছিল মানিকগঞ্জের অন্নপূর্ণা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জয়দুর্গা অপেরা। মানিকগঞ্জের তরা গ্রামের কার্তিকচন্দ্র সাহা মাত্র দশ আনা পুঁজি নিয়ে অন্নপূর্ণা গঠন করেন। কলকাতার বহু শিল্পী এখানে অভিনয় করেছেন। উল্লেখযোগ্য পালা ছিল ধরার দেবতা, দাতা হরিশ্চন্দ্র, রাজনন্দিনী ও স্বামীর ঘর। জয়দুর্গা অপেরার জনপ্রিয়তা ছিল আকাশচুম্বী। এ দেশের বেশিরভাগ বিখ্যাত যাত্রাশিল্পী এই দলে অভিনয় করেছেন। বিশিষ্টদের মধ্যে রয়েছেন মন্মথ দত্ত, নয়ন মিয়া, চিত্ত পাল, বিমল বালা, দিগম্বর মালাকার, কালীপদ দাশ ও বনশ্রী মুখার্জি। পুরুষদের মধ্যে নারী চরিত্রে অভিনয় করতেন এমন কয়েকজন হলেন- নগেন নন্দী, ভাসান নন্দী, ব্রজেন নন্দী, লক্ষ্মী নন্দী। তারা সবাই 'রানি' হিসাবে খ্যাত ছিলেন। দলের পালা ছিল প্রতিশোধ, বর্গী এল দেশে, সাধক রামপ্রসাদ, সোনাইদীঘি ও প্রায়শ্চিত্ত। ১৯৭৬ সালে চিত্রপরিচালক মোস্তাফিজুর রহমানের পরিচালনায় এ দলের শিল্পী সমন্বয়ে 'বর্গী এল দেশে' পালাটি চলচ্চিত্রায়িত হয়। জয়দুর্গা অপেরার প্রতিষ্ঠাতা ও অধিকারি ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় যতীন চক্রবর্তী। অনেকে সম্বোধন করতেন 'কর্তা' বলে। উল্লিখিত দলগুলোর কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে অনেক আগেই। ঐতিহ্য ধরে রাখার উত্তরাধিকারীও এখন আর নেই।

যাত্রা : স্বাধীনতার আগে- তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৪৭ থেকে '৭১ এই ২৪ বছরে যাত্রাদলের সংখ্যা ছিল ২৬। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাম: সিরাজগঞ্জের বাসন্তী মুক্ত মঞ্চ নাট্য প্রতিষ্ঠান (১৯৫৪), ঝালকাঠির নাথ কোম্পানি যাত্রাপার্টি (১৯৫৫), চট্টগ্রামের বাবুল অপেরা (১৯৫৮), ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ভোলানাথ অপেরা (১৯৬০) ও ভাগ্যলক্ষ্মী অপেরা (১৯৬০), চট্টগ্রামের গীতশ্রী মুক্তমঞ্চ নাট্য প্রতিষ্ঠান (১৯৬৭), সাতক্ষীরার আর্য অপেরা (১৯৬৪), ময়মনসিংহের নবরঞ্জন অপেরা (১৯৬৬), ফরিদপুরের নিউ বাসন্তী অপেরা (১৯৯৬৮), গোপালগঞ্জের আদি দিপালী অপেরা (১৯৬৯), মানিকগঞ্জের অম্বিকা অপেরা (১৯৬৯) এবং জগন্নাথ অপেরা (১৯৭০)।

যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে প্রতিষ্ঠিত উত্তর জনপদের বিশাল ব্যয়বহুল দল বাসন্তীর মালিক ছিলেন সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর নিবাসী নারায়ণ দত্ত, যিনি 'ভগবান দত্ত' নামে সবার কাছে শ্রদ্ধেয় ছিলেন। বাসন্তী নাট্য প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে শাহজাদপুরে এক বিশাল শিল্পী সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। অমলেন্দু বিশ্বাসের সহধর্মিণী জ্যোৎস্না বিশ্বাসহ এ তালিকায় রয়েছেন পরিমল সাহা, বারীণ নন্দী, ফণী শীল, সন্ধ্যা সাহা, বিনয় চক্রবর্তী, অমিয় সরকার প্রমুখ। স্বনামধন্য যাত্রানট অমলেন্দু বিশ্বাসের যাত্রাজীবন শুরু হয় এই দল থেকেই ১৯৬১ সালে। কয়েকটি অভিনয় সমৃদ্ধ পালার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন- সোহ্রাব-রুস্তম, গৃহলক্ষ্মী, জালিয়াত, রাজসন্ন্যাসী, চণ্ডীমঙ্গল ও দোষী কে। যাত্রাজগতে প্রথম সামাজিক পালা দোষী কে বা নিষিদ্ধ ফল। রচয়িতা ব্রজেন্দ্র কুমার দে।

নাথ কোম্পানি যাত্রাপার্টি ছিল ঝালকাঠির ব্যবসায়ী গোপাল নাথের। দলে নামকরা দুটি পালা ছিল আভিজাত্য ও সম্রাট নাদিরশাহ। প্রধান অভিনেতা নিতাই দাশের জাদুকরি অভিনয়ের স্মৃতি এখনো প্রবীণ দর্শকের মনে পড়ে। চট্টগ্রামের বাবুল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা ১৯৫৪-তে। চার বছর পর অপেরা বা যাত্রাদল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। বাবুল অপেরার মালিক ছিলেন ঘাটফরহাদবেগ এলাকার ২০, ফতেহ আলী মাতবর লেনের আমিন শরীফ চৌধুরী। এ দেশে যাত্রাশিল্প আন্দোলনে বাবুল অপেরার কৃতিত্বই সর্বাধিক। যাত্রায় মহিলা শিল্পী নিয়ে আসার অসাধারণ কাজটি করেছে এ দল। যাত্রায় প্রথম নায়িকা মঞ্জুশ্রী মুখার্জি (১৯৩৭-১৯৮৮) এ দলের আবিষ্কার। অমলেন্দু বিশ্বাসের খ্যাতি, প্রতিপত্তি, নাম, যশ এখান থেকেই। কয়েকটি বিখ্যাত যাত্রাপালা রাহুগ্রাস, নাচমহল, চাঁদ-সুলতানা, পার্থসারথি, সত্যের জয়, রাজসন্ন্যাসী।
'৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের সময় বাবুল অপেরার 'একটি পয়সা' যাত্রাপালা সারা দেশে বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল। দলের আরও যেসব প্রতিভাধর নট-নটিকাদের অভিনয়ের কথা জানি, তারা হলেন : এমএ হামিদ, জাহানারা, হরেন বিশ্বাস, প্রতাপাদিত্য দত্ত, তুষার দাশ গুপ্ত, নজির আহমদ, মরু ঘোষাল, শ্যামল মজুমদার, মোকসেদ আলী (রানি) এবং জ্যোৎস্না বিশ্বাস। বাবুল অপেরার অধিকাংশ যাত্রাপালায় অমলেন্দু বিশ্বাসের পাশে নায়িকা ছিলেন মঞ্জুশ্রী। বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রের মতো যাত্রামঞ্চেও 'রোমান্টিক জুটি' কথাটির উৎপত্তি এ দু'জনের যুগল অভিনয়ের মাধ্যমে।

বাংলাদেশের যাত্রাদল এবং যাত্রাভিনয়ের ঐতিহ্যিক ধারায় শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে আছেন একজন প্রাতঃস্মরণীয় মহৎ ব্যক্তি, টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুরের দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা। যিনি আরপি সাহা নামে সমধিক পরিচিত। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে দেশীয় রাজাকারের সহায়তায় পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে পুত্র রবি সাহাসহ তার ওপর অমানুষিক নির্যাতন ও অপহরণ ঘটনায় যাত্রাশিল্পীদেরও অশ্রুসজল করে তোলে। বিগত শতাব্দীর '৬০-এর দশকে প্রতি বছর দুর্গাপূজার সময় মহাসমারোহে যাত্রাগান হতো আরপি সাহার পূজা বাড়িতে, আশানন্দ হলে। এখানে বায়না করা হতো শুধু প্রথম সারির জয়দুর্গা অপেরা, বাবুল অপেরা, বাসন্তী অপেরা ও ভোলানাথ অপেরার মতো জনপ্রিয় দলগুলোকে। নাট্যব্যক্তিত্ব মামুনুর রশীদ প্রথম জীবনে আরপি সাহার পূজাবাড়িতে একাধিক দলের যাত্রাগান শুনেছেন।
১৯৩০ সালে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম যাত্রাপার্টির ১৯৬৬ সালে নতুন নামকরণ হয় বাবুল যাত্রাপার্টি। ইমাম যাত্রার সঙ্গে অন্যান্য পালাও তখন মঞ্চস্থ হতে শুরু করেছে। দল মালিক মোজাহের আলী শিকদারের বড় ছেলে সিকান্দার শিকদার নতুন পালা লিখলেন 'বেদ কন্যা।' ৫৫ বছর আগে রচিত এ পালাটি এখনো একাধিক দলে এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমে মঞ্চায়িত হতে দেখা যায় (বর্তমান লেখকের যাত্রা জীবনের সূচনা ১৯৬৬ সালে এই দল থেকে)। ১৯৭০-৭১ যাত্রা মৌসুমে অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে ভোলানাথ অপেরার নৃত্যশিল্পী ছিলেন অঞ্জু ঘোষ, পরবর্তীকালে ঢাকার সিনেমার যৌনাবেদনময়ী

নায়িকা হিসাবে যার জনপ্রিয়তা ছিল তুঙ্গে। যাত্রাদলে অঞ্জু ও মঞ্জু দুই বোন ডুয়েট গাইতেন কিশোর কুমারের সেই হিট গানটি- 'এক পলকের একটু দেখা, আর একটু বেশি হলে ক্ষতি কি!' ময়মনসিংহের গণেশ অপেরা, বুলবুল অপেরা এবং নবরঙ্গন অপেরায় অভিনয় করতেন যাত্রাজগতের প্রথম দু'জন মুসলিম যাত্রাশিল্পী নেত্রকোনা জেলার হোগলা গ্রামের আশরাফ আলী এবং একই জেলার পূর্বধলা গ্রামের নয়ন মিয়া। '৭১-এর মার্চে সেই উত্তাল দিনগুলোতে নয়ন মিয়া ছিলেন বুলবুল অপেরায়। অমলেন্দু বিশ্বাস বাসন্তী অপেরায়। বর্তমান ঠাকুরগাঁও জেলার রানীশংকৈলে অভিনয়ের পাট চুকিয়ে পশ্চিম দিনাজপুরের রায়গঞ্জে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। উদ্দেশ্য, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যাত্রাভিনয়ের আয়োজন করা। এদিকে ২৫ মার্চ মধ্যরাতে ঢাকায় যখন বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়, ঠিক ওই সময় নেত্রকোনা জেলার হাইস্কুল মাঠে যাত্রানুষ্ঠান চলছিল বাবুল অপেরার। দক্ষিণ ভারতের আহমদনগরের সুলতানা চাঁদবিবির বীরত্বগাথা নিয়ে রচিত হয় ওই পালাটি। 'চাঁদবিবি' ছিল তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে মঞ্চস্থ শেষ যাত্রাপালা। এক প্রতিবাদী নারী চরিত্রের সংলাপ ছিল এরকম : 'জাহাঁপনা, কেন আপনার সৈন্যদলকে অতর্কিতে লেলিয়ে দিয়েছেন আমাদের ওপর? কত ঘরবাড়ি পুড়েছে, কত মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে, কত মন্দির-মসজিদ ধ্বংস হয়েছে খবর রাখেন কিছু?' অবাক, বিস্মিত শিহরিত যাত্রাশিল্পীরা। ঘটনার কী সমান্তরাল যোগাযোগ। পরদিন ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার বার্তাটি বিভিন্ন এলাকার মতো পূর্বধলায়ও এসে পৌঁছে। যাত্রানুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। 'সব প্রস্তুত, যুদ্ধের দূত হানা দেয় পূব দরজায়।' যাত্রাশিল্পীরাও ঝাঁপিয়ে পড়েন মুক্তি সংগ্রামে।

স্বাধীনতার ৫০ বছরে- মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে শুরু হলো গ্রুপ থিয়েটার নাট্যচর্চা। ১৯৭২-এ ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় ৬টি নাট্যদল- নাট্যচক্র, আরণ্যক, থিয়েটার, বহুবচন, প্রতিদ্বন্দ্বী, স্বরলিপি, আবাহনী এবং স্বদেশ সংস্কৃতি সংসদ। বিজয়ের আনন্দ উচ্ছ্বাসে একই বছরে আত্মপ্রকাশ করে কয়েকটি নতুন যাত্রাদল। পুরান ঢাকার পাটুয়াটুলী থেকে নিউ গণেশ অপেরা, যশোরের ফাল্গু–নি অপেরা, খুলনার ডুমুরিয়া থেকে শিরিন যাত্রা ইউনিট, ভদ্রা অপেরা, রংপুর থেকে নর্থবেঙ্গল অপেরা এবং নওগাঁর ভাটকৈ গ্রাম থেকে রূপশ্রী অপেরা। তবে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে '৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জিত হওয়ার কয়েক দিনের মধ্যে প্রথম একটি যাত্রাদলের জন্মের খবর পাওয়া যায়। ময়মনসিংহের শ্যামগঞ্জ থেকে গড়ে ওঠা দলটির নাম সবুজ অপেরা। প্রতিষ্ঠাতা একজন প্রকৌশলী দেলোয়ার হোসেন বাচ্চু। বাচ্চু মিয়া এখন প্রয়াত। তার স্বপ্ন সাধের সবুজ অপেরাও এখন আর নেই। ১৯৭৩ সালে চট্টগ্রামে থিয়েটার-৭৩-এর প্রতিষ্ঠা। এ বছরের ২৫ জানুয়ারি চট্টগ্রামেরই যাত্রাদল বাবুল অপেরা যশোরের সাগরদাঁড়ীর মধুমেলায় পরিবেশন করে বিধায়ক ভট্টাচার্য রচিত যাত্রাপালা 'বিদ্রোহী মাইকেল মধুসূদন।' এ মঞ্চায়নের নেপথ্যে যার বিশেষ ভূমিকা ছিল, তিনি যশোরের তদানীন্তন জেলা প্রশাসক আবদুস সামাদ। মধুসূদন চরিত্রে অভিনয় করে নটসম্রাট অমরেন্দু বিশ্বাস (১৯২৫-১৯৮৭) সদ্য স্বাধীন হওয়া এক নতুন দেশে নতুন সাংস্কৃতিক জাগরণ নিয়ে এলেন। এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তী সময়ে আমরা দেখি চট্টগ্রামের গীতশ্রী যাত্রা ইউনিটের লেনিন (১৯৭৪), মানিকগঞ্জের চারণিক নাট্যগোষ্ঠীর হিটলার (১৯৭৫), সিরাজগঞ্জের বাণীশ্রী অপেরার জানোয়ার (১৯৭৬), চট্টগ্রামের নবারুণ নাট্য সংস্থার নটি বিনোদিনী (১৯৭৬), সিরাজগঞ্জের বাসন্তী অপেরার মা-মাটি-মানুষ (১৯৭৯), মানিকগঞ্জের নিউ গণেশ অপেরার বিদ্রোহী নজরুল (১৯৭৯), খুলনার শিরিন যাত্রা ইউনিটের ক্লিওপেট্রা ও দস্যুরানী ফুলন দেবী (১৯৮৪) এবং ময়মনসিংহের নবরঙ্গন অপেরার চিড়িয়াখানা (১৯৮১) প্রভৃতি উন্নতমানের পালা। স্বাধীনতার প্রথম দশ বছরে ঐতিহ্যবাহী যাত্রাভিনয়ের যে গুণগত মান আমরা দেখলাম, এর ধারাবাহিকতা পরে আর রক্ষা করা যায়নি। ১৯৭৮-৭৯ সালে লাকী খান ও প্রিন্সেস কত্থা নামের

নর্তকিরা যাত্রার আসরগুলোতে অশ্লীলতার যে জোয়ার বইয়ে দিয়েছিল, সেই কলংক থেকে আজও এ শিল্পটি পুরোপুরি মুক্তি পায়নি। তখন থেকে বিকৃত রুচির প্রদর্শকরা যাত্রাকে ভিন্ন খাতে নিয়ে যায়। এ অবস্থা থেকে শিল্প শোভনরূপে যাত্রাকে প্রতিষ্ঠিত করার কোনো জাতীয় উদ্যোগ দেখা যায়নি ৫০ বছরেও। যাত্রা একটি পেশাদারি শিল্প। কিন্তু এ পেশাদারিত্ব বারবার ব্যাহত হয়েছে। প্রশাসনিক টালবাহানার কারণে যাত্রা প্রদর্শনীর সহজ অনুমতি ছিল না। এখনো নেই। কখনো কখনো নিষেধাজ্ঞা জারি করে গোটা শিল্পেরই কণ্ঠ রোধ করা হয়েছিল। বিগত ৫০ বছরের মধ্যে একমাত্র জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাড়ে তিন বছরের শাসনামল ছাড়া আর কখনো কোনো সরকারের আমলেই এ দেশে সুষ্ঠু পরিবেশে যাত্রা প্রদর্শনী হয়নি।

স্বাধীনতা-উত্তর যাত্রাশিল্পে একটি বড় অর্জন আমরা দেখতে পাই, এ সময়ে নাগরিক শিক্ষিত সমাজ ও যাত্রাশিল্পীদের মধ্যে একটা যোগসূত্র গড়ে উঠেছে। সংবাদপত্রেও যাত্রা জায়গা করে নিয়েছে, তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে যা ছিল অকল্পনীয় ব্যাপার। উনিশ শতকের নব্য ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি বাবু সমাজ যাত্রাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। আর বাংলাদেশের প্রগতিশীল সম্প্রদায় বিশেষ করে সংস্কৃতিজনরা এ ঐতিহ্যকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। তাই তো ১৯৯১ সালের নভেম্বরে শাসকগোষ্ঠী যাত্রার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলে জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী সোচ্চার কণ্ঠে বলেন 'যাত্রাকে ধ্বংস করা চলবে না।' রাজপথে যাত্রাশিল্পীদের মিছিলে শরিক হয়েছেন কামাল লোহানী, রামেন্দু মজুমদার ও মামুনুর রশীদের মতো ব্যক্তিত্বরা।

তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে গড়ে ওঠা বাবুল অপেরা, ভাগ্যলক্ষ্মী অপেরা, দিপালী অপেরা, নবরঞ্জন অপেরা এবং নিউ বাসন্তী অপেরার পালা মঞ্চায়ন অব্যাহত ছিল ১৯৮৫ পর্যন্ত। ৯০ দশকের শেষাবধি নিবু নিবু অবস্থায় হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় সিরাজগঞ্জের বাসন্তী নাট্য প্রতিষ্ঠান। '৪৭-এর আগের দল জয়দুর্গা অপেরা ও অন্নপূর্ণা অপেরার কার্যক্রম স্বাধীনতা পরবর্তী কয়েক বছর পর্যন্ত চালু ছিল। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে প্রথম ব্যয়বহুল দল চট্টগ্রামের নবারুণ নাট্য সংস্থা, প্রতিষ্ঠা ১৯৭৪ সালে। সর্বাধিক দল গঠনের একক কৃতিত্ব গোপালগঞ্জের ধীরেন বাগচীর। ১৯৭৫ সালে তিনি একাধারে ৫টি দলের মালিক হন। দলগুলো হচ্ছে দিপালী, ১নং দিপালী আদি দিপালী, নব দিপালী ও দীপ দিপালী অপেরা। ১৯৮০ থেকে ২০০০- এ বিশ বছরে বিভিন্ন দলে মঞ্চায়িত উল্লেখযোগ্য পালা হচ্ছে- বাবুল অপেরার নবাব সরফরাজ খাঁ, নিউ গণেশ অপেরার আঁধারের মুসাফির, দেবী সুলতানা, বলাকা অপেরার সুলতানা রাজিয়া, নবপ্রভাত অপেরার মা হলো বন্দি, সত্যনারায়ণ অপেরার শ্রীমতি বেগম, শিরিন যাত্রা ইউনিটের এ পৃথিবী টাকার গোলাম, অগ্রগামী নাট্য সংস্থার যৌতুক ও দেবদাস, চণ্ডী অপেরার শার্দুল জারাক খান, বিশে ডাকাত, প্রতিমা অপেরার জালিম সিংহের মাঠ, রাজমহল অপেরার কে ঠাকুর ডাকাত, নবরঞ্জন অপেরার মুঘল-এ আজম, তুষার অপেরার মানবী দেবী, বিরাজ বউ, চারণিক নাট্যগোষ্ঠীর রক্তস্নাত ৭১, সবুজ অপেরার হুকার ও গঙ্গা থেকে বুড়িগঙ্গা, আদি দিপালী অপেরার সংসার কেন ভাঙে ও মেঘে ঢাকা তারা, ভাগ্যলক্ষ্মী অপেরার ফরিয়াদ ও ফাঁসির মঞ্চে। একুশে শতকের দুই দশকে উল্লেখযোগ্য দল ও পালার তালিকায় রয়েছে- আনন্দ অপেরার ডাইনি বধূ, চৈতালী অপেরার জীবন এক জংশন, নিউ রঙমহল অপেরার দু'টুকরো বউমা, চ্যালেঞ্জার যাত্রা ইউনিটের জন্ম থেকে খুঁজছি মাগো, সিজার্স যাত্রা ইউনিটের চরিত্রহীন, দেশ অপেরার বাংলার মহানায়ক ও বিদ্রোহী বুড়িগঙ্গা, চারণিক নাট্যগোষ্ঠীর মহীয়সী কৈকেয়ী, লোকনাট্য গোষ্ঠীর বর্গী এল দেশে, ব্রহ্মপুত্র যাত্রা ইউনিটের বঙ্গবন্ধুর ডাকে, তিতাস অপেরার রক্তে রাঙানো বর্ণমালা, ডায়মন্ড যাত্রা ইউনিটের মায়ের চোখে জল ও জয়যাত্রার বীরকন্যা প্রীতিলতা। বিষয়বস্তুর দিক থেকে প্রতি বছরই দুই ধরনের যাত্রাপালা মঞ্চায়িত হয়ে আসছে। একটি নাটকীয় গুণসম্পন্ন

সংলাপ প্রধান মূল যাত্রা। যেমন- নবাব সিরাজউদ্দৌলা, মা-মাটি-মানুষ, সোহ্রাব-রুস্তম, জানোয়ার, একটি পয়সা। আরেকটি হচ্ছে রূপকথা কিংবা লোককাহিনিভিত্তিক সংগীত বহুল পালা। যেমন- রহিম বাদশা ও রূপবান কন্যা, লাইলী মজনু, আলোমতি-প্রেমকুমার, কমলার বনবাস, গুনাইবিবি প্রভৃতি। এসব পালা পরিবেশনকারী দলগুলোকে গীতিনাট্য বা ঝুমুর দল বলা হয়। বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে সংগঠিত এ শ্রেণির দলগুলো হচ্ছে ঢাকার বিশ্বেশ্বরী অপেরা, গাইবান্ধার সোনালী অপেরা, মুন্সীগঞ্জের শিল্পী অপেরা, নোয়াখালীর ভাগ্যলিপি অপেরা, লক্ষ্মীপুরের কেয়া যাত্রা ইউনিট এবং নারায়ণগঞ্জের আজাদ অপেরা। '৪৭ থেকে '৭১- এই ২৪ বছরে যাত্রাদল ছিল ২৬টি। স্বাধীনতার পরের বছর ৫০, ক্রমান্বয়ে ১০০, ১৫০- এভাবে হু হু করে ১৯৮৭-৮৮ মৌসুমে দলের সর্বোচ্চ সংখ্যা দাঁড়ায় ২১০-এ। অশ্লীলতার অজুহাতে তখন থেকে সরকারিভাবে বারবার নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। অনিশ্চয়তা আর মন্দা ব্যবসার কবলে দলের সংখ্যা কমতে থাকে। ২১০ থেকে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় দল সংগঠিত হচ্ছে প্রতি মৌসুমে ৩০-৪০টি করে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে প্রথম জাতীয় যাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি। ঘোষণাপত্রে বলা হয়, যাত্রাকে অবক্ষয়ের কবল থেকে রক্ষা এবং যাত্রাভিনয়ের মানের মূল্যায়ন কল্পে পরীক্ষামূলকভাবে প্রথম এ উৎসবের আয়োজন। এর পর ১৯৯৫ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে আরও ৪টি জাতীয় যাত্রা উৎসব এবং ২০১০ সাল পর্যন্ত কয়েকটি লোকনাট্যোৎসব এবং সপ্তাহব্যাপী যাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথম দুটি উৎসবে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার অর্জন করেন অমলেন্দু বিশ্বাস এবং শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হন শবরী দাশগুপ্তা। এর পরের উৎসবগুলোয় শ্রেষ্ঠ অভিনেতা স্বপন কুমার, সুলতান সেলিম। শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী রিক্তা সুলতানা ও চন্দ্রা ব্যানার্জি। বিভিন্ন পর্যায়ে পুরস্কৃত হন অশোক ঘোষ, মেরী চিত্রা, প্রতিমা সরকার, এম. সিরাজ মহীতোষ, অমল দত্ত, সরল খাঁ, মুক্তি রানী প্রমুখ। বর্তমান লেখক ১৯৯৩ সালে চতুর্থ যাত্রা উৎসবে বিশেষ যাত্রাব্যক্তিত্বের সম্মান অর্জন করেন। এর বাইরেও যাত্রাজগতে এমন কয়েকজন শক্তিমান গুণী অভিনেতা অভিনেত্রী রয়েছেন, যাদের অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এরা হলেন- মুকুন্দ ঘোষ, ননী চক্রবর্তী, ভিক্টর দানিয়েল, সাধন মুখার্জি, নরেশ ঘোষ, কল্পনা ঘোষ, পূর্ণিমা ব্যানার্জি, বিবেক গৌরাঙ্গ আদিত্য এবং হাবিব সারোয়ার। যাত্রাপালা বিষয়ে শিল্পকলা একাডেমির কার্যক্রম এখনো চলছে। এগুলো হচ্ছে 'ঈশা খাঁ'কে প্রত্নযাত্রায় রূপান্তর (২০১২), মুনীর চৌধুরীর 'রক্তাক্ত প্রান্তর'কে যাত্রাপালাকারে উপস্থাপন (২০১৩), 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ' শিরোনামের একটি অনুষ্ঠানে বিভিন্ন গুণীজনদের সঙ্গে প্রতি বছর অমলেন্দু বিশ্বাসকেও যুক্ত করা (২০১৬), দেশীয় পালা ও বিবেক নিয়ে যাত্রা উৎসবের আয়োজন এবং কয়েকজন শিল্পীকে সম্মাননা প্রদান (২০১৯)। বাংলাদেশ যাত্রাশিল্প উন্নয়ন পরিষদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার একটি যাত্রা নীতিমালা প্রণয়ন ও গেজেটভুক্ত করে ২০১২ সালের ৩০ আগস্ট। এরই আওতায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি গঠন করে যাত্রাশিল্প উন্নয়ন কমিটি। আগে যাত্রাদলের লাইসেন্স দেওয়া হতো ডিসি অফিস থেকে। ২০১৩ থেকে দল নিবন্ধন করছে শিল্পকলা একাডেমির এ উন্নয়ন কমিটি। তবে নিবন্ধিত দলগুলো জেলা প্রশাসন থেকে মাঠপর্যায়ে যাত্রানুষ্ঠান করার অনুমতি পাচ্ছে না। ৫০ বছরের যাত্রা পর্যালোচনায় এটি একটি বেদনাদায়ক চিত্র।

যাত্রাপালার ইতিহাসে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে আছেন এক মহান ব্যক্তি, নাম ব্রজেন্দ্র কুমার দে (১৯০৭-১৯৭৬)। তিনি সর্বমোট ১৮৯টি পালা লিখেছেন। শুধু তাই নয়, যাত্রার রচনা রীতিকে সংস্কার ও সমকালীন করেছেন। জন্ম বর্তমান শরীয়তপুর জেলার গংগানগর গ্রামে। বাংলাদেশে গত ৫০ বছরে বিভিন্ন জাতীয় যাত্রা উৎসবে, মেলায় পার্বণে এবং বিভিন্ন যাত্রাদলে তার রচিত যাত্রাপালাই সবচেয়ে বেশি অভিনীত হয়েছে। ছোটখাটো একটি তালিকা দেওয়া যেতে পারে। যেমন- দোষী কে, চণ্ডীমঙ্গল, সোহ্রাব-রুস্তম, বাঙালি, রাজ সন্ন্যাসী, চাঁদ সুলতানা, আঁধারের মুসাফির, বর্গী এল দেশে, চাষার

ছেলে, রাজনন্দিনী, স্বামীর ঘর, ধর্মের হাট, লীলাবসান, বিদ্রোহী নজরুল, নটি বিনোদিনী, করুণাসিন্ধু বিদ্যাসাগর। প্রথম জাতীয় যাত্রা উৎসব স্মরণিকায় তার সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'চারণ কবি মুকুন্দ দাশের পর এমন মৃত্তিকাসংলগ্ন আধুনিক যাত্রাপালা নির্মাতা এ দেশে একাধিক জন্মগ্রহণ করেননি।' তিনি 'যাত্রাপালাসম্রাট' ও লোকনাট্যগুরু' উপাধি পেয়েছিলেন। পরিমার্জন ও পরিশীলিত যাত্রাপালার যে ধারা ব্রজেন দে তৈরি করে গেছেন, তার অনুসারী হয়ে সেই চেতনায় এগিয়ে যাচ্ছেন বাংলাদেশের পালাকাররা। যাত্রার মানোন্নয়নে নিজের দায়বদ্ধতা থেকে পালা লিখছেন পশ্চিমবঙ্গের বিধায়ক ভট্টাচার্য, উৎপল দত্ত, অমর ঘোষ, মন্মথ রায় প্রমুখ যশস্বী নাট্যকাররা। আমাদের এখানে সেই মনমানসিকতা এখনো দেখা যাচ্ছে না। তবে কিছুটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন মামুনুর রশীদ। সবুজ অপেরার ব্যানারে 'ওরা কদম আলী' এবং চারণিক নাট্যগোষ্ঠীর ব্যানারে 'এখানে নোঙর' যাত্রামঞ্চে অভিনীত হয়। কিন্তু পুরোপুরিভাবে যাত্রার আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য না থাকায় নাটক দুটির পালা রূপান্তরে তেমন সফলতা আসেনি। এ বন্ধ্যাত্ব কাটিয়ে সময়ের দাবি মেটাতে গত শতাব্দীর ৮০'র দশক থেকে যাত্রার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাই মৌলিক যাত্রাপালা লিখে যাচ্ছেন। এ তালিকায় রয়েছে- পরিতোষ ব্রহ্মচারীর ক্লিওপেট্রা, ফুলন দেবী, নদীর নাম মধুমতি, জালাল উদ্দীনের রাজ্যহারা, কিছু খেতে দাও, আরশাদ আলীর গৌরীমালা, সতী কলংকিনী, সাহেব আলীর জংলী মেয়ে, ননী চক্রবর্তীর যৌতুক, দস্যু রানি, কলিকালের মেয়ে, এমএ মজিদের কমলা সুন্দরী, ঘুণে ধরা সমাজ। সাধন মুখার্জির চণ্ডালের মেয়ে, পৃথিবীর আত্মহত্যা, মহসীন হোসাইনের অমর প্রেম, সম্রাট কবি বাহাদুর শাহ্, মীরজাফরের আর্তনাদ, অতুল প্রসাদ সরকারের কারবালার কান্না, হাসানের বিষপান, মতিউর রহমানের রাজ সিংহাসন, যৌতুক হলো অভিশাপ, রাখাল বিশ্বাসের মানস প্রতিমা, রক্তাক্ত সমাজ। সেকেন্দার আলী শিকদারের হোসেনের অন্তিম শয্যা, সফিকুল ইসলাম খানের দায়মুক্তি, সভ্যতার লজ্জা, আমিনুর রহমান সুলতানের বিদ্রোহী বুড়িগঙ্গা, বিউটি বেগমের রাজনর্তকি ও মিলন কান্তি দে'র দাতা হাতেম তাই, বিদ্রোহী নজরুল, রক্তে রাঙানো বর্ণমালা। বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে রচিত পালাগুলো হচ্ছে শেখ সিদ্দিক আলীর সুন্দরবনের জোড়া বাঘ, জ্যোৎস্না বিশ্বাসের রক্তস্নাত ৭১, আমিনুর রহমান সুলতানের জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু, সফিকুল ইসলাম খানের জাতির পিতার আত্মদান, হারুন উর রশীদের জয় বঙ্গবন্ধু, সাধন মুখার্জির শতাব্দীর মহানায়ক, জাহাঙ্গীর হোসেনের একাত্তরের মহানায়ক, এমএ মজিদের ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ, সোনার বাংলা ও মিলন কান্তি দে'র বাংলার মহানায়ক ও বঙ্গবন্ধুর ডাকে।

এই একুশ শতকে বাংলার ঐতিহ্যবাহী যাত্রাপালার প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে উত্তরণ ঘটে। ২০০৪ সালে ড. সেলিম আল দীনের তত্ত্বাবধানে প্রথম জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যাত্রাবিষয়ক কর্মশালা শুরু হয়। ২০১৭ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে এ কার্যক্রম আবার চলে ড. ইউসুফ হাসান অর্কের পরিচালনায়, ২০০৮ ও ২০১৩ সালে ড. ইসরাফিল শাহীনের তত্ত্বাবধানে দীর্ঘদিন যাত্রার ক্লাস চলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ২০১৫ ও ২০১৬ সালে ড. কামাল উদ্দীন কবীরের তত্ত্বাবধানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং ২০১৯ সালে রহমান রাজুর তত্ত্বাবধানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যাত্রার প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এসব কর্মশালায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগের মেধাবী শিক্ষার্থীরা যাত্রাপালার অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন, যা ৫০ বছরের ঘটনা পঞ্জিতে যুক্ত হওয়ার দাবি রাখে।

২০২১ সাল। অনেক ঘটনা-দুর্ঘটনা, সুখ-দুঃখের স্মৃতি, ঝড়-তুফানের মধ্য দিয়ে এখন ৫০ বছরের মুখোমুখি আমরা। মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর প্রান্তে দাঁড়িয়ে স্বভাবতই আমাদের জিজ্ঞাসা- কী হবে যাত্রাশিল্পের? এ সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ কী? করোনার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত যাত্রাশিল্পীরা আবার নতুন করে বাঁচতে চায়। নির্মাণ করতে চায় নতুন যাত্রাপালা। যে পালায় থাকবে বঙ্গবন্ধুর কথা, স্বাধীনতার কথা। এর জন্য প্রয়োজন জাতীয় পৃষ্ঠপোষকতা। প্রয়োজন

সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা। ৫০ বছরের প্রাপ্তি- অপ্রাপ্তি, ব্যর্থতা হতাশা ধুয়ে মুছে নতুন অঙ্গীকারে শুরু হোক নতুন পথচলা। সম্মিলিত উচ্চারণ হোক যাত্রার জন্য চাই নতুন আলোকিত পথ। সামাজিক যাত্রাপথ।

জমিদার বাড়িতে পুণাহ্য, দুর্গাপূজা উপলক্ষে যাত্রাগান পরিবেশন করতো সৌখিন যাত্রাদল। কয়েক শতক আগে যাত্রা ও পালাগান উদ্ভব। যাত্রা ও পালাগানের উদ্ভবকাল ছিল সুষমামণ্ডিত। কালের যাত্রাপথে যাত্রাশিল্প আলোকোজ্জ্বল ধারায় শিল্প সংস্কৃতির অঙ্গনে স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।অতীত দিনে শারদীয় দুর্গাপূজা থেকে যাত্রাশিল্পের নতুন মৌসুম শুরু হতো। পূজার সপ্তমীর দিন থেকে চৈত্রের বাসন্তী পূজা পর্যন্ত এই ছয় মাসে যাত্রাদলের মৌসুম নির্ধারিত ছিল। আষাঢ় মাসের রথযাত্রা থেকে নতুন যাত্রা পালার রিহার্সেল শুরুর মাধ্যমে নতুন মৌসুমের প্রস্তুতি চলতো। শ্রাবণ মাসের মধ্যে শিল্পীচুক্তির পালা সংগ্রহ, নতুন পালা নির্বাচন, নতুন সাজ সরঞ্জাম সংগ্রহ ইত্যাদি কাজ শেষ করে ভাদ্র মাসে দলগুলো উঠে যেতো মহড়া বাড়িতে। এক-দেড় মাস দিনে-রাতে সমানে অভিনয় ও নৃত্যগীতের মহড়া চলতো। তারপর পূজার বায়না নিয়ে দলগুলো ছড়িয়ে পড়তো বিভিন্ন গ্রামে-গঞ্জে, পূজামণ্ডপে।
প্রসঙ্গত, নদীমাতৃক এই দেশ একসময় বর্ষাকাল থেকে শীতকাল পর্যন্ত খাল-বিল, নদী-নালা পানিতে ভরা থাকতো। তাই সে সময় যাত্রাদলের প্রধান কার্যালয় ছিল নৌকায়। বিশাল নৌকা যেন একটা গোটা বাড়ি। নৌকোগুলো এত পরিচিত ছিল, দেখেই বলা যেতো, কোনো দলের কোনোটি। নৌকাই বছরের সাত-আট মাস থাকতো ছিল যাত্রাশিল্পীদের ঘরবাড়ি। এক গঞ্জ থেকে আরেক গঞ্জের পথে নদীবক্ষে যাতায়াত, নৌকাতেই চলতো রিহার্সেল, গান-বাজনা। একসময়, সেই ব্রিটিশ আমলে, এমনকি স্বাধীনতার পরও বাংলাদেশে খুব ঘটা করে উৎসবের আমেজে দুর্গাপূজায় যাত্রাগানের আসর বসতো। ব্রিটিশ শাসিত বাংলায়, '৪৭-উত্তর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশে '৮০-র দশক পর্যন্ত শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রধান বিনোদনই ছিল যাত্রাগান।

বিগত শতকের ৪০ দশকের দিকে মহাসমারোহে দুর্গাপূজা হতো ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা ও গৌরীপুর জমিদারবাড়িতে। দুর্গাপূজার প্রধান আকর্ষণ ছিল যাত্রাগান। সপ্তমী থেকে নবমী এ তিন দিন মন্দির প্রাঙ্গণে বসতো যাত্রার আসর। দেশীয় দলের পাশাপাশি কলকাতার দলগুলোকেও এখানে বায়না করে আনা হতো।
ঢাকা শহরে তখনো নগরায়ণ জাঁকিয়ে বসেনি। কারওয়ান বাজারের কাছে পালপাড়া নামে একটি গ্রাম ছিল। বারোয়ারি দুর্গাপূজা হতো প্রাণবল্লভ পালের বাড়িতে। দিনের বেলা গ্রামোফোন বা কলের গানে বাজানো হতো নির্মলেন্দু লাহিড়ীর কণ্ঠে সিরাজউদ্দৌলার রেকর্ড, কিংবা কৃষ্ণচন্দ্র দে, পঙ্কজ মল্লিক প্রমুখের গান; রাতে হতো যাত্রাপালা। গত শতকের ৬০-এর দশকে টাঙ্গাইলের মির্জাপুরের রণদাপ্রসাদ সাহা বা আরপি সাহার পূজাবাড়িতে বায়না করা হতো চট্টগ্রামের বাবুল অপেরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জয়দুর্গা ও ভোলানাথ অপেরা, ঝালকাঠির নট্ট কোম্পানি এবং ময়মনসিংহের নবরঞ্জন অপেরাকে। প্রসঙ্গত, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের বছরে বিপ্লবী পালা 'একটি পয়সা'র যাত্রাপালা প্রথম মঞ্চায়ন হয় আরপি সাহার পূজাবাড়িতে। যাত্রাদলগুলো শুধু দুর্গাপূজার জন্যই সেকালে কয়েকটি 'দেবী দুর্গা', 'মহিষাসুর বধ', 'দক্ষযজ্ঞ', 'মহীয়সী কৈকেয়ী', 'রাবণ বধ', 'রামের বনবাস' ও 'রাজা হরিশ্চন্দ্র ' ইত্যাদি অভিনীত হতো। বাংলাদেশের বিভিন্ন পূজামণ্ডপে যেসব যাত্রাপালা ১৯৪২ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত প্রথম মঞ্চায়ন হয় নট্ট কোম্পানির আকালের দেশ, বাঙালি, সত্যনারায়ণ অপেরার গাঁয়ের মেয়ে, রঞ্জন অপেরার রাজনন্দিনী, বাসন্তী অপেরার সোহরাব-রুস্তম, বাবুল অপেরার রাহুগ্রাস, মা ও

ছেলে, গীতশ্রী অপেরার লোহার জাল, জয়দুর্গা অপেরার সাধক রামপ্রসাদ, নিউ বাবুল অপেরার রাজসন্ন্যাসী ও নবরঞ্জন অপেরার বাগদত্তা।

প্রতিবছর দুর্গাপূজায় যাত্রাগানের যে রমরমা আসর বসতো, কালে কালে তা পুরোপুরিই বন্ধ হয়ে গেছে। সেকালের জমিদাররাও নেই, নেই টাঙ্গাইলের মির্জাপুরের আরপি সাহা আর নেই ঢাকার কারওয়ান বাজারের কাছে পালপাড়া। সেকালের জয়দুর্গা, বাবুল অপেরা, ভোলানাথ অপেরা, নট্ট কোম্পানি, নবরঞ্জন অপেরা আজ আর নেই। এখন পূজামণ্ডপ প্রঙ্গণে ধুমধারাক্কা ডিজে গান বাজে যান্ত্রিক ইলেক্ট্রনিক বক্সে বা মাইকে। তার তালে যুবক-যুবতীরা লম্পঝম্প নৃত্য করে। সেকালের যাত্রাপালা দেখার আগ্রহ তারা কোথা থেকে পাবে! বর্তমানে ঘরে ঘরে টিভি চ্যানেলের সিরিয়ালের নাটক, মোবাইলফোনের নাটক গান সহজে উপভোগ করা যাচ্ছে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতাহীনতা, রুচিশীল দর্শকের অভাব, যাত্রাপালায় অশ্লীলতার কারণে বাংলার ঐতিহ্যবাহী যাত্রা ও পালাগানের অবক্ষয় নেমে এসেছে।
বাংলার যাত্রা শিল্প ইতিবৃত্ত জানতে হলে আমাদের অবশ্যই অতীতে ফিরে যেতে হয়। বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক মাধ্যম শ্রীচৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩) অনুভব করেছিলেন, বক্তৃতা করে বাংলার মানুষকে যা বোঝানো যাবে না, একবার যাত্রাভিনয় করে তা মানুষের মনে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব।

সাড়ে চার শ' বছর আগে শ্রীগৌরাঙ্গ যাত্রাশিল্পকে গৌরবান্বিত করেছিলেন তা দেখতে হলে তার ইতিহাস তুলে ধরা প্রয়োজন। শ্রীগৌরাঙ্গের বয়স মাত্র ১৪ বছর সে সময় বড়ু-চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচনা করেন, সময়টা ছিল ১৫০০ সালের দিকে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রভাবে শ্রীগৌরাঙ্গ তার গীতাভিনয়ে নিজস্ব অভিনয়পদ্ধতি সৃষ্টি করেছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও তিনি সংস্কৃত নাটকের ধ্রুপদ অভিনয়-পদ্ধতি গ্রহণ করেননি। চারদিকে দর্শক-শ্রোতা, মাঝখানে আসরে নৃত্য, গীত ও কথার মাধ্যমে তিনি ব্রজলীলা, রাবণবধ প্রভৃতি পালা পরিবেশন করেছেন। শোভাযাত্রা তিনি তার সহচরদের নিয়ে নেচে-গেয়ে কৃষ্ণলীলা প্রদর্শন করেছিলেন।

সত্যি কথা বলতে, যাত্রাগানের বিকাশ শুরু হয় ১৮ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। যাত্রাপালা উৎপত্তি থিয়েটার বা নাটকের আগে। নাটকের আগেই যাত্রার বিকাশ ঘটে। এ কারণে যাত্রার ঐতিহ্যকে প্রথমেই তুলে ধরতে হয়। যাত্রাশিল্প সুকুমারকলার মর্যাদায় অভিষিক্ত ছিল। ষোড়শ শতকে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রভাবে জন্ম নেওয়া কৃষ্ণযাত্রাই অধিকতর স্থায়ী এবং জনপ্রিয় হয়। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমের কেঁদুলি গ্রামের অধিবাসী শিশুরাম অধিকারী ১৮ শতকের মাঝামাঝি সময়ে কৃষ্ণযাত্রাকে শিল্পসম্মতভাবে পরিবেশন করে সুখ্যাত হন। তিনি 'কালীয়দমনযাত্রা'র প্রবর্তন করেন, যা পরিবর্তীকালে 'কৃষ্ণযাত্রা' নামে জনপ্রিয় হয়। কৃষ্ণযাত্রার পালাগুলোর মধ্যে কলঙ্কভঞ্জন, মানভঞ্জন, নৌকাবিহার, গোষ্ঠবিহার সুবলমিলন, যোগীমিলন, প্রভাসমিলন, মুক্তলতাবলী, কৃষ্ণকালী, ননীচুরি প্রভৃতি ছিল উল্লেখযোগ্য। এই পালাগুলো বিশেষভাবে দর্শকনন্দিত হয়েছিল।

প্রসঙ্গত, ১৮ শতকের শেষভাগে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের (১৭১২-১৭৬০) 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের কাহিনি অবলম্বনে রচিত বিদ্যাসুন্দর যাত্রা বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ওই সময় গ্রামের অশিক্ষিত আর অল্পশিক্ষিতদের পক্ষে ইংরেজদের প্রচলিত থিয়েটারের প্রতি আসক্তি ছিল না নানা কারণে। গ্রামগঞ্জে থিয়েটার করা ব্যয়সাধ্য ছিল। রাস্তাঘাট ছিল না, ছিল না

পয়সাকড়ি, ছিল না থিয়েটারের কাহিনি বোঝার ক্ষমতা। এ কারণেই ধর্মবিষয়ক কৃষ্ণযাত্রা ও রামযাত্রা দেখার আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে থাকে সাধারণ জনগণের মাঝে। সেটা ছিল উনিশ শতকের মাঝামাঝি। ইংরেজের প্রবর্তিত থিয়েটারের হাত থেকে যাত্রার ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে এগিয়ে আসেন সে সময়ের যাত্রার অন্যতম অধিকারী কৃষ্ণকমল গোস্বামীসহ অনেকেই। কৃষ্ণকমল গোস্বামী ১৮৬০ সালে তার রচিত স্বপ্নবিলাস ও দিব্যোন্মাদ পালার মাধ্যমে যাত্রাশিল্পে প্রাণ সঞ্চার করেন। তিনি বর্তমানের বাংলাদেশের নানা অঞ্চলে তার পালাগুলো পরিবেশন করে প্রশংসা লাভ করেন।

ক্রমবিবর্তনের ধারায় শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রম করে তৎকালীন বাংলার ঢাকাতে প্রথম যাত্রাপালা সীতার বনবাস হয়। এখানে বলে রাখা ভালো, সীতার বনবাস-এর কাহিনিকার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তারপর একরামপুর থেকে স্বপ্নবিলাস নামে একটি যাত্রা মঞ্চস্থ হয়, যা শহরে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। স্বপ্নবিলাস-এর সাফল্যের পর একরামপুর থেকে পরপর মঞ্চস্থ হয় রাই-উন্মাদিনী ও বিচিত্রবিলাস। নবাবপুরের বাবুদের তখন বেশ নামডাক। সময়টা ছিল ১৮৬০ সাল থেকে ১৮৭৫ সালের মধ্যে। ঢাকার সৌখিন যাত্রাদলের যাত্রাপালার নাম ছিল কোকিল সংবাদ। শহরে ছয়মাস ও গ্রামাঞ্চলে প্রায় একবছর ধরে কোকিল সংবাদ যাত্রাপালাটি মঞ্চস্থ হয়েছিল।

উনিশ শতকের শেষভাগে নওয়াবপুরের বসাক সম্প্রদায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাস অবলম্বনে একটি যাত্রা মঞ্চস্থ করে। এ দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে একরামপুরের অধিবাসীরা কৃষ্ণকমল গোস্বামী রচিত স্বপ্নবিলাস যাত্রা অভিনয় করেন। এই যাত্রা পরপর ছয় রাত্রি মঞ্চস্থ হয়। এই ঢেউ এবার গ্রামাঞ্চলেও গিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। নারায়ণগঞ্জ মহকুমার মোগরাপাড়ার যা ছিল প্রাচীন সোনারগাঁ'র অন্তর্গত, সৌখিন ব্যবসায়ীদের আর্থিক সাহায্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় পরপর দুই রাত স্বপ্নবিলাস-এর অভিনয় হয়েছিল। ঢাকার বাইরেও যাত্রা অভিনয় ব্যাপকতা লাভ করে। প্রথম যাত্রাভিনয় অনুষ্ঠিত হয় বরিশালে। দুর্গাদাস কর রচিত স্বর্ণশৃঙ্খল বইটি প্রকাশ করেন। বৃন্দাবনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একে নিয়ে যাত্রাপালা করেন। এ পালায় রাজকুমার দত্ত ছিলেন এর একজন প্রধান অভিনেতা।

এখন আমরা চোখ রাখতে পারি, গ্রামগঞ্জের যাত্রদলের প্রতি। ১৮৭০ সালের দিকে হাতেগোনা দু'তিনটি যাত্রা দল ছিল। বর্তমান কুষ্টিয়া জেলার খোকসায় একটি যাত্রাদল, যা মহেশ ঠাকুরের দল নামেই পরিচিত ছিল। পরে জানিপুরের গোপী মাস্টারের যাত্রাদলও বিভিন্ন স্থানে অভিনয় করে সুনাম অর্জন করে। কলকাতায় সাধারণ থিয়েটার হল প্রতিষ্ঠার পরেই শিলাইদহে যাত্রার দল নাট্যালয়ে রূপান্তরিত হয়ে প্রহাদ চরিত্র অভিনীত হলেও গোপীনাথ দেবের রাস ও দোলযাত্রায় প্রতি বৎসর গোপীনাথ-প্রাঙ্গণে শশী অধিকারী, মথুর সা প্রমুখের যাত্রা, মুকুন্দ দাসের স্বদেশিযাত্রা হতো। স্থানীয় লোকের থিয়েটারের চেয়ে যাত্রার প্রতি আকৃষ্ট ছিল বেশি। তার প্রমাণ মেলে উনিশ শতকের শেষভাগে বরিশাল, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ ও যশোর অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক যাত্রাদল গড়ে ওঠায়।

বরিশালের চারণ কবি মুকুন্দ দাসই প্রথম আনুষ্ঠানিক যাত্রাদল গঠন করেন। ১৯০৫ সাল বঙ্গভঙ্গ হয়। ১৯০৫ সাল বাংলার ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ বছর। সে বছর বাংলা ভাগ হয়। তখন সারা দেশে উত্তাল হয় বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন। বরিশালে অশ্বিনীকুমার দত্তের নেতৃত্বে 'স্বদেশবান্ধব সমিতি' বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখে। বরিশালের 'স্বদেশবান্ধব সমিতি'-র সভাপতি অশ্বিনীকুমার দত্ত আহ্বানে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুকুন্দ দাস সে বছরেই মাতৃপূজা নামে অভিনব

এক যাত্রাপালা রচনা করেন এবং নিজে দল গঠন করে গ্রামে-গ্রামে গান করে বেড়াতে থাকেন। তার এই দল 'স্বদেশী যাত্রাপার্টি' নামে খ্যাতি অর্জন করে। মাতৃপূজা ছাড়াও তিনি কর্মক্ষেত্র, পল্লীসেবা, সমাজ প্রভৃতি পালার মাধ্যমে স্বদেশি বক্তব্য প্রচার করে ব্রিটিশ সরকারের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ব্রিটিশ সরকার তার পালাগুলো নিষিদ্ধ করে তাকে কারারুদ্ধ করে।

ঢাকার বাইরেও যাত্রা অভিনয় ব্যাপকতা লাভ করে। প্রথম যাত্রাভিনয় অনুষ্ঠিত হয় বরিশালে। দুর্গাদাস কর রচিত স্বর্ণশৃঙ্খল বইটি প্রকাশ করেন। বৃন্দাবনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একে নিয়ে যাত্রাপালা করেন। এ পালায় রাজকুমার দত্ত ছিলেন এর একজন প্রধান অভিনেতা।

মুকুন্দ দাসের যাত্রাদলের অভূতপূর্ব সাফল্যে উদ্দীপ্ত হয়ে ঝালকাঠিতে ১৯০৬ সালে জন্ম হয় 'নাগ-দত্ত-সিংহ-রায় কোম্পানি'র। এ দলে মুকুন্দ দাসের পালা ছাড়াও অহিভূষণ ভট্টাচার্যের 'সুরথ উদ্ধার', ভোলানাথ ১৯০৭ সালে 'আদি ভোলানাথ অপেরা' গঠন করেন। ঢাকায় 'অয়বাবু' নামের এক যাত্রামোদী একটি যাত্রাদল খোলেন ১৯১০ সালে। এই দল 'অয়বাবুর দল' নামে পরিচিতি পায়। এ সময় নোয়াখালীতে 'কেষ্ট সাহার দল'ও খুব জনপ্রিয় হয়। যশোরের নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের যাত্রাদল 'নীলমাধবের দল' নামে খ্যাতি অর্জন করে। ১৯৩১ সালে ফরিদপুরের নবদ্বীপচন্দ্র সাহা 'শঙ্কর অপেরা পার্টি' এবং 'নবদ্বীপচন্দ্র সাহা যাত্রাপার্টি' নামে দুটি যাত্রাদল গঠন করেন। 'নবদ্বীপচন্দ্র সাহা যাত্রাপার্টি'তে অভিনয় করে সেকালে প্রভূত সুনাম অর্জন করেছিলেন সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তার জন্ম ১৮৮৪ সালে ফরিদপুরের লোনসিংহ গ্রামে। ১৯২৩ সালে তিনি যাত্রাশিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত হন।

হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের জয়লক্ষ্মী পালায় 'বলাদিত্য' চরিত্রে অভিনয়ের কারণে তিনি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। ১৯৩৪ সালে ফরিদপুরের সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'জাতীয় আনন্দ প্রতিষ্ঠান' নামে একটি যাত্রাদল গঠন করেন। তার ভাইপো পরেশনাথ মুখোপাধ্যায় দলের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বিন্ধ্যাবলী, লক্ষ বলি, আদিসূর, দাক্ষিণাত্য, তর্পণ, বঙ্গে বর্গী, রাখিবন্ধন, ছগনলাল, সপ্তমাবতার প্রভৃতি ছিল এই দলের জনপ্রিয় পালা। প্রত্যেক পালায় অভিনয় করতেন সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তিনি নব্যধারার অভিনয়কে প্রতিষ্ঠা দিয়ে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার স্বীকৃতি পান।
সে সময় চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের চন্দ্রনাথধামে শিবচতুর্দশী মেলায় যাত্রপালা অভিনীত হতো। ১৯৩৭-৩৮ সালে যাত্রা কলকাতার ভুটুয়া বালক সম্প্রদায়, রঞ্জন অপেরা, অর্ঘ্য অপেরা, ফরিদপুরের নড়িয়ার আদি ভোলানাথ অপেরা, ঢাকার নারায়ণগঞ্জের মথুর সাহা, নবদ্বীপ সাহার যাত্রাদল, বরিশালের নট্ট কোং প্রভৃতি পেশাদার যাত্রাদল আসর জমাতো মেলায়। সে সময় যাত্রাপালা ছিল বাজীরাও, শিবাজী, রূপসাধনা, বাংলার ছেলে, মায়াশক্তি, মান্ধাতা শুক্রাচার্য ইত্যাদি। অভিনেতাদের মধ্যে ছিলেন ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ, কালীদমন গুহঠাকুরতা, সুরেশ মুখার্জী, ফণি, মতিলাল, ফণি গাঙ্গুলি, নলিনী দাস গণেশ গোস্বামী, নলিনী দাস, ক্ষেত্র চ্যাটার্জী, গুরুপদ ঘোষ, সুনীল মুখার্জী,পঞ্চু সেন প্রমুখ। নারীচরিত্রে রূপদানকারীদের তখন রানী বলা হতো। সেই রানীদের মধ্যে রেবতী রানী, হরিপদ বায়েন, নিতাই রানী, সুদর্শনরানী, সুধীররানী, ছবিরানী প্রমুখ রানী সেজে অভিনয় করেন। ছেলেদের মেয়ে সাজিয়ে মেয়েদের ভূমিকায় অভিনয় করানোর অনেক আগে ১৯১৫ সালে মহিলা পরিচালিত প্রথম যাত্রাদল 'লেডি কোম্পানি' ঝালকাঠিতে গঠিত হয়। এর অধিকারী

ছিলেন শ্রীমতী বোঁচা নামের এক নারী। এটাই ছিল প্রথম মেয়েদের প্রথম যাত্রাদলে অংশগ্রহণ, তার আগে ছেলেরাই মেয়ে সাজতো।
মানিকগঞ্জের কার্তিকচন্দ্র সাহা ১৯৪৪ সালে গঠন করেন 'অন্নপূর্ণা যাত্রা পার্টি'। এ সময়ে দৌলতপুর থানার বিনোদপুরে 'কানাই-বলাই অপেরা পার্টি' নামের একটি সখের দল ছিল। তখনকার খ্যাতিমান যাত্রাশিল্পীদের মধ্যে সুধীররঞ্জন বসুরায়, গৌরগোপাল গোস্বামী, নীতীশচন্দ্র অধিকারী, আকালী হালদার প্রমুখের নাম শোনা যায়।

প্রসঙ্গত, বলতে হয়, ১৯৪৭ সালে গঠিত যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী'র 'জয়দুর্গা অপেরা'তে নৃত্যশিল্পী জ্যোৎস্নারানী দত্তের মাধ্যমে ছেলেদের মেয়ে সাজিয়ে অভিনয়রীতির ব্যতিক্রম ঘটে। কৌতুকাভিনেতা সূর্য দত্ত ছিলেন তার পিতা। সূর্য দত্তের আরো তিন মেয়ে মায়ারানী দত্ত, ছায়ারানী দত্ত, দয়ারানী দত্ত জয়দুর্গা অপেরাতে নাচগান ও অভিনয় করে মেয়েদের যাত্রা শিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার 'জয়দুর্গা অপেরা' খুবই আলোচিত ও নন্দিত হয়।

উল্লেখ্য, দেশভাগের পূর্বে প্রফেশনাল যাত্রাপার্টি ছাড়া সৌখিন যাত্রা দলে নারীরা অভিনয় করতো না। তখন শৈলেনবাবু শৈলরানী নামে, সুধাময়বাবু সুধাময়ী নামে বিনোদবাবুর নারীচরিত্রে অভিনয় করতেন। উজ্জল ও সেলিমের মতো বয়োঃসন্ধিক্ষণের সুদর্শন ছেলেরা ড্যান্সার হিসেবে যাত্রার প্রথম দৃশ্যের কনসার্টে অংশ নিতো। ভদ্রঘরের মেয়েরা নাটক বা যাত্রায় উৎসাহী হয়নি। বিখ্যাত যাত্রাদল 'নট্টকোম্পানি যাত্রাদল' ১৯২৪ সালে ঝালকাঠির বৈকুণ্ঠনাথ নট্টের হাতে জন্ম নেওয়া 'নট্টকোম্পানি যাত্রাপার্টি' দুই বাংলায় জনপ্রিয় দল ছিল ব্রিটিশ আমলে।

মুসলিম পরিচালিত প্রথম যাত্রাদল হলো 'মুসলিম যাত্রা পার্টি'। ১৯৩০ সালের পটুয়াখালীর মোজাহের আলী সিকদার চালু করেন 'মুসলিম যাত্রা পার্টি'। মোজাহের আলী সিকদার ১৯৬৬ সালে 'বাবুল যাত্রাপার্টি' নামের আরেকটি যাত্রাদল গঠন করেন। এক সময় 'বাবুল যাত্রাপার্টি' বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। এখানে উল্লেখ করতে হয় পাঠক 'বাবুল যাত্রাপার্টি' ও 'বাবুল অপেরা' নিয়ে বিভ্রান্তিতে পড়তে পারেন, তাই 'বাবুল অপেরা' সম্বন্ধে নিচে লিপিবদ্ধ করছি।

স্বনামধন্য 'বাবুল অপেরা' ১৯৫৮ সালে গঠিত হয়। 'বাবুল অপেরা'র অধিকারী ছিলেন চট্টগ্রামের আমিন শরীফ চৌধুরী। ১৯৬০ সাল থেকে এ দলে নারীশিল্পীরা অভিনয় করতে শুরু করে। এ সময়ে পরিচালক ছিলেন অমলেন্দু বিশ্বাস। নারীশিল্পী জ্যোৎস্না বিশ্বাস ও জয়শ্রী প্রামাণিক ছাড়া এ দলে পুরুষশিল্পী ছিলেন তুষার দাশগুপ্ত, ঠাকুরদাস ঘোষ, কালী দত্ত, ফণীভূষণ, অমিয় সরকার প্রমুখ। এটি মূলত 'বাবুল থিয়েটারে'র যাত্রা-রূপান্তর। বাবুল অপেরায় অন্য উদ্যোক্তারা ছিলেন সাদেকুন নবী, মলয় ঘোষ দস্তিদার, রুনু বিশ্বাস প্রমুখ। প্রখ্যাত নট অমলেন্দু বিশ্বাস ছাড়াও এ দলের শুরুতে শিল্পী হিসেবে ছিলেন সাদেক আলী, নাজির আহমেদ, সাধনা চৌধুরী, মঞ্জুশ্রী মুখার্জী, বেণী চক্রবর্তী, ঊষা দাশ, মকবুল আহমেদ, এমএ হামিদ, জাহানারা বেগম, শান্তি দেবী প্রমুখ। জাহানারা বেগম এ দেশের প্রথম মুসলিম নারীশিল্পী। অমলেন্দু বিশ্বাস জানিয়েছেন, 'বাবুল অপেরা এ দেশে নারী-পুরুষ সমন্বয়ে যাত্রাভিনয় প্রথার প্রচলন করে নিঃসন্দেহে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দেয়'। এ সাহসী নারীশিল্পীদের অন্যতম মঞ্জুশ্রী মুখার্জীর জন্ম চট্টগ্রামে। চট্টগ্রামের বাবুল থিয়েটারে ১৯৫০ সাল থেকে অভিনয় শুরু করেন। 'বাবুল থিয়েটার' 'বাবুল অপেরা' নামে রূপান্তর হলে মঞ্জুশ্রী মুখার্জী এ দলের নায়িকা হন। এর আগে কোনো নারী নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করেননি।

বাবুল অপেরাই প্রথম নারী-পুরুষ সম্মিলিত যাত্রাদল। নটসম্রাট অমলেন্দু বিশ্বাস এ প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী সম্পর্কে বলেছেন, 'একটানা চৌত্রিশ বছর নৃত্যগীতপটীয়সী যাত্রানায়িকা মঞ্জুশ্রী মুখার্জী চট্টগ্রামের ভ্রাম্যমাণ যাত্রাদল বাবুল অপেরার যাত্রামঞ্চে এ দেশের লক্ষ লক্ষ যাত্রারসিকের মন বিচিত্র নাট্যভাবনার রঙে-রসে আপ্লুত করেছেন'। বাবুল অপেরার মঞ্জুশ্রী মুখার্জীর অনবদ্য অভিনয় দেখার সুযোগ ঘটেছিল ষাটের দশকে যশোর টাউন হল ও শ্রীপুর পাইলট স্কুলের প্রঙ্গণে আমার কাকার সঙ্গে পাশাপাশি বসে। কোনো প্রকার অশ্লীলতার নাম গন্ধ ছিল না, যা আজকের দিনে কল্পনা করা যায় না। বাবুল অপেরার পরে নারীশিল্পী সংযোজনের দিক থেকে দ্বিতীয় দল 'বাসন্তী মুক্তমঞ্চ নাট্যপ্রতিষ্ঠান'।

চট্টগ্রামের সাতকানিয়ার ফকিরহাট গ্রামের তুষার দাশগুপ্ত খ্যাতিমান অভিনেতা। ১৯৫৪ সালে জয়দুর্গা অপেরায় যোগ দেন। এরপর তিনি গোকুলেশ্বরী অপেরা নামে একটি দল গঠন করেন। ১৯৫৭ সালে যান বাবুল অপেরায়। ১৯৬০ সালে অমলেন্দু বিশ্বাসের সহযোগিতায় তিনি বাসন্তী মুক্তমঞ্চ নাট্যপ্রতিষ্ঠানে যোগ দেন। পরে সৎসঙ্গ অপেরা নামে একটি দল তিনি গঠন করেন। তবে নিজের করা দুটি দলই সফল হয়নি। ১৯৭০ সালে গীতশ্রী অপেরায় কাজ করার সময়ে নবাগতা নায়িকা রীনা রাণীকে বিয়ে করেন। এ রীনা রাণীই পরবর্তীকালের জনপ্রিয় যাত্রানায়িকা শবরী দাশগুপ্ত। ১৯৭৪ সালে তিনি নিজের নামে তুষার অপেরা গঠন করেন। এ দল তাকে প্রতিষ্ঠা এনে দেয়। তিনি যাত্রামঞ্চে আধুনিক উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে নতুন প্রাণ সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন। দেশীয় পালা মঞ্চায়নের ব্যাপারে তিনি উদযোগী ছিলেন। পালাকার পরিতোষ ব্রহ্মচারী রচিত পালা ক্লিওপেট্রা, দস্যুরানী ফুলন দেবী এবং রূপান্তরিত পালা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিরাজ বৌ অভিনয়ের মাধ্যমে তিনি ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করেন। তুষার দাশগুপ্তের স্ত্রী শবরী দাশগুপ্তার জন্ম যশোরে। ১৯৭৮ ও ১৯৭৯ সালে তিনি পরপর দুবার বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি জাতীয় যাত্রা উৎসবে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার লাভ করেন। ক্লিওপেট্রা, দস্যুরানী ফুলন দেবী প্রভৃতি পালায় তিনি স্বীয় প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার 'জয়দুর্গা অপেরা'র ম্যানেজার গোপালকৃষ্ণ পরে ১৯৬০ সালে 'ভাগ্যলক্ষ্মী অপেরা' এবং ১৯৬২ সালে 'রয়েল ভোলানাথ অপেরা' গঠন করেন। গোপালকৃষ্ণের আদিনিবাস উড়িষ্যায়। তিনি বাংলাদেশের যাত্রাশিল্পের সমৃদ্ধি ঘটান। ময়মনসিংহের আবদুল হামিদ ১৯৬৬ সালে গঠন করেন 'নবরঞ্জন অপেরা'। ১৯৬৭ সালে গঠিত 'গীতশ্রী যাত্রা ইউনিটে'র অধিকারী ছিলেন চট্টগ্রামের গোপালচন্দ্র রুদ্র। ময়মনসিংহের আবদুল খালেক ভুঁইয়া একই বছর গঠন করেন 'বুলবুল অপেরা'। পরের বছর- ১৯৬৮ সালে ফরিদপুরের স্বপনকুমার সাহা 'নিউ বাসন্তী অপেরা' চালু করেন।

যাত্রাশিল্পের ক্ষেত্রে 'দীপালি অপেরা'র অবদান বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। ১৯৬৯ সালে গোপালগঞ্জের ধীরেন্দ্রকুমার বাকচী 'দীপালি অপেরা' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৯৭২ সালে 'আদি দীপালি অপেরা' এবং ১৯৭২ সালে ধীরেন্দ্রকুমার বাকচী ও তার স্ত্রী বনশ্রী বাকচীর সঙ্গে যৌথ মালিকানায় '১ নং দীপালি অপেরা' গঠন করেন। তিনি এ সময়ে 'নব দীপালি অপেরা' এবং 'দীপ দীপালি অপেরা' নামে আরো দুটি যাত্রাদল প্রতিষ্ঠা করেন। একই সঙ্গে পাঁচটি দলের অধিকারী হওয়া নিঃসন্দেহে যাত্রাশিল্পের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বনশ্রী বাকচীর পরিশীলিত অভিনয় দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল শ্রীপুর থানার রাধানগর স্কুল মাঠে। অভিনয়ের সঙ্গে বনশ্রীর সুরেলা কণ্ঠের গানে আমরা মুগ্ধ। এ সব বিখ্যাত যাত্রদলগুলোর অস্তিত্ব আজ আর নেই।

১৯৭০ সালে বাগেরহাটের পরিমল হালদার প্রতিষ্ঠা করেন 'জয়শ্রী অপেরা'। 'নিউ গণেশ অপেরা' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সালে। এর অধিকারী মানিকগঞ্জের গণেশচন্দ্র ঘোষ। হবিগঞ্জের লিপাই মিয়া একই বছরে গঠন করেন 'কোহিনুর অপেরা'। ময়মনসিংহে ঐতিহ্যবাহী দল 'সবুজ অপেরা' গঠিত হয় ১৯৭২ সালে। প্রথম অধিকারী নুরুল ইসলাম হলেও পরে দেলোয়ার হোসেন বাচ্চু এ দলটিকে জনপ্রিয় করেন। ১৯৭২ সালে নড়াইলের শেখ খলিলুর রহমান প্রতিষ্ঠা করেন

‘রঙমহল অপেরা’। দলটি স্বাধীনতার পরে বেশ সক্রিয় ছিল। নওগাঁর খগেন লস্কর একই বছর গঠন করেন ‘রূপশ্রী অপেরা’। মানিকগঞ্জের ডা. ব্রজেন্দ্রকুমারের ‘জগন্নাথ অপেরা’ ও ভানু সাহার ‘অম্বিকা যাত্রাপার্টি’রমরমা ছিল। তারপর থেকেই যাত্রাপালার অবক্ষয় শুরু হয়। আজ আর সেই সুদিন নেই।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

Banglapedia

Wikiwad

Banglanatok.in

onushilon.org

https://www.amalalojournal.com/bonbibir-palagan-16/

sahapedia.org

https://bengali-literature-culture.blogspot.com/2013/07/banglar-putul-nach.html?m=1

Chintasutra

Farzana Rinky, আলকাপ গান: বিষয়বস্তু ও পরিবেশনারীতি

Ashutosh Bhattacharya, Bangiya Lokosongeet Ratnakar, Dwitiyo Khondo

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

1.Asutosh Bhattacharyya, Bangiyo Lok Sangeet , 4 vols
2. Asutosh Bhattachryya, Banglar Lok Sanskriti
3. Asutosh Bhattacharyya, Banglar Lok Nritya
4. Barun Chakraborty, Lok Sankskriti Kosh
5.Hemanga Biswas, Loksangeet Samiksha
6.Sanat Kumar Mitra, Bangla Gramin Lok natok

সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী:

1. Write an essay on folk music of Bengal.
2. Discuss different folk dance and drama in the context of rural Bengal.
3. What is the history of Jatrapala in Bengal?

পর্যায়- ৪

একক- ১০-১১-১২

উদ্দেশ্য ঃ বর্তমান পর্যায়টির অধ্যয়ন করে ছাত্র-ছাত্রীরা ধর্ম ও জাদু, বাংলার ব্রতকথা ও বিভিন্ন লৌকিক দেবতা সম্পর্কে জানতে পারবে।

ধর্ম ও জাদু ঃ

নৃতত্ত্ববিদ টাইলর ধর্মে'র উদ্ভব সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গিয়ে অ্যানিমিজম (Animism/Primitive Animism) নামক একটি তত্ত্বের অবতারণা করেন, যাকে সহজ বাংলায় 'আদিম ধরনের আত্মার ধারণা' বলা যেতে পারে। টাইলরের মতে এইরকমের ধর্মের পুরো সংজ্ঞা কি তা বলা দুঃসাধ্য, কিন্তু একটা সাধারণ সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে, যা হচ্ছে আত্মায় বিশ্বাস। জীবিত ও মৃতের পার্থক্য কি? এবং স্বপ্নে, তন্দ্রায়, নেশার ঝোঁকে যে সব ছায়ামূর্তি দেখা যায় তারা কারা?,এই দুটি সমস্যা আদিম মানুষকে পীড়িত করেছিল। এই সমস্যা তারা সমাধান করেছিল আত্মার ধারণা সৃষ্টি করে। তারা ধরে নিয়েছিল পৃথিবীর সকল বস্তুর মধ্যেই বিভিন্ন ধরনের আত্মা বিরাজমান। তাই টাইলরের মতে, পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত অসংখ্য আত্মার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক' প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই ধর্মের উদ্ভব হয়েছে, যে প্রচেষ্টার মূল কথা হল দুষ্ট আত্মাদের বিতাড়ন ও শিষ্ট আত্মাদের সন্তুষ্টিবিধান। কালরুমে ওই আত্মাদের উপরেই চামড়া ও মাংস বসেছে, তারা দেবতা এবং অপদেবতায় পর্যবসিত হয়েছে।

অনেকটা টাইলরের মতবাদের উপর নির্ভর করেই হার্বার্ট স্পেন্সারের প্রেততত্ত্ব গড়ে উঠেছে। স্পেন্সারের মতে অ্যানিমিজম্ ধর্মের আদি পর্যায় নয়, একটি বিবর্তিত পর্যায়। তাঁর মতে ধর্মের উদ্ভব হয়েছে প্রেতপূজার মধ্য দিয়ে, আসলে যা পূর্বপুরুষদের উপাসনা (Ancestor Worship)। মৃত ব্যক্তির আত্মা তার বংশধর দের ভয়ের কারণ এবং সেই কারণেই মৃত পূর্বপুরুষদের প্রীত্যর্থে বলিদান, পিন্ডদান, প্রভৃতি রীতি সর্বত্রই বর্তমান। স্পেন্সারের মতে ধর্মের আদিরূপ ছিল এই প্রেতপূজা । যারা জীবিত ব্যক্তিদের ধরাছোঁয়ার বাইরে, সেই মৃত পূর্বপুরুষদের প্রেত, খুব স্বাভাবিকভাবেই জীবিতদের ভীতির কারণ ছিল। মৃত্যু পরবর্তী অজানা অবস্থার ধারণা তাদের কাছে ভয়ের উদ্রেক করে। ওই প্রেতদেরই সন্তুষ্টি- বিধানের জন্য ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের উদ্ভব।

যদিও, পারলৌকিক ক্রিয়াকলাপের ব্যাপকতা সকল ধর্মেই লক্ষ্য করা যায়। আমাদের সুবিস্তৃত শ্রাদ্ধবিধির কথাও বলা যেতে পারে, কিন্তু ধর্মের মত একটি জটিল ব্যবস্থাকে, এরকম কোন একটি ধারণার সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে যাওয়াটা অতিসরলীকরণ দোষে দুষ্ট হবে।

ধর্মে'র উদ্ভব সম্পর্কিত টোটেম-বিশ্বাস (Totemism) নামে একটি মতবাদ গড়ে তোলেন রবার্টসন স্মিথ এবং জেভন্স। টোটেম বলতে বোঝায় কোন প্রাণী বা গাছ-পালা-ফুল-ফল, দু'একটি ক্ষেত্রে অচেতন বস্তুও হতে পারে, যা কোন গোষ্ঠীর পূর্বপুরুষরূপে কল্পিত, এবং যার নাম থেকেই সেই গোষ্ঠীর নামকরণ হয়। টোটেম ঠিক দেবতা নাহলেও এমন একটি সত্তা যা শ্রদ্ধেয় ও পুজনীয়। টোটেম বস্তুটিকে হত্যা করা চলবে না বা ভক্ষণ করা চলবে না, তবে বিশেষ ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক ভক্ষণ চলতে পারে ওই টোটেমের শক্তিকে গোষ্ঠীর মধ্যে সঞ্চারিত করে নেবার জন্য। সাধারণ নিয়ম হচ্ছে, টোটেম হত্যা চলবে না, এক টোটেমের মানুষ সেই টোটেমের অন্তর্গত অন্য কোন মানুষকে হত্যা করবে না, এবং এক টোটেমের পুরুষ সেই টোটেমের মেয়েকে বিবাহ করবে না। হিন্দুদের গোত্রব্যবস্থার মূলে এই টোটেম বিশ্বাসের প্রভাব আছে। যার কাশ্যপ গোত্র সে কাছিম বধ করবে না, কাছিম খাবে না, এবং তার গোত্রের মেয়েকে বিবাহ করবে না। গোত্র নামগুলির দিকে লক্ষ্য করলে সেগুলির অন্তর্গত টোটেম পশুটিকে সহজেই লক্ষ্য করা যায় যেমন গোতম (গাভী), শাণ্ডিল্য (ষাঁড়), ভরদ্বাজ (পক্ষীবিশেষ), কাশ্যপ (কচ্ছপ) প্রভৃতি।

সকল ধর্মের সঙ্গে জাদুবিশ্বাস (Magic) ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রাচীন ভারতের একদা বহুল প্রচলিত যজ্ঞ-প্রথার বারো আনা অংশই জাদু- বিশ্বাসমূলক। বর্তমান হিন্দু ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানগুলি আজও পর্যন্ত জাদু- বিশ্বাসের নিদর্শন বহন করছে। জাদুবিশ্বাসের মূল ব্যাপারটা হল অনুকরণমূলক বা সংস্পর্শমূলক আচার অনুষ্ঠানের মারফৎ প্রকৃতিকে নিজের ইচ্ছানুবর্তী করা বাস্তবের কল্পনা দিয়ে কল্পনার বাস্তবকে অধিকার করা। স্যার ফ্রেজারের মতে ম্যাজিক বা জাদুবিশ্বাস হচ্ছে, স্থান ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে কতকগুলি ধারণার অনুষঙ্গের নিয়মাবলীর প্রয়োগ, বিশেষ করে সাদৃশ্যমূলক ও সংস্পর্শমূলক অনুষঙ্গের নিয়মগুলি।

উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। ধরুন, আমি বৃষ্টি ঘটাতে চাই। যদি আমি বৈজ্ঞানিক হই আমি খুঁজবো বৃষ্টির কারণগুলি কি, এবং চেষ্টা করব সেই কারণগুলির বাস্তব প্রয়োগ ঘটিয়ে বৃষ্টি আনবার। যদি আমি ধর্মে বিশ্বাস করি আমি দেবতার কাছে প্রার্থনা করব, হে ঠাকুর জল দাও। কিন্তু যদি আমি ম্যাজিক মানি, আমি একটি ভাঁড় ফুটো করে তাতে জল ভরে একটি গাছের মাথায় টাঙিয়ে দেব। ওই যে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়বে, আমি বিশ্বাস করব, ওটা বৃষ্টির অনুকরণ, যা করার ফলে বাস্তবে বৃষ্টি হবে। অথবা আমি ড্রাম বাজিয়ে মেঘের ডাকের নকল করব। অথবা আমি দলবল জুটিয়ে বৃষ্টির নাচ নাচব। অথবা আমি ব্যাঙের বিয়ে দেব, কেননা বৃষ্টির আগে ব্যাঙ ডাকে।

এগুলি হচ্ছে অনুকরণমূলক জাদুবিশ্বাসের উদাহরণ, কৃষিগত অজস্র আচার- অনুষ্ঠানের মূলে যা বর্তমান। এই বিশ্বাসই আদিম মানুষের চোখে নারীর সঙ্গে পৃথিবীর অভিন্নতা এনে দিয়েছে, মানবিক ফলপ্রসূতার ক্রিয়াকলাপের অনুকরণ করে প্রকৃতির ফলপ্রসূতা বৃদ্ধি করার চেষ্টা হয়েছে। আরও এক ধরনের জাদু- বিশ্বাস আছে যাকে বলা হয় সংস্পর্শমূলক জাদুবিশ্বাস। ধরুন, কোন স্ত্রীলোক গর্ভবতী হয়েছে, যাতে তার সুপ্রসব হয় সেজন্য আরও

পাঁচজন পুত্রবতী মহিলাকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হল, যাতে ওই পুত্রবতীদের সংস্পর্শে এসে ওই গর্ভবর্তী মহিলাটির ভাল হয়। এটি সাধভক্ষণ নামক অনুষ্ঠান। শত্রুকে হত্যা করতে তার কুশপুত্তলিকা দাহ করা হল অনুকরণ- মূলক জাদুবিশ্বাস। তার মাথার একটু চুল বা তার পোষাকের একটু অংশ জোগাড় করে পুড়িয়ে দিলাম। এটি হল সংস্পর্শমূলক জাদুবিশ্বাস।

জেভন্সের মতে ধর্ম ও জাদুবিশ্বাসের উৎস পৃথক, বিষয়বস্তুও পৃথক, কিন্তু ধর্মে', অর্থাৎ অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস, জাদুবিশ্বাসের (যেখানে অতিপ্রাকৃতের স্থান নেই) চেয়ে পূর্ববর্তী। ফ্রেজারের মতে জাদুবিশ্বাস সর্বত্রই ধর্মের পূর্ববর্তী। তাঁর মতে জাদুবিশ্বাসের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক' তেলের সঙ্গে জলের মত, যা মেশবার নয়। কিন্তু অভিজ্ঞতায় মানুষ যখন বুঝল যে জাদু বিশ্বাস বাস্তবে ফলপ্রসূ নয়, বৃষ্টির নকল করলেই বৃষ্টি আসে না, শিকারের মহড়া দিলেই শিকার জোটে না, তখন সে অন্য রাস্তা নিল। একশ্রেণীর মানুষ প্রকৃতির নিয়মাবলী গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে সেগুলি সম্পর্কে কয়েকটি সিদ্ধান্তে আসতে চাইল। এরা হল বৈজ্ঞানিকদের পূর্বপুরুষ। অপর একদল মানুষ প্রাকৃতিক শক্তির উপর ভরসা রাখতে না পেরে অতিপ্রাকৃতকেই আশ্রয় করল। এই অতিপ্রাকৃতে আস্থা রাখার পথ, সমস্ত ঘটনার পিছনে একটি নৈর্ব্যক্তিক অলৌকিক শক্তির রহস্যময় ক্রিয়াকলাপে বিশ্বাস, এই দিয়েই শুরু হল ধর্মের জয়যাত্রা। এইভাবেই ম্যাজিকের যুগের পরিবর্তে ধর্মে'র যুগের সূত্রপাত হল। কিন্তু এই বক্তব্য সঠিক নয়। আসলে তিনি জাদুবিশ্বাসের গূঢ় রহস্যটি ধরতে পারেননি, যা হচ্ছে তার অর্থনৈতিক তাৎপর্য'। ধর্ম'কে তিনি জাদুবিশ্বাসের চেয়ে মহৎ চেতনা হিসাবে ধরে নিয়েছেন, কিন্তু এতে সন্দেহের অবকাশ আছে। তাছাড়া আদিম মানুষ পৃথিবীর সর্বত্র রাতারাতি গম্ভীর প্রকৃতির দার্শনিক বনে গিয়ে জাদুবিশ্বাসের অসারত্ব উপলব্ধি করে ধর্মের আশ্রয় নেবে এটা একান্তই কষ্টকল্পনা। এখনও বহু দেশ আছে যেখানে তথাকথিত এই ধর্মবোধ জাগেনি অথচ ম্যাজিক আছে।

তৎসত্ত্বেও কিন্তু তাঁর মতে প্রাথমিক পর্যায়ে উভয়ের উৎস এক, এবং উভয়ের ক্ষেত্রেই সেই এক প্রেরণা যাকে মানা (mana) বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ম্যাজিক বা জাদুবিশ্বাসকে বুঝতে গেলে তা বোঝা দরকার তার প্রকৃত সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকায়, যেদিকে ফ্রেজার সহ কেউই নজর দেননি। সকলেই ধরে নিয়েছেন জাদুবিশ্বাস একটা ভ্রান্ত পন্থা, যার প্রয়োগটাই অপপ্রয়োগ (misapplication of the laws of the association of ideas) যার তুলনায় ধর্ম' একটা উন্নততর মানসিকতার পরিচায়ক। এ'রা ধরে নিয়েছেন ম্যাজিক একটা জাল-বিজ্ঞান (pseudo-science) এবং নিষ্ফল কলা-কৌশল (abortive art)। কিন্তু সত্যই কি তাই?

জাদুবিশ্বাসকে বুঝতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হবে আদিম প্রাক-বিভক্ত সমাজে, যেখানে উৎপাদনের কলা-কৌশল ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের, হাতিয়ার ও উপকরণ ছিল যৎসামান্য। বাস্তব কাজের ক্ষেত্রে এই ঘাটতির পরিপূরক ছিল ম্যাজিক, বাস্তব কলাকৌশলের পরিপূরক কাল্পনিক কলাকৌশল, এবং সেই হিসাবে জীবনসংগ্রামের একটি অতি প্রয়োজনীয় হাতিয়ার।

জাদুবিশ্বাসের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হল এই যে, তা একার নয়, সকলের। সমবেত অনুষ্ঠান ছাড়া জাদু হয় না, অন্তত সেই আদিম যুগে হত না। আজও পর্যন্ত পিছিয়ে পড়ে থাকা মানবসমাজে জাদুবিশ্বাসের যে সকল নিদর্শন দেখা যায় সকল ক্ষেত্রেই সেগুলি সমবেত অনুষ্ঠান। জেন হ্যারিসন লিখেছেনঃ

One element in the rite we have already observed and that is that it must be done collectively, by a number of persons feeling the same emotion. A meal digested alone is certainly no rite a meal eaten in common under the influence of a com- mon emotion, may, and often does, tend to become a rite.

অর্থাৎ জাদুবিশ্বাসকে বুঝতে গেলে সুপ্রাচীন প্রাক্-বিভক্ত সমাজব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই তা বুঝতে হবে। উৎপাদনব্যবস্থার প্রাথমিক পর্যায়ে কোন কাজই সমবেত প্রচেষ্টা ও সমবেত প্রেরণা ভিন্ন সম্ভব ছিল না এবং এই প্রেরণা একমাত্র জাদুবিশ্বাস থেকেই পাওয়া সম্ভব ছিল। পরবর্তীকালে উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীবিভক্ত সমাজব্যবস্থা প্রবর্তিত হবার ফলে প্রাচীন জাদুবিশ্বাস তার নিজস্ব তাৎপর্য হারিয়ে ফেলেছিল। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে জাদুবিশ্বাসের প্রয়োগ পদ্ধতি বদলে যায়, তা সুবিধাভোগী শ্রেণীর গুহাবিদ্যায় রূপান্তরিত হয়। যে সমবেত জীবনচর্যার সকলের অধিকার ছিল, তা একটি পেশাদার শ্রেণীর হাতে চলে যায়। পেশাদার জাদুকরেরাই পুরোহিত শ্রেণীর পূর্বসূরী। বৈদিক সাহিত্যের দিকে তাকালেই দেখা যাবে আদিতে যজমানরাই ছিল যজ্ঞের পুরোহিত, কিন্তু পরবর্তীকালে যজ্ঞকার্য তাদের হাতে থাকেনি, তা চলে গেছে পেশাদার পুরোহিত শ্রেণীর হাতে। প্রাক্-বিভক্ত সমাজব্যবস্থা লোপ পাবার সঙ্গে সঙ্গে কার্যত প্রকৃতির উপর প্রভুত্বকারী জাদুবিশ্বাসের মৃত্যু ঘটে, এবং তার জায়গায় গড়ে ওঠে দেবতাতন্ত্র, শ্রেণীসমাজের প্রতিভূদের মতই যাঁদের সেবা ও পুজা করতে হয়, তাঁরা অনুগ্রহ করে কিছু দিলেও দিতে পারেন, না দিলেও পূজা ঠিকমত পাওয়া চাই। একটি বিশেষ ধরনের সামাজিক রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে জাদুবিশ্বাস তার নিজস্ব তাৎপর্য হারিয়ে ফেললেও, জনজীবন থেকে তা একেবারে মুছে

যায়নি, বিভিন্ন ধর্ম' ব্যবস্থার মধ্যে তার অস্তিত্ব আজও খুঁজে পাওয়া যায়; যদিও তার তাৎপর্য সম্পূর্ণ বিপরীতে পর্যবসিত হয়েছে।বাংলাদেশেব চারপাশের অঞ্চল জুড়ে আজ পর্যন্তও যে আদিম জাতি সমূহ তাদের আদিম জীবনের ধারা বহুলাংশে অক্ষুন্ন রেখেছে তাদের পূর্বপুকষ যে একদিন বাংলাদেশের সমতল অঞ্চলেরই অধিবাসী ছিল, তা বোঝা যায়। প্রবলতর জাতির আক্রমণের ফলেই তারা বিভিন্ন সময়ে বাংলার বিভিন্ন সীমান্ত অঞ্চলের অরণ্য এবং পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। সেইজন্য একই বাংলাদেশের অধিবাসী হওয়! সত্তেও ইহার বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীর মধ্যে কোন কোন বিষয়ে সংস্কতিগত পার্থক্য দেখা যায়।

উদাহরনস্বরূপ উত্তর বাংলার কোচবিহারের রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে থাকা কিছু জাদু বিশ্বাস এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

কৃষি সংক্রান্ত লোকবিশ্বাস:

কৃষি নির্ভর লোকজীবন প্রকৃত অর্থেই এতদঞ্চলে প্রকৃতি নির্ভর। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, খরা ও শিল বৃষ্টি উত্তরবঙ্গের কৃষিজীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই অতিবৃষ্টি ও বন্যার তোপে নদীর ভাঙন আটকাতে নিরক্ষর, সহজ, সরল গ্রামবাসীগণ বুড়াঠাকুরের পূজা দেন। অনাবৃষ্টির হাত থেকে ক্ষেত ও শস্য রক্ষার জন্য গান গেয়ে বৃষ্টি নামান।

কৃষি নির্ভর জনজীবনে এখানে এক প্রচলিত বিশ্বাস হল পিতা ও পিতামহ যিনি কোনদিন বৃক্ষ রোপন করেননি বা যিনি কোন দিন ফসল আবাদ করেননি তাদের সন্তান সন্ততিদের ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কায় মালভোগ কলা গাছ রোপন করেন। আবার যে পরিবারে পূর্ব পুরুষরা শাক আলু বা কেশর আলু বোনেন নি তাদের কেউ তা বুনলে পরবর্তী বংশধরগণ রোগ ভোগে আক্রান্ত হন। সবজি ক্ষেতে কোন হাঁড়ি কলসীর মূর্তি তৈরী করে রাখলে বা কাকতাড়ুয়া রাখলে কারও নজর লাগে না এবং ফলন বেশী হয়। অর্থাৎ প্রতিবেশীর কুদৃষ্টি থেকে ক্ষেতের ফসল রক্ষার জন্য এরূপ ব্যবস্থা করা হয়।এতদঞ্চলের রাভাগণ কচ্ছপের খোলে করে যে কোন শস্য বা বীজ ক্ষেতে ফেললে ফসলের ফলন বাড়ে বলে বিশ্বাস করেন। মাঠে ফসলকাটার সময় ধান বা পাট যাই হোক না কেন দুই একটি গাছ ক্ষেতে রাখতে হয়। এতে লোকবিশ্বাস হল আগামী বছর ক্ষেতে ফসল বেশী হবে।

এতদঞ্চলের কৃষিজীবী রাভাগণ অগ্রহায়ণ, পৌষ মাসে নয়া খাওয়ার 'চকোত' দিয়ে থানসিড়ি পূজা দেন। তাদের বিশ্বাস এতে পারিবারিক সমৃদ্ধি ঘটে।আম, কাঁঠাল কিংবা পেঁপেজাতীয় কোন ফল গাছে প্রথম ধরলে গাছে ঝ্যাঁটা, ছেঁড়াজুতো প্রভৃতি মালার আকারে পরিয়ে দেওয়া হয়। কারণ এতে কার কুদৃষ্টি পড়ে না এবং প্রচুর ফলন হয়।

চৈত্র, বৈশাখ মাসে শিলাবৃষ্টি হওয়ার সময় উঠোনে কাঠের পিঁড়ি ছুড়ে দিতে হয়। লোকবিশ্বাস এতে শিলাবৃষ্টি ও ঝাড় থেমে যায়। সর্বে ছিটিয়ে দিলেও অনুরূপ ফল হয় বলে বিশ্বাস।

স্থানীয় রাজবংশী সমাজে নারী ও কৃষিজ উৎপাদনের সম্পর্কটি লোকায়ত বিশ্বাসে এই রকম-

ক) মেয়েরা বীজ বপন করলে উৎপাদন বেশী হবে।

(খ) বন্ধ্যা নারী ক্ষেতের পক্ষে অনিষ্টকর কিন্তু বহু সন্তানবতী ক্ষেতের পক্ষে শুভদায়িনী।

(গ) নববধূর অঞ্চলে শস্যের বীজ বেঁধে দেওয়া, বৃক্ষরোপন, ক্রোড়ে শিশুসন্তান বা বৃক্ষের ফল স্থাপন, নববধূকে ধানদূর্বার আশীর্বাদ দান, পূজা পার্বণে হিন্দু সধবা নারীর সিঁদুর ব্যবহার করার মধ্যে এই জাতীয় বিশ্বাস রয়েছে যে বরবধূ ভবিষ্যৎ সন্তানের জনক জননী।

(ঘ) গর্ভবর্তী নারী কোনবৃক্ষের ফল ভক্ষণ করলে বৃক্ষটির ফল আগামী মরসুমে বেশী হবে। (ঙ) জোড়া ফল আহার করলে নারী যমজ সন্তানের জন্ম দেবে ইত্যাদি।

রাজবংশী সমাজের মধ্যে এমন একটি বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে ভাত নিয়ে একজন খাওয়ার পরেও ভাত উদ্বৃত্ত বলে রেখে দেয়, তাহলে সারা বছর গৃহে ধান উদ্বৃত্ত থাকবে।

লোক চিকিৎসা বিষয়ক লোকবিশ্বাস:

উত্তরবঙ্গের লোকায়ত গ্রামীণ জীবনে আক্রান্ত রোগ ব্যাধি ইত্যাদির ক্ষেত্রে আজও এক অখন্ড বিশ্বাস দেখা যায় ওঝা, কবিরাজ ও ভোঙরিয়ার প্রতি।

কোচবিহারের লোকজীবনে লোকবিশ্বাস ও সংস্কার নির্ভর লোকচিকিৎসার মাধ্যমগুলি হল (ক) খোঁকি দেখা বা কাঠি দেখা (খ) ভোঙর ডাঙানো ও মাসান পূজা (গ) ভর ওঠানো বা ভরে পড়া (ঘ) কান্দির জল (৬) সাপে কাটা ও বসন্ত রোগের ঝাড়ফুক ইত্যাদির মাধ্যমে।

খোঁকি দেখা বা কাঠি দেখা: কোচবিহারের লোকায়ত চিকিৎসা পদ্ধতির অন্যতম মাধ্যম হল 'খোঁকি দেখা' বা 'কাঠি দেখা'। খোঁকি অর্থে এখানে বোঝানো হচ্ছে কাঠিকে। অর্থাৎ দুটি বা তিনটি কাঠি হাতে নিয়ে রোগগ্রস্ত রোগীর মানত অনুযায়ী পূজার পূর্বে রোগের মাত্রা নির্ণয়ের জন্য রোজা বা ওঝা নিজে পরীক্ষা করেন, এর মাধ্যমে ওঝা নিশ্চিত হতে পারেন যে রোগী কোন অপদেবতা কর্তৃক আক্রান্ত নাকি অন্য কোন রোগে আক্রান্ত। এভাবে রোগ নির্ণয়ের পর ওঝা বা রোজা বা কোন কোন ক্ষেত্রে ভোঙরিয়া ঝাড়ফুঁকের মাধ্যমে চিকিৎসা শুরু করেন। এরূপ ভাবে ওঝার নির্দেশেই আক্রান্ত কোন শিশু রোগী এলে যথা যখির এবং বয়স্ক ব্যাক্তির ক্ষেত্রে শারীরিক বা মানসিক কোন উপসর্গ সৃষ্টি হলে মাসান কালী বা অন্যকোন অপদেবতাকে কি ধরনের মানতের সাহায্যে পূজা করা হবে তা বলে দেন।

ব্রতকথা-

ব্রত কথাটির প্রতিজ্ঞা, চর্চা বা সাধনা অর্থে ব্যবহার করা হয়, তবে সাধারণভাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে কোনো বিশেষ লোকাচার উদযাপনকেই প্রচলিত অর্থে ব্রত বলা হয় । বাংলায় ঘরে ঘরে অনেক রকমের ব্রত বা সামাজিক অনুষ্ঠানের রীতি বহুকাল ধরে প্রচলিত রয়েছে। ভারতের সর্বত্রই নানা ধরনের ব্রত উদযাপন করা হয়ে থাকে। যদিও সেখানে ব্রত শব্দটি সেভাবে প্রচলিত নয়। বাংলায় হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বসবাস করে। তাদের মধ্যেও অনেকে অনেক রকমের রীতিনীতি মা ধর্মাচরণ করে থাকেন। আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যেও নানা রকমের ধর্মাচরণ লক্ষ্য করা যায়। সেখানে তারা নিজেদের মতো করে নিয়ম পালন করে। কেউ সারাদিন না খেয়ে, রান্না করা খাবার না খেয়ে, ফলমূল খেয়ে, কিংবা শরবত জাতীয় পানীয় খেয়ে সারাদিন ধরে নানা নিয়ম পালন করে ব্রত উদযাপন করে থাকে। বিভিন্ন ব্রত পালনে এক এক রকমের বিধি নিষেধ রয়েছে। কিছু ব্রত আছে যেগুলি ঘরের ভেতরে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কিছু ব্রত আছে যেগুলি বাড়ির বাইরে, উঠোনে কিংবা পুকুর ঘাটে গিয়ে উদযাপন করা হয়। ব্রত সম্পর্কে বিণয় ঘোষ লিখেছেন, মানুষের কামনার অনুষ্ঠান হল ‘ব্রত। কামনা ছাড়া মানুষ নেই, মানুষ ছাড়া কামনা নেই। বনবাসী নিষ্কাম সন্ন্যাসীরও কামনা আছে, ঐশি শক্তিলাভ ও ঈশ্বর দর্শনের কামনা। এই কামনা পূর্ণ করার জন্য সন্ন্যাসীকেও ব্রত করতে হয় এবং তার সাধনা ও সাধনপদ্ধতি হল তার ব্রত। মানুষই একমাত্র জীব যার কামনা আছে, আর কোনো জীবের কামনা নেই। মানুষের কামনা আছে বলেই সেই কামনা চরিতার্থ করার নানারকম কৌশলের কথা মানুষকে চিন্তা করতে হয়েছে, বিশেষ করে সেই সমস্ত কামনা যা সহজে

ইচ্ছামতো পূর্ণ করা যায় না'। প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তর যুগ থেকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পারমাণবিক যুগ পর্যন্ত লক্ষাধিক বছরের মানব সভ্যতার ইতিহাস হল এই কৌশল উদ্ভাবন চিন্তাধারার ইতিহাস। মানব বিজ্ঞানীরা সাধারণত এই চিন্তাধারাকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করে থাকেন। একটি প্রাক্‌বৈজ্ঞানিক চিন্তা, যাকে ঐন্দ্রজালিক চিন্তা বলা হয়, আর-একটি বৈজ্ঞানিক চিন্তা। সাম্প্রতিক কালে কয়েকজন বিখ্যাত মানব বিজ্ঞানী মানব চিন্তার রৈখিক ক্রমবিকাশ এবং তার এরকম পবিভাগ অযৌক্তিক বলে প্রতিপন্ন করেছেন। অবনীন্দ্রনাথ অবশ 'বাংলার ব্রত' অনুষ্ঠানের পর্যালোচনা করেছেন মানব চিন্তার এই ক্রমাে্ত পর্ববিভাগ মেনে নিয়ে, কিন্তু সে-বিষয় পরে আলাে্য। বিশ্ময়কর হল ব্রত সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানসম্মত আলাে্চনা। যেমন প্রথর তার ইতিহাসবাে্ধ, তেমনি প্রকৃত মানববিজ্ঞানীর মতাে তার সজাগ বিশ্লেষণধর্মী বুদ্ধি ও মন। শিল্পী ও বিজ্ঞানীর আশ্চর্য মিলন হয়েছে তার মধ্যে।

বেশ কিছু ব্রত আছে যেগুলি বহুকাল ধরে চলে আসা ধর্মাচরণের সঙ্গে সম্পর্কিত। আবার বেশ কিছু ব্রত রয়েছে যেগুলি লৌকিক ভাবেই চলে এসেছে দীর্ঘকাল ধরে। পাশাপাশি অবস্থান করতে গিয়ে অনেক আদিবাসী বা অন্যান্য সমাজের কিছু সামাজিক ও ধর্মীয় নিয়ম নীতি, আচরণ, ব্রত ইত্যাদি আরেক সমাজের মধ্যে প্রবেশ করেছে। কালে কালে তা তাদের নিজেদের ধর্মাচরণের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যেতে কোন অসুবিধা হয়নি।

বিভিন্ন প্রার্থনা ও কামনার সঙ্গে সম্পর্কিত এইসব ব্রত দীর্ঘকাল ধরে লালিত ও পালিত হয়ে আসছে। কখনো শস্য উৎপাদনের কামনায়, কৃষি কাজে বৃষ্টির জলের জন্য ও পানীয় জলের জন্য, প্রচন্ড গরমের সময় পুকুরের জল যাতে না শুকিয়ে যায়, বিভিন্ন মহামারী যাতে ছড়িয়ে না পড়ে, পারিবারিক ও সামাজিক সুখ সমৃদ্ধি কামনায়, পুত্রের কামনায়, ধন-সম্পদের কামনায়, গবাদিপশুর কামনায়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাবার জন্য এছাড়াও আরও অনেক রকমের উদ্দেশ্য নিয়ে এই ধরনের ব্রত গলি উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে।

কিছু ব্রত আছে যেগুলি প্রায় প্রতি মাসেই পালিত হয়ে থাকে যেমন একাদশী ব্রত, মা লক্ষ্মীর ব্রত, মঙ্গলচন্ডীর ব্রত, শুক্রবারে সংকটার ব্রত, মঙ্গল সংক্রান্তি ব্রত, এয়োঁ সংক্রান্তির ব্রত, মধু সংক্রান্তির ব্রত, নিত্য সিঁদুর ব্রত, সন্ধ্যামণির ব্রত, নখ ছুট এর ব্রত, ষোল কলা ব্রত, মৌনী অমাবস্যা ব্রত, বারোমেসে অমাবস্যা ব্রত ইত্যাদি।

আমাদের দেশে দু-রকমের ব্রত চলিত রয়েছে দেখা যায়। কতকগুলি শাস্ত্রীয় ব্রত,আর কতকগুলি শাস্ত্রে যাকে বলেছে যোষিৎপ্রচলিত বা মেয়েলি ব্রতেরও দুটো ভাগ; একপ্রস্থ ব্রত কুমারী ব্রত-পাঁচ-ছয় থেকে আট-নয় বছরের মেয়েরা এগুলি করে, আর বাকিগুলি নারী ব্রত-বড়ো মেয়েরা বিয়ের পর থেকে এগুলি করতে আরম্ভ করে। এই শাস্ত্রীয় বা পৌরাণেক ব্রত যেগুলি হিন্দুধর্মের সঙ্গে এদেশে প্রচার লাভ করেছে, এবং দুই-থেকে বিভক্ত এই মেয়েলি ব্রত! এই মেয়েলি ব্রতেরও দুটো ভাগ; একপ্রস্থ ব্রত কুমারী ব্রত-পাঁচ-ছয় থেকে আট-নয় বছরের মেয়েরা এগুলি করে, আর বাকিগুলি নারী ব্রত-বড়ো মেয়েরা পর থেকে এগুলি করতে আরম্ভ করে। এই শাস্ত্রীয় বা পৌরাণিক ব্রত যেগুলি হিন্দুধর্মের সঙ্গে এদেশে প্রচার লাভ করেছে, এবং দুই-থেকে বিভক্ত এই মেয়েলি ব্রত আর অনুষ্ঠানগুলি

খুঁটিয়ে দেখলে পুরাণেরও পূর্বেকার বলে বোধ হয় এবং যার মধ্যে হিন্দু-পূর্বে এবং হিন্দু এই দুই ধর্মের একটি আদানপ্রদানের ইতিহাস পড়তে পারি, এই দুইপ্রস্থ ব্রতের গঠনের ভন্নতা বেশ স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। শাস্ত্রীয় ব্রত, নারী ব্রত এবং কুমারী ব্রত-ব্রতকে এই তিন ভাগে রেখে প্রত্যেকটির গত্যন কেমন দেখা যাক। কিছু কামনা ক'রে যে অনুষ্ঠান সমাজে চলে তাকেই বলি ব্রত।

শাস্ত্রীয় ব্রত

প্রথমে সামান্যকান্ড-যেমন আচমন, স্বস্তবাচন, কর্মারম্ভ, সংকল্প, ঘট-স্থাপন, পঞ্চগোব্যশোধন, শান্তিমন্ত্র, সামান্যার্ঘ আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাসাদি বিশেষার্ঘ্যস্থাপন । এর পরে ভুজ্জি-উৎসর্গ এবং ব্রাহ্মণকে দান-দক্ষিণা দিয়ে কথা-শ্রবন বা রোচনার্থে ফলশ্রুতি, ব্রতে যাতে রুচি জন্মায় সাজন্য ব্রতকথা শোনা। সামান্যকান্ড এবং ব্রতকথা এই দুটি হল পৌরাণিক ব্রতে উপাদান।

নারী ব্রত

শাস্ত্রীয় ব্রতের অনেকখানি এবং খাঁটি মেয়েলি ব্রতেরও কতকটা মিলিয়ে এগুলি। এগুলি শাস্ত্রীয় এবং অশাস্ত্রীয় দুই অনুশষ্ঠানের যুগলমূর্তি বলা যেতে পারে। বৈদিক অনুষ্ঠানের গভীরতা ও সজীবতা অনেকখানি চলে গিয়ে এবং লৌকিক ব্রতের সরলতা প্রায় নষ্ট হয়ে পূজারি ব্রাহ্মণ এবং সামান্যকান্ডের জটিল অনুষ্ঠান ন্যাসমুদ্রা তন্ত্রমন্ত্র এখানে প্রাধান্য পেয়েছে।

এই ব্রতগুলিই অনেকখানি খাঁটি অবস্থায় পাওয়া যায়। এদের গঠন এইরুপ-আহরন,যেমন ব্রত করতে যা যা লাগবে তা সংগ্রহ করা; আচারণ, যেমন কামনার প্রতিচ্ছবি, আলপনা দেওয়া, পুকুরকাটা ইত্যাদি এবং কামনা জানিয়ে কামনার প্রতিচ্ছবি বা প্রতিকৃতিতে ফুল ধরে, শেষে যদি কোনো ব্রতকথা থাকে তো সেটা শোনা, নয়তো ফুল ধরেই শেষ কামনা জানিয়ে ব্রত সাঙ্গ। পূজারি এবং তন্ত্রমন্ত্রের জায়গাই এখানে নেই।

ব্রতকথাগুলো গ্রাম্য মেয়েদের আচার এবং পূজো অনুষ্ঠানে পালনের কাজেই মূলতঃ ব্যবহার করা হয়। এই কাহিনীগুলোর ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক এবং সামাজিক মূল্য অপরিসীম। ব্রতকথাগুলো যে সকল দেবদেবীর পূজো অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করা হয়, তারা রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের দেবদেবী নয়। এইসকল দেবদেবীর নাম কোন শাস্ত্রে বা পুরাণে পাওয়া যায় না; এদের পূজোর প্রকৃতিও ভিন্ন; অনেকক্ষেত্রে প্রাচীন বাংলা ভাষায় এদের পূজোর মন্ত্র পাঠ করা হয়ে থাকে। কিছু কিছু ব্রতকথা রূপকথা থেকে আগত। যদিও তাদের বিষয়বস্তুতে ধর্মীয় ভাব আছে এবং অলৌকিক চরিত্রও কাহিনীতে অংশগ্রহণ করেছে তথাপি হিন্দু দেবদেবীর পূর্জাচনার সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। ব্রতকথাগুলোর মধ্যে গ্রাম্য মেয়ের। সহজ ভাষায় তাদের মনোভাব ব্যক্ত করে থাকে। তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাদের সুখ-দুঃখ, এমন কি, সতিনের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ সবই তারা ব্রতকথার মধ্য দিয়েই প্রকাশ করে। ব্রতকথার দেবদেবীর চরিত্র মানুষের মত দোষত্রুটিপূর্ণ এবং অনেক সময় তারা তাদেরই ভাগ্যের প্রতীক বলে মনে করা হয়।

শাস্ত্রীয় ব্রতগুলির মধ্যে ভারতবর্ষের ব্রত-অনুষ্ঠানের, আর-এক পরিচ্ছেদ আমরা পড়তে পাই।লোকে আর্যধর্মের চরম এক-নিয়ন্তার নিষ্কাম উপাসনায় পৌছে হিন্দুধর্মের নানা দেবদেবী আবার সৃষ্টি করতে আরম্ভ করেছে, সেই প্রাচীন অবস্থায়, সেই আন্যব্রতদের সমান অবস্থায় আর-বার ফিরে যাচ্ছে মনের গতি। কেবল এইটুকু তফাৎ যে, এখন অন্যব্রতদের দেবতাকে এবং সেই সেই দেবতার ব্রত-অনুষ্ঠানকে আর্যদের মত সম্পূর্ণ উপেখা না করে তাদের সম্পূর্ণ রুপান্তে ঘটাবার চেষ্টা চলেছে। হিন্দুধর্মের এই উদারতার পিছনে রয়েছে সম্পূর্ণ অনুদার ভাবটি-সবাই নিজের নিজের ধর্মাচরণ করতে থাকে এটা নয়, সবাই আসুক এক হিন্দু ধর্মের মধ্যে ব্রাহ্মণপুরোহিতদের কবলে; এবং এরই জন্য শাস্ত্রের ছাঁচ সবটার উপরে বেড়াজালের মতো দেওয়া হচ্ছে। শাস্ত্র এবং শাস্ত্রকারেরাই এর সাক্ষ্য দিচ্ছেন; যেমন ব্যাসদেব বলছেন –'দেশানুশিষ্টং কুলধর্মমগ্রং, সগোত্রধর্মং নহি সংত্যেজেচ্চ'।অর্থাৎ, ধর্মশাস্ত্র অবিরোধী; যে দেশব্যবহার সেইটেই প্রথম পালনীয়, কিন্তু সগোত্র ধর্মও পরিত্যাগ করা উচিত নয়।স্মার্ত রঘুনন্দন শুদ্ধিতত্ত্বে স্ত্রীলোকদের হিন্দু-অনুষ্ঠেয় কার্যে অর্থাৎ যে যে কার্য তারা ধর্মবোধে করে আসছে অথচ মুনিপ্রণীত কোনো বচন-প্রমাণে যে-সকল ব্যবহার ও ক্রিয়ার উলেখ পাওয়া যায় না তা 'যোষিৎব্যবহারসিদ্ধা' বলে ধরেছেন।

পশ্চিম-দেশ হোলির উৎসব একটি অতি প্রাচীন অনিষ্ঠান। এই হোলি-উৎসব বা বসন্তের ব্রতকে শাস্ত্রসিদ্ধ বলে জন্যে মীমাংসা-দর্শনে হোলিকাধিকরণ বলে একটা অধ্যায় লিখতে হয়েছে। এবং এই অধ্যায়ে যে-সমস্ত হিন্দুর ধর্মকর্মের বা ব্যবহারের বেদাদিশাস্ত্র প্রমাণ পাওয়া যায় না, সে-সমস্তই হোলিকাধিকরণন্যায়মূলক-সিদ্ধ বলা হয়েছে। এটিকে হিন্দুশাস্ত্রকার মেনে নিলেন এবং এর সঙ্গে সমস্ত লৌকিক ব্রতকে হিন্দুর বলে স্বীকার করেও নিলেন দেখছি; কিন্তু শুধু এইখানে শাস্ত্রকারদের কর্ম শেষ হলো না, পুরোনো বা অশাস্ত্রীয় ব্রতগুলোর রুপান্তর করে শাস্ত্রীয় বলে চালাবার চুষ্টাও হয়েছে দেখি। আবার নতুন নতুন ব্রত, নিজেদের মনগড়া, তাও সৃষ্টি হয়েছে দেখা যায়। যেমন অক্ষয়তৃতীয়া অঘোরচতুর্দশী, ভূতচতুর্দশী নৃসিংহচতুর্দশী, এমন কতকগুলি ব্রত তিথিমাহাত্ম প্রচারের জন্য। জ্ঞানত বা অজ্ঞানত বিশেষ তিথিতে যদি কোনো পুণ্যকার্য করা যায় তবে তার দ্বারা মানুষের পুন্য অর্জন এবং সৌভাগ্য ঘটে-এই হল ব্রতগুলির মোট কথা। আর কতগুলিব্রত হিন্দুদের দেবদেবীর মাহাত্ম্যপ্রচারের জন্য। যেমন অনন্তব্রত ইত্যাদি। কতকগুলি গ্রাম্যদেবতার ব্রত-পুত্রকামনা, সর্পভয়নিবারণ, এমনি সব কামনা ক'রে; এগুলি মেয়েরাই করে। যেমন অরণ্যষষ্ঠী, নাগপঞ্চমী, নিত্যষ্যষ্ঠী,সুবচনী,শীতলা,বুড়োঠাকরুণ,ঘেঁটু,কুলাই,মুলাইইত্যাদি।

এই-সব গ্রাম্যদেবতার প্রতিদ্বন্দ্বীস্বরূপ কতকগুলি শাস্ত্রীয় দেবতা এবং তাঁদের ব্রত রয়েছে ; যেমন কার্তিকের ব্রত। ষষ্ঠীদেবী পূত্রদান করেন, কার্তিকও তাই। তাঁর পর ক কতকগুলি ব্রহ্মণদের মনগড়া ব্রত- যেমন দধিসংক্রান্তি, কলাছড়া, গুপ্তধন, ঘৃতসংক্রান্তি, দাড়িম্বসংক্রান্তি, ধন-গোছানো এগুলি কেবল নৈবেদ্য ও দক্ষিণার লোভ থেকে পূজারিরা সৃষ্টি করেছে। কলাছাড়ায় ব্রাহ্মণকে কলা দান, সন্দেশের ভিতর পয়সা দিয়ে গুপ্তধন, ঘৃত দাড়িম্ব এইসব জিনিস বিশেষ-বিশেষ তিথিতে ব্রাহ্মণকে দিলে ভালো হয়-এই ব্রতগুলির মূলকথাটা এ ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁর পর কতকগুলি ব্রত সম্পূর্ণ মেয়েদের সৃষ্টি; যেমন আদরসিংহাসন-স্বামীর আদর কামনা করে একটি স্বামীসোহাগনী

সাজীয়ে-গুছিয়ে আদর-আপ্যায়নে খুশি করা-এবং আরও অনেক অশাস্ত্রীয় ব্রত, ঋতুর উৎসব, এর মধ্যে আসছে। এই যাগুলি সম্পূর্ণ মেয়েদের ব্রত, এইগুলি হলো লৌকিক বা লোকপরম্পরায় পুরাকাল থেকে দেশে চলে আসছে। এর মধ্যে শাস্ত্র এবং ব্রাহ্মণ দুয়েরই জায়গা নেই। যদিও এই-সব ব্রত অনেক শাস্ত্রের মধ্যে রূপান্তরিত করে নেওয়া হয়েছে তবু এখনও অনেকগুলি খাঁটি অবস্থায় পাওয়া যায়।

লৌকিক দেবদেবী

(ক) সর্পের দেবী মনসা-সারা বাংলায় যে অঞ্চলটি বীরভূম জেলার অন্তর্গত, তাতেই নিঃসন্দেহে সর্পপূজোর সর্বাধিক প্রচলন দেখা যায়। এখানে প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই এক কিংবা একাধিক 'মনসার খান' দেখতে পাওয়া যায়। কোনো নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুর গৃহাভিনায় কোন মাটির দেয়াল দেওয়া খড়ের ঘরেই সর্পদেবীর 'মন্দির' বা থান স্থাপিত হয়ে থাকে। এই সকল 'খান'-এ সাধারণতঃ দৈনিক পূজো হয়, তাতে কোনো তপশীলভুক্ত জাতির লোক পুরোহিত হয়ে পূজো করে। হিন্দু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শ্রেণীর নর-নারী বিনা দ্বিধায় পূজোয় অংশ গ্রহণ করে। তবে উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষিত হিন্দু পুরুষ তার সংস্রব থেকে দূরে থাকে। এই সকল 'মন্দির' যারা রক্ষণাবেক্ষণ করে, তাদের 'দেয়াসী' বলে। কোনো কোনো সময় এই সকল 'মন্দির'-এর রক্ষণাবেক্ষণ থেকেই দেয়াসীর জীবিকা নির্বাহ হয়। দেয়াসী গ্রাম্য হাতুড়ে চিকিৎসকের কিংবা সর্প দংশনে ওঝার কাজ করে। দেয়াসীরা স্ত্রীলোকও হতে পারে। তাদের দেয়াসিনী বলে।

'মন্দির'-এর মধ্যে বেদীর উপরে সর্পদেবীর প্রতীক সমূহ স্থাপন করা হয়। প্রতীক- গুলোর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নাম, যেমন, চিন্তামণি (ধ্যানের লক্ষ্য), জল ডুবুরি (ডুবুরি), বিষহরী (যে দেবী বিষ হরণ করেন), পদ্মকুমারী (কুমারী পদ্মা মনসার আর এক নাম), বুড়ি মা (বৃদ্ধা জননী), দুলালের মা (দুলালের জননী) ইত্যাদি। 'মন্দির'-এর মধ্যে উচ্চ বেদীর উপর এক, তিন, পাঁচ কিংবা সাত সংখ্যক পোড়া মাটির ঘট দেখতে পাওয়া যায়। ঘটগুলোর গায়ে চারদিক দিয়ে সাপের ফণা গড়ে তোলা হয়। ঘটগুলো পুরু সিঁদুরের প্রলেপ দিয়ে ঢাকা। সিঁদুরের প্রলেপ যেদিন থেকে এগুলোকে বেদীর উপর প্রথম বসান হয়েছে, সেদিন থেকেই তাদের উপর পড়তে আরম্ভ করেছে। প্রত্যেক ঘটের উপর সিজ মনসা গাছের এক একটি সদ্য ভাঙ্গা টাটকা ডাল দিয়ে রাখা হয়। ডালগুলো প্রতিদিন পূজোর সময় বদলে দেওয়া হয়। কোন কোন সময় ঘটের গায়ে বাইরের দিক থেকে পেরেক বিধিয়ে রাখা হয়, এগুলে। ভক্তেরা তাদের মানসিক পূরণের জন্য দেবতাকে উপহার দিয়ে থাকে। এই পেরেকগুলোকে 'চিক' (যা চিকচিক করে) বলা হয়।

উত্তরবঙ্গে কোথাও সর্পদেবীর কোনো স্থায়ী 'মন্দির' নেই। সেখানে বছরে একবার মহা আড়ম্বরের সঙ্গে মনসার পূজো হয়। এই অঞ্চলে হিন্দুর শাস্ত্রীয় সর্পপূজো অর্থাৎ নাগপঞ্চমী উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর কাছেও খুব পরিচিত নয়। বাংলা শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তির দিন এখানে আনুষ্ঠানিকভাবে সর্পপূজো হয়, নাগপঞ্চমীর দিন প্রায় কিছুই হয় না। প্রকাশ্য স্থানে বা পূজোর 'খান'-এ কিংবা গৃহস্থের নিজস্ব বাসগৃহের মধ্যে পূজোর অনুষ্ঠান হয়। সাধারণতঃ দেবতার কোনো প্রতিমা নির্মিত হয় না, কিন্তু পূজো উপলক্ষে মহাভারতের নাগ-কাহিনীর অষ্টনাগ কিংবা একটি মাত্র নাগের (সম্ভবতঃ আস্তিক) মাটির মূর্তি নির্মাণ করে পূজো করা হয়। অনেক ক্ষেত্রেই সিজ গাছের ডাল পুঁতে তাতেও মনসার পূজো হয়।

পূজোর বিশেষ নৈবেদ্যরূপে চিড়ে ভাজা, দুধ, (কোন কোন সময় দুধ এবং কলা) বড় বড় কচুর পাতায় রেখে মনসাকে নিবেদন করা হয়। মালদহ জেলায় ঘরের মেঝে, বারান্দা, উঠোনে চিত্র-বিচিত্র করে আলপনা আঁকা হয়। সেই আলপনার ভিতর দিয়ে সর্পের বক্রগতির ভঙ্গী অনুকরণ করা হয়।

কোন কোন অঞ্চলে মনসার বাৎসরিক পূজোর দিনে বাড়ীর মেয়েরা উপবাস করে থাকে। অনেক হিন্দু পরিবারেই সেদিন রান্না হয় না। তাকে 'অরন্ধন' বলে।

দু একটি ছোটখাটে। দৃষ্টান্ত বাদ দিলে মোটামুটিভাবে গঙ্গার দুই তীরবর্তী অঞ্চলের জেলাগুলোতে সর্পপূজোর আচার প্রায় অভিন্ন। তাদের মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিমভাগ স্বভাবতই বীরভূম জেলার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। অন্যত্র যেমন পূর্ব বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া, নদীয়া এবং চব্বিশ পরগণাতেও সর্পপূজোর আচারগত কোনে। পার্থক্য নেই বললেই চলে। প্রত্যেক গ্রামেই নির্দিষ্ট দিনে একটি সিজ মনসা গাছের সামনে অপরিহার্যভাবে এই পূজোর অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। বছরের পর বছর সিজ মনসার গাছটি বাড়তে থাকে। আষাঢ়, শ্রাবণ কিংবা ভাদ্র (এই তিনমাসেই এ দেশে বর্ষা হয়ে থাকে), এই তিনমাসই আনুষ্ঠানিকভাবে এই অঞ্চলে সর্পপূজোর কাল:

বাংলার কোনো কোনো অঞ্চলে সর্পপূজোর আচার সেইসব অঞ্চলের লৌকিক শৈবধর্মের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। পৌরাণিক জনশ্রুতি অনুযায়ী শিব তার কণ্ঠে সর্প ধারণ করেন বলে অনেক প্রাচীনকাল থেকেই শৈবধর্মের মধ্যে সর্পপূজো নিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল। পশ্চিম বাংলার অনেক গ্রাম্য শিব মন্দিরে সর্পপূজোর উদ্দেশ্যে জীবন্ত সর্পকেও পালন করা হয়। সাপগুলো মন্দিরের দেয়ালের এবং মেঝের মধ্যে গর্ত করে বাস করে, তারপর পূজোর সময় যে দুধ এবং অন্যান্য জিনিযের খাদ্য-নৈবেদ্য দেওয়া হয়, তা খেয়েই জীবন ধারণ করে। ক্রমে তাদের বংশবৃদ্ধি পায়, কিন্তু মন্দিরে যারা যাতায়াত করে, তারা এদের ভয় পায় না, কিংবা এই সমস্ত 'গৃহপালিত' সরীসৃপ তাদেরও কোনে। অনিষ্ট করে না। পূজোর সময় সাগগুলো গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে-তাছাড়া সারা দিনরাত এরা গর্তের মধে। থাকে। কোনো কোনো জায়গায় সাপগুলো উপরিস্থিত অশ্বত্থ গাছে গর্তের মধ্যে বাস করে। সেং গাছের ছায়ায় মন্দিরগুলো থাকে। বাৎসরিক শিব পূজোর সময় ভক্তেরা সাপগু সাকেও খেতে দেয়। কেউ তাদের কোনো রকম অনিষ্ট করবার কথা চিং।ও করে না। বেদেদের এই সাপ ধরতে দেওয়া হয় না। বরং মনে করা হয় যে তারা দেবতার সান্নিধ্যে থাকবার ফলে আর বিপজ্জনক নয়। সেসব অঞ্চলে সর্পপূজো শৈবধর্মের মধ্যে আত্মগোপন করেছে, সেখানে আলাদা করে সর্প- দেবীর পূজো করবার আর কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না।

(খ) স্ত্রীজাতির দেবতা চণ্ডী-বাংলার লৌকিক দেবীদের মধ্যে চণ্ডীর চরিত্রই সর্বাপেক্ষা জটিল। তার কারণ, বিভিন্ন সময়ে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের বিবিধ স্থানীয় অবস্থা থেকে অনেক সময় পরস্পর স্বতন্ত্র প্রকৃতির যে সকল স্ত্রীদেবতার পরিকল্পনা করা হয়েছিল, তা কলক্রমে এক সাধারণ চণ্ডী নামের মধ্যে আশ্রয় লাভ করেছে। পুরাণের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়, সকল শক্তিদেবীই কালক্রমে শিবের একমাত্র পত্নী চণ্ডীরূপে পরিণতি লাভ করলেও তাঁদের উদ্ভবের ইতিহাস পরস্পর স্বতন্ত্র। বাংলার জনসাধারণের মধ্যে পুঞ্জিত চণ্ডীর সম্পর্কেও একই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন প্রকৃতির চণ্ডী বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষতঃ স্ত্রীসমাজের পূজো লাভ করে আসছে, তাদের মধ্যে কয়েকটির নাম এইরূপ-নাটাই চণ্ডী, উচুল চণ্ডী, কুলুই চণ্ডী, শুভ চণ্ডী, খাড়া শুভচণ্ডী, বথাই চণ্ডী, রণ চণ্ডী, ওলাই চণ্ডী, বসন চণ্ডী, অবাক চণ্ডী, কলাই চণ্ডী, ককাই চণ্ডী, ঢেলাই চণ্ডী, মঙ্গল চণ্ডী-মঙ্গল চণ্ডীর আবার কতকগুলি প্রকার ভেদ, যেমন বারমেসে মঙ্গলচণ্ডী বা নিত্যামঙ্গলচণ্ডী, জয়মঙ্গলচণ্ডী, হরিষ মঙ্গলচণ্ডী, কুলুই মঙ্গলচণ্ডী, সঙ্কট মঙ্গলচণ্ডী, সঙ্কটা মঙ্গলচণ্ডী, ভাউত্তা মঙ্গলচণ্ডী, মঙ্গল সংক্রান্তি ইত্যাদি।

মঙ্গল শব্দটি শুভ অর্থসূচক; কিন্তু দেবীর অনিষ্টকারী শক্তির জন্ম তাকে প্রসন্ন করবার উদ্দেশ্যে তাঁকে বুঝতে বিপরীতার্থক শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যদিও সকল লৌকিক দেবীই 'চণ্ডী'র সাধারণ পদবী গ্রহণ করেছেন, তথাপি একথা অতি স্পষ্ট যে তাঁর প্রকৃতি সর্বত্র এক নয়, কারণ, তাঁরা বিভিন্ন আঞ্চলিক ঐতিহ্য থেকে স্বতন্ত্রভাবে জন্মলাভ করেছে। বাংলা অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি রবিবারে নাটাই চণ্ডীর ব্রত করতে হয়। পূজোর উপকরণ নিতান্ত

সামান্ত। প্রত্যেক ব্রতিনী চালের কিংবা গমের গুঁড়ো দিয়ে কয়েকটি চাপাটি তৈরী করে। দেবীর দয়ায় হারানো জিনিষ ফিরে পাওয়া যায়, অনেকদিন থেকে নিরুদ্দিষ্ট আত্মীয়-স্বজন ঘরে ফিরে আসে। 'নাটাই' শব্দটি সংস্কৃত 'নৃত্য' শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে বলে মনে হয়। সুতরাং মনে হয়, এই দেবীকে তার নৃত্যপরা কিংবা আনন্দময়ীরূপে উপাসনা করা হয়।

ঘোর চণ্ডীর নামে যে ব্রতকথা প্রচলিত আছে, তা থেকে জানতে পারা যায় যে, দেবী ঘোরতর অনিষ্ট শক্তির প্রতীক। 'ঘোর' শব্দটি বাংলায় ভয়ংকর অর্থবাচক।

কুলুই চণ্ডী নামে যে লৌকিক দেবীর পূজো করা হয়, তার উদ্দেশ্য রোগের প্রতিকার। কিন্তু বিশেষ কোন রোগের সঙ্গে তার সম্পর্ক আছে বলে জানা যায় না।

শুভচণ্ডী, সাধারণ ভাবে সুবচনী অথবা সূচনাই নামে বাংলার কোন কোন অঞ্চলে পরিচিত। যে কোন মাসের রবি এবং বৃহস্পতিবার তার পূজো করা চলে। এই পূজো সাত, চৌদ্দ কিংবা একুশ জন বিভিন্ন বয়সী স্ত্রীলোক একত্র হয়ে করতে পারে। পূজোর যে সকল সামগ্রী দরকার হয় তা, চালের গুঁড়ো, দুধ, দই, মিষ্টিদ্রব্য, নয় রকমের ফুল, নয়টি তুলসী পাতা। লোকের বিশ্বাস যে এই পুজো করলে বন্ধন থেকে মুক্তি আসে, হারানো দ্রব্য ফিরে পাওয়া যায়, এমন কি, কাটা মুণ্ডও ঘাড়ের উপর জোড়া লেগে যায়।

খাড়া হয়ে (দাঁড়িয়ে) যে সুবচনীর ব্রত করতে হয় তাঁর নাম খাড়া সুবচনীর ব্রত। তুলসী গাছের সামনে দাঁড়িয়ে কোন রবিবার কিংবা বৃহস্পতিবার এই ব্রত করতে হয়। ব্রতের জন্য যে উপকরণের প্রয়োজন হয়, তা এই-নয় রকমের ফুল, নয়টি দূর্বা, এক থালা ভর্তি চালের গুঁড়ো, কিছু দুধ, কয়েকটি কলা, কয়েকটি তাজা পান এবং সুপারি।

বাংলার কোন কোন অঞ্চলে আষাঢ় মাসের রবি এবং বৃহস্পতিবার রথাই চণ্ডীর ব্রত করা হয়। এই ব্রত উদ্যাপন করলে সাত জন্ম পর্যন্ত দেহের স্বাস্থ্য (রথ) ও উদ্যম অটুট থাকে। এবং ঘর সংসারের কাজকর্ম সন্তোষজনকভাবে করবার ক্ষমতা কোন দিন লোপ পায় না।

মনে হয়, কোন স্থানীয় সামন্ত-রাজা কিংবা ভূ-স্বামী তাঁর প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করার আশায় রণ চণ্ডী দেবীর পূজো করেছিলেন। তার পূজো করলে বিবাদে জয় হয়।

কলেরা, ওলাওঠা এবং বসন্তরোগের প্রতিষেধকরূপে বর্ধমান জেলায় বসন চণ্ডীর পূজো করা হয়, তিনি কোন স্থানীয় লৌকিক দেবী এবং তার বসন (পদবী) নাম এই প্রসঙ্গে দুর্বোধ্য।

পশ্চিম বাংলার মেদিনীপুর জেলার কোন কোন অঞ্চলে অবাক চণ্ডী এবং কুলুই চণ্ডীর পূজো হয়। মেদিনীপুর জেলা শহর থেকে দেড় মাইল দূরে ঘোড়াতলা নামে একটি স্থানে কুলুই চণ্ডীর নামে এক বাৎসরিক মেলা হয়। গ্রামবাসীরা এই দুই দেবীকে রোগমুক্তির জন্য পূজো করে।

হুগলী জেলার বাদল গ্রামে ককাই চণ্ডীর মন্দির আছে। গ্রামবাসীরা কামলা (জণ্ডিস) রোগ থেকে মুক্তি লাভের জন্য ককাই চণ্ডীকে তার মন্দিরে গিয়ে পূজো করে।বাংলার লৌকিক দেবীদের মধ্যে মঙ্গল চণ্ডী প্রধান আগেই বলেছি, মঙ্গল চণ্ডীর অনেক প্রকারভেদ আছে।

এক: বারমেসে (বছরের বারমাস জুড়ে) মঙ্গল চণ্ডী প্রতি মঙ্গলবার পূজো করা হয়ে থাকে। এই পুজোর জন্ম যে দেবীর স্তব পাঠ করা হয়, তা মধ্যযুগ থেকেই বাংলার উচ্চমানের আখ্যানকাব্যের উপকরণরূপে পরিগণিত। স্ত্রীসমাজে এই দেবীর ভক্তই সর্বাধিক।

দুই: বৈশাখ মাসের প্রতি মঙ্গলবারে হরিষ মঙ্গলচণ্ডীর পূজো হয়ে থাকে। বাংলা এবং সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই দিনটিকে মঙ্গলবার বলা হয় বলে মঙ্গলবারেই সকল মঙ্গল চণ্ডীর পূজো করা হয়। বাংলা হরিষ (সংস্কৃত 'হর্ষ' থেকে উদ্ভূত) শব্দটির অর্থ আনন্দ। বিশ্বাস করা হয় যে, এই দেবীর পূজো করলে মনে অপার 'হর্ষ' বা আনন্দের সঞ্চার হয়।

তিন: জয় মঙ্গলচণ্ডীর পূজো জ্যৈষ্ঠ মাসের মঙ্গলবারেই সাধারণতঃ উদ্যাপিত হয়। এই পূজো করলে বন্ধ্যা নারীও পুত্রসন্তান লাভ করেন বলে বিশ্বাস করা হয়। চার: অগ্রহায়ণ মাসের চারটি মঙ্গলবারে কলাই মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত পালন করা হয়। এই ব্রত পালন করলে চিরকাল পারিবারিক সুনান অক্ষুন্ন থাকে।

পাঁচ: সঙ্কট মঙ্গলচণ্ডী-যে দেবীর পূজো করলে সকল রকম সম্ভাব্য বিপদ থেকে মুক্ত হওয়া যায়, তারই নাম সঙ্কট মঙ্গলচণ্ডী। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষে, মঙ্গলবারে এই পূজো করলে ফললাভ করা যায়

ছয়: কার্তিক মাস থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত প্রতি মঙ্গলবারে উদয় মঙ্গলচণ্ডীর পূজো হয়। এই পূজোর উপকরণ নিতান্তই সামান্য। ভক্তিসহকারে এই পূজো করলে অবিবাহিতার বিবাহ, দরিদ্রের ধনলাভ এবং বন্ধ্যা নারীর সন্তানলাভ হয়ে থাকে।

মাত: অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি মঙ্গলবারেই ভাউত্তা মঙ্গলচণ্ডীর পূজো হয়ে থাকে। এই পূজোর উপকরণ বারমেসে মঙ্গলচণ্ডীর মত। এই পূজো পর পর চারটি বছর করার প্রথা। তবে বারমেসে মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত ভক্তিপরায়ণা নারীরা সারাজীবন ধরেই করে থাকেন!

লৌকিক গ্রামা দেবী বাশুলীর নামও বহু প্রাচীন কাল থেকেই চণ্ডীর সঙ্গে অভিন্ন রূপে পরিচিত হয়ে আসছে। অন্যতম প্রাচীন বাঙালী কবি অনন্ত বন্ধু (যিনি চণ্ডীদাস নামে পরিচিত) নিজেকে চণ্ডীর দাস এবং বাশুলীর সেবক বলে উল্লেখ করেছেন। ওড়িশায় বাশুলী নামে এবং দাক্ষিণাত্যে বিসলমরী বা বিসলমন্ত্রী আম্মা নামে যে গ্রামাদেবী আছেন, তিনিই পশ্চিম বাংলার বাশুলী।

মহিষাসুর বধকারিণীরূপে চণ্ডী বা দুর্গার পৌরাণিক ঐতিহ্যটি বাংলাদেশে বিশেষতঃ বাঁকুড়া এবং বীরভূম জেলায় একান্তভাবে জাতীয় চেতনার অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। দুর্গাপূজোর বাৎসরিক উৎসবে বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে দেবীর বিভিন্ন মূর্তি যথাবিহিত উপাচারের দ্বারা পূজিত হয়ে থাকে। প্রাচীন ধ্যান-ধারণায় দুর্গা মহিষাসুরমর্দিনী এবং তিনি অষ্টবাহুবিশিষ্টা; কিন্তু পরবর্তীকালে বাংলাদেশে তিনি দশভুজারূপেই সমধিক পরিচিত হন। কিন্তু উল্লিখিত জেলা দুটিতে দুর্গাকে বিভিন্নরূপে অর্থাৎ দ্বিবাহু থেকে অষ্টাদশবাহু পর্যন্ত সমন্বিতা দেখা যায়। তবে আজকাল সর্বাধিক পরিচিত দশবাহু বিশিষ্টা মূর্তিও নিতান্ত অপ্রচলিত নয়। উত্তর বাংলার একটি জেলায় পাথরে তৈরী বত্রিশ বাহু বিশিষ্টা দুর্গামূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। দুর্গামূর্তির এই বৈশিষ্ট্যটি নিশ্চয়ই আঞ্চলিক ঐতিহ্যের সৃষ্টি।দুর্গার আর একটি প্রচলিত নাম হল বনদুর্গা। বোঝা যায় যে বন অর্থ অরণ্য, এখানে তিনি অরণ্যদেবী।

ষষ্ঠী :-

নবজাত শিশুর অভিভাবিকা দেবীর নাম ষষ্ঠী। শিশুর জন্মের ষষ্ঠ দিনে ষষ্ঠী পূজোর ব্যাপক প্রচলন আছে। গ্রামাঞ্চলের কোন কোন প্রকাশ্য স্থানে কোন সিজ মনসার গাছের নীচে 'ষষ্ঠীর থান' বা ষষ্ঠীতলা দেখতে পাওয়া যায়। সেখানে সন্তানের মঙ্গল কামনায় মায়েরা ষষ্ঠীর পুজো দিয়ে থাকেন। যেখানে কোন সাধারণের জন্য গ্রামে

কোন পূজোর 'খান' নেই, সেখানে ঘরেই পূজো দেওয়া হয়। শিশুর জন্মের পরই ষষ্ঠ দিনে ষষ্ঠীর যে পূজো হয়, তা সব সময়ই ঘরেই দেওয়া হয়। তার বিশেষ প্রক্রিয়া আছে, নীচে তার বর্ণনা করা হলো। তবে তার মধ্যে সারা বাংলাদেশ জুড়ে কিছু আঞ্চলিক পার্থক্য আছে।

শিশুর জন্মের ষষ্ঠ দিনে রাত্রি প্রায় দশটার সময় আঁতুড় ঘরের ভিতরের দিকে রুদ্ধ দরজার মাঝখানে একটি ছোট্ট কাঠের পিড়ি পাতা হয়। জলপূর্ণ একটি ছোট্ট ঘট ও একটি নূতন গামছা পিঁড়িটির উপরে রাখা হয়। কলাগাছের বাকল দিয়ে তৈরী ছুটি পাত্র, একটিতে চাল, আর একটিতে ধান পূর্ণ করে পাশাপাশি রেখে দেওয়া হয়। চাল দিয়ে যে পাত্রটি ভরে দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে কয়েকটি পাকা কলা, কিছু মিষ্টদ্রব্য এবং অন্যান্য কিছু পূজোর খাদ্য সামগ্রী রাখা হয়। এক জোড়া বালা, রঙিন সূতোয় তৈরী এক টুকরো কোমর-বন্ধনী, সোনা এবং রূপোর কয়েকটি টুকরো, একটি কলম ও একটি দোয়াত সেই কাঠের পিড়ির উপর রাখা হয়। কাঠের আসনটির সামনে একখানি নূতন কাপড় বিছিয়ে দেওয়া হয়। পাঁচটি সলতে ঘিয়ে ভিজিয়ে তা দিয়ে একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিতে হয়। মনে করা হয় যে, গভীর রাত্রে চিত্রগুপ্ত ঠাকুর সূতিকা গৃহে প্রবেশ করেন এবং কাঠের আসনটির উপর তিনি বসেন। তিনি পুজোর সামগ্রী সবই গ্রহণ করেন এবং তার বিনিময়ে নবজাত শিশুকে একটি বর দেন। শিশুকে ধনরত্নের বর দেবার কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই সোনা এবং রূপোর টুকরোগুলো তার সামনে রাখা হয়। সূতিকা গৃহ পরি- ত্যাগ করে যাবার আগে চিত্রগুপ্ত ঠাকুর নিজের হাতে শিশুর ললাটে তার ভাগ্যলিপি লিখে যান। এই লেখা অনুযায়ী শিশুর ভবিয়্যৎ জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়, কিন্তু তাঁর সেই লেখা কেউ পড়তে পারে না। সূতিকা গৃহের দরজা ভিতর দিয়ে বন্ধ থাকে, কেবলমাত্র প্রসূতি আর ধাত্রী বা দাই ভিতরে থাকতে পারে। পরিবারের কোন মহিলা বাইরে থেকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা ভিতরে কি করছ, তা বল। প্রসূতি কিংবা ধাত্রী তার জবার দেয়, আমরা ষষ্ঠীপূজো করছি। সাতবার এই প্রশ্ন করা হয় এবং সাতবার একই জবাব দেওয়া হয়। কিন্তু প্রতিবারই জবাব দেওয়ার আগে শিশুকে এক টুকরো নূতন কাপড়ের উপর শোয়ান হয় এবং প্রতিবারই তাকে কোলে তুলে নেওয়া হয়। তারপর আঁতুড় ঘরের বাইরে যে সকল মহিলা সমবেত হন, তাঁরা মঙ্গলসূচক উলুধ্বনি করেন (জিহ্বার অগ্রভাগ দিয়ে দুঠোটের মধ্যবর্তী অংশে আঘাত করে এই মঙ্গলধ্বনি করা করা হয়)। যদি ছেলের জন্ম হয় তবে পাঁচবার, আর যদি মেয়ের জন্ম হয় তবে তিনবার উলুধ্বনি করা হয়। প্রসূতি এবং ধাত্রী অবশিষ্ট রাত জেগে থাকেন এবং দুজনেই শিশুকে ছোটখাট উপদেশ দিয়ে থাকেন, যেমন শত্রুর ভয় করো না, বাঘ, হাতী, ভালুক, ভূত-প্রেতের ভয় করো না ইত্যাদি। শিশুর জন্মের ছয়দিন পূর্ণ হওয়ার আগে আঁতুড় ঘরের মধ্যে যে কাঠের আগুন জ্বালানো হয়, তা থেকে কোন পোড়া কাঠের টুকরো বাইরে আনা হয় না। শিশুর জন্মের সপ্তম কিংবা নবম দিনে প্রত্যুষে বাড়ীর গৃহিনী অন্যে দেখতে না পায় এভাবে আঁতুড় ঘর থেকে কিছু ছাই এবং অঙ্গার বাইরে নিয়ে এসে

একটি কড়ি, কিছু হলুদ, সরষের তেলের একটি প্রদীপসহ একটি নূতন অগ্রপাত (কলাপাতার অগ্রভাগ) কেটে তার উপর রেখে বাড়ীর ভিতরই কোন কলাগাছের নীচে রেখে আসেন। তিনি কলাগাছটিতে সাতবার ঘুরিয়ে একটি সূতো বেঁধে দেন। এই সূতোটি পরে খুলে নেওয়া হয় এবং কিছুকালের জন্য তা নবজাতকের কোমর-বন্ধনীরূপে ব্যবহার করা হয়।

বসন্ত রোগ-শীতলা: সারা ভারতে রোগ প্রতিষেধক দেবতাদের মধ্যে শীতলার নাম পরিচিত। বাংলায় তার একটি বিশেষ পূজো-পদ্ধতি গড়ে উঠেছে।গ্রামে বসন্ত রোগ যখন মহামারী রূপে দেখা দেয়, তখন গ্রামবাসী রোগের প্রকোপ কমে আসবার সময় শীতলার পূজো দেবে বলে ঘোষণা করে (শীতলা শব্দের অর্থ, যে দেবী শীতল)। গ্রামবাসী মনে করে যে, দেবী শীতলার ক্রোধেই গ্রামে এই রোগের সৃষ্টি হয়েছে! তাঁকে ভয়ানক অনিষ্টকারিণী দেবী বলে মনে করা হয়। তাঁর প্রতি ভয় বশতঃ গ্রামবাসী তাঁর নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করে না, বসন্ত রোগকে তারা বলে 'মায়ের দয়।'। বর্তমানে দেবীর স্তব অনুযায়ী মাটির প্রতিমা তৈরী করে পূজো করা হলেও চল্লিশ বছর আগে দেবীর কোন মূর্তি ছিল না-কেবলমাত্র তাঁর প্রতীকের মধ্যেই তাঁর পূজো করা হতো। আজ পর্যন্ত কোন কোন স্থায়ী শীতলা মন্দিরে এই প্রথাই প্রচলিত দেখা যায়। স্থায়ী মন্দিরে প্রত। হই দেবীর পুজো হয়। সাধারণতঃ গোড়া ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা শীতলা পূজোয় অংশ গ্রহণ করেন না। তবে এখন অর্থনৈতিক কারণে তাঁরাও কোন কোন সময় এ কাজ করে থাকেন। স্কাইখীয়া (প্রাচীন ইরাণ) থেকে আগত এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সাধারণতঃ এই দেবতার পূজো করে থাকেন। তাঁরা বসন্ত রোগের নানা ত্বত্তাক্ ঔষধেরও ব্যবস্থা করেন। এই রোগের নিয়মিত বিশেষ কোন চিকিৎসা না থাকবার জন্ম বাধ্য হয়ে সাধারণ লোক তাঁদের কাছেই ঔষধের জন্য গিয়ে থাকে এবং এই সকল চিকিৎসকেরা তার জন্য শুধু যে কেবল ত্বত্তাক্ ঔষধেরই ব্যবস্থা করে তাই নয়, তারা রোগীর কল্যাণে শীতলা পূজোও করে থাকে। এজন্য অবশ্য তারা নির্দিষ্ট পাওনা দাবী করে। বারোয়ারী পূজোয় পশুবলি হয়, গ্রামের বাইরে সাধারণতঃ বারোয়ারী পূজোর অনুষ্ঠান হয়।

পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে সাধারণের জন্য শীতলা মন্দির আছে। তাদের মধ্যে যে পুরোহিত নিযুক্ত থাকে, তিনি দেবীর কাছে ব্যক্তিবিশেষের মানসিক পূজোও নিবেদন করে থাকেন। অর্থনৈতিক দিক থেকে সুবিধাজনক বলে এই ভয়ঙ্করী দেবীর পূজোর এইটাই সব চাইতে সুলভ ব্যবস্থা। পরিবারের কেউ যদি কখনো বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়, তবে পরিবারের সব চাইতে বয়ঃজ্যেষ্ঠা মহিলা দৈনিক একটি টাকার এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ কম পক্ষে 'সোয়া পাঁচ আনা' পয়সা কিংবা পরিবারের সামর্থ্য অনুযায়ী আরো বেশী রোগীর কপালে ছুঁইয়ে তা সাধারণ খরচের তহবিল থেকে সরিয়ে অশ্বত্র তুলে রাখেন। রোগী রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করবার পর সেই অর্থ এনে শীতলার মন্দিরে দেওয়া হয়। রোগ থেকে রোগীকে মুক্ত করে দেবী যে দয়া করেছেন বলে মনে করা হয়, তারই কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এইভাবে তাঁর পূজো করা হয়।

(খ) কলেরা-ওলাবিবি: তীব্রতার দিক থেকে বসন্ত রোগের পরই কলেরা রোগের উল্লেখ করতে হয়। তাকে বাংলায় বলে ওলাওঠা। সেইজন্য এই রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম ওলা। এই শব্দটির বাংলা অর্থ নীচের দিকে নাম। এবং ওঠা শব্দটির দ্বারা উপরের দিকে উঠা বা বমি করা বুঝায়। এই দুটিই রোগের ছুটি প্রধান লক্ষণ। দেবীর নাম শুধু 'ওলা'র পরিবর্তে কখনো কখনো 'ওলাই' শুনতে পাওয়া যায়। হিন্দুরা তার সঙ্গে সাধারণতঃ স্ত্রীদেবতাসূচক চণ্ডী শব্দটি প্রত্যয়রূপে যোগ করে থাকে এবং তাকে ওলাই-চণ্ডী বলে উল্লেখ করে। মুসলমান গ্রামবাসী ভার সঙ্গে মহিলা অর্থে ফারসী শব্দ বিবি শব্দটি ব্যবহার করে এবং তাকে ওলাবিবি বলে সম্বোধন করে। যদিও মুসলমান ধর্মে সব রকম পুজোই নিষিদ্ধ, তথাপি নিরক্ষর গ্রামবাসী মুসলমান ধর্মাবলম্বীরা এই রোগের প্রতি ভয় বশতঃ ওলাবিবির নামে সিন্নি দেয়। কোন কোন সময় ওলার এক ভগ্নীরূপে ঝোলারও একই সঙ্গে সিল্লি দেওয়া হয়। তাই কোন কোন সময় তাকে ওলাঝোলার পুজো বলা হয়।

যখন মড়কের আকারে কলেরা রোগ গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে, তখন রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলে যাঁকে কল্পনা করা হয়, তাঁর ক্রোধ প্রশমিত করবার জন্য তাকে সাধারণতঃ পশুবলি দিয়ে পূজো করা হয়। কোন কোন সময় গ্রামের কোন প্রান্তবর্তী অঞ্চলে কোন নির্জন বৃক্ষের ছায়াতলে পুজোর দিনে দুটি একটি তার ভগিনী ঝোলার, এনে স্থাপন করা হয়। পৌরোহিত্য করে থাকে। গতানুগতিক উপকরণ মাটির প্রতিমা, একটি ওলার আর নিম্নশ্রেণীর কোন হিন্দু পূজোয় দিয়েই পূজো করা হয়, তবে লাল রঙের উপকরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এক টুকরো লাল গামছা, সিদুর এবং লাল ফুল দেবতাকে নিবেদন ক হয়। একটি পশু বলি দেওয়া হয় এবং তার রক্ত পূজোর উপকরণের উপর ছড়িয়ে দেওয়া হয়। পূজো শেষ হয়ে গেলে পূজোর কোন নৈবেদ্য ঘরে নিয়ে যেতে পারা যায় না। তা পূজার স্থানেই বসে খেয়ে ফেলতে হয়, নতুবা গ্রামের সীমানার বাইরে নিয়ে ফেলে দিতে হয়। কোন গোঁড়া হিন্দু এই প্রসাদ গ্রহণ করবে না, এমন কি, সাধারণ গ্রামবাসীও এই বিষয়ে ইতস্ততঃ করবে। 24 পরগণা জেলার দক্ষিণে গ্রামের মুসলমান অধিবাসীদের ওলাবিবির সিন্নি দেবার জন্য আলাদা নির্দিষ্ট পবিত্র 'খান' আছে, সেখানে তারা নিজেদের মতে প্রার্থনা করে।

কোন কোন স্থানে এই দেবতার জন্য স্থায়ী মন্দিরও আছে। প্রকৃতপক্ষে যে সকল স্থানে দেবতাদের জন্য স্থায়ী মন্দির এবং তাদের পূজোর জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা আছে, সেখানে পূজোর নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য অনেক সময় লোপ পায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, বাঁকুড়া জেলায় ওলাই চণ্ডীর একটি প্রসিদ্ধ মন্দির আছে। যদিও স্পষ্টই বুঝতে পারা যায়

যে, গ্রামে কোন সময় কলেরা মহামারী রূপে দেখা দিয়েছিল বলেই এই দেবীর সেখানে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখন দেখা যায়, সারা বছর ধরেই নানাবিধ রোগের প্রতিষেধক দেবীরূপেই তাঁর পূজো হয়। অবশ্য এ কথাও স্বীকার করতে হয় যে, কলেরা-মহামারীর সময় তার পূজোর গুরুত্ব এখনো অনেক পরিমাণে বেড়ে যায়। গ্রীষ্মকালে ওলাই চণ্ডীর যখন একদিন বাৎসরিক পূজো হয়, তখন তাঁর মন্দিরের সামনে শত শত পাঁঠা বলি হয়। মনে করা হয়, তাতে এই অঞ্চলে কলেরার প্রাদুর্ভাব হবে না।

উত্তরবঙ্গে কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যে দেবীর পূজো হয়, তাঁর নাম রক্ষাকালী। তার অর্থ যে কালী রক্ষা করে থাকেন। নামটি অল্পদিনের মধ্যে যে হিন্দু প্রভাবিত হয়েছে, তা বুঝতে পারা যায়। ব্রাহ্মণ পুরোহিত দেবীর পূজো করে থাকেন। গ্রামের বাইরে অস্থায়ী মণ্ডপ নির্মাণ করে তার পূজো হয়।

কোন কোন সময় কলেরার আবির্ভাব হলে গ্রাম-দেবতাদেরও পূজো দিয়ে তৃপ্ত করা হয়। এই উপলক্ষে বর্ধমান জেলায় বসন চণ্ডী নামে এক লৌকিক দেবীর পূজো হয়। বাঁকুড়া জেলার পশ্চিম সীমান্তে নরেন্দ্রপুর গ্রামে কলেরার সময় ভাঙানালা নামে এক গ্রাম-দেবতার পুজো হয়। ভিন্ন গ্রামের লোকও তাদের গ্রামে কলেরার আবির্ভাব হলে এই গ্রামের দেবতার কাছে পুজো দেবার জন্য সমবেত হয়।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোক-সংস্কৃতি

Abanindranath Thakur Banglar Brata

পল্লব সেনগুপ্ত, পূজাপার্ব নের উৎসকথা, কলকাতা: পুস্তক বিপনী, ১৯৫৯

June McDaniel, Making Virtuous Daughters and Wives: An Introduction to Women's Brata Rituals in Bengali Folk Religion, State University of New York Press, 2012

James Ponniah, Culture Religion and Home-making in and Beyond South Asia, Fortress Press, 2020

সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী ঃ

১) How is Magic related with premitive religion?

২) What do you know about Vratas in the context of Bengal?

৩) Discuss the importance of Goddesses like Sitala & Manasa in the folk religion of Bengal.

পর্যায়- ৫

লোকশিল্প ও কলা

একক-১৩ ও ১৪

উদ্দেশ্য ঃ এই পর্যায় অধ্যয়ন করে ছাত্র ছাত্রীরা বাংলার লোকশিল্পের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ও তার ধরন সম্পর্কে অবগত হবে।

নকশি কাঁথা, পটচিত্র, আলপনা, শোলা ঃ-

নকশি কাঁথা

নকশি কাঁথা হলো সাধারণ কাঁথার উপর নানা ধরনের নকশা করে বানানো বিশেষ প্রকারের কাঁথা। নকশি কাঁথা শত শত বছরের পুরনো ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের লোকশিল্পের একটা অংশ।

সাধারণত পুরাতন কাপড়ের পাড় থেকে সুতা তুলে অথবা তাঁতিদের থেকে নীল, লাল, হলুদ প্রভৃতি সুতা কিনে এনে কাপড় সেলাই করা হয়। ঘরের মেঝেতে পা ফেলে পায়ের আঙ্গুলের সঙ্গে কাপড়ের পাড় আটকিয়ে সূতা খোলা হয়। এই সূতা পরবর্তীতে ব্যবহারের জন্য রেখে দেয়া হয়। সাধারণ কাঁথা সেলাইয়ের পর এর উপর মনের মাধুরী মিশিয়ে ফুঁটিয়ে তোলা হয় বিভিন্ন নঁকশা যার মধ্যে থাকে ফুল, লতা, পাতা ইত্যাদি।২০০৮ সালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নকশি কাঁথার ভৌগোলিক স্বীকৃতি পেয়েছে।

কাঁথা শব্দটির কোন উৎস স্পষ্টভাবে জানা যায়নি।সঠিকভাবে জানা না গেলেও ধারণা করা হয় কাঁথা শব্দটি পূর্বে উচ্চারিত হত "খেতা" বলে।[] বাংলায় ধানের ক্ষেতকে অনেক সময় "খেত" বলা হয়। নিয়াজ জামানের মতে, কাঁথা শব্দটি উৎপত্তি হয়েছে সংস্কৃতি শব্দ "কঁথা" হতে। "কঁথা" শব্দটির বাংলা হলো ত্যানা। বা কাপড়ের টুকরা।

অন্যান্য লোকশিল্পের মতো কাঁথার উপর দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিস, আবহাওয়া, পরিবেশ ও অর্থনৈতিক প্রভাব আছে। সম্ভবত প্রথমদিকে কাঁথা ছিল জোড়া তালি দেওয়া কাপড়। পরবর্তীতে এটি থেকেই নকশি কাঁথার আবির্ভাব।

গ্রামাঞ্চলের নারীরা পাতলা কাপড়, প্রধানত পুরানো কাপড় স্তরে স্তরে সজ্জিত করে সেলাই করে কাঁথা তৈরি করে থাকেন। কাঁথা মিতব্যয়ীতার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ, এখানে একাধিক পুরানো জিনিস একত্রিত করে নতুন একটি প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করা হয়। কাঁথা তৈরির কাজে পুরানো শাড়ি, লুঙ্গি, ধুতি ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী কাঁথার পুরুত্ব কম বা বেশি হয়। পুরুত্ব অনুসারে তিন থেকে সাতটি শাড়ি স্তরে স্তরে সাজিয়ে নিয়ে স্তরগুলোকে সেলাইয়ের মাধ্যমে জুড়ে দিয়ে কাঁথা তৈরি করা হয়। সাধারণ বা কাঁথাফোঁড়ে তরঙ্গ আকারে সেলাই দিয়ে শাড়ীর স্তরগুলোকে জুড়ে দেয়া হয়। বিভিন্ন রঙের পুরানো কাপড় স্তরীভূত করা থাকে বলে কাঁথাগুলো দেখতে বাহারী রঙের হয়। সাধারণত শাড়ীর রঙ্গীন পাড় থেকে তোলা সুতা দিয়ে কাঁথা সেলাই করা হয় এবং শাড়ীর পাড়ের অনুকরণে কাঁথাতে নকশা করা হয়। তবে কোন কোন অঞ্চলে (প্রধানত রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জ এলাকায়) কাপড় বোনার সুতা দিয়েও কাঁথাতে নকশা করা হয়ে থাকে।সাধারণ কাঁথা কয়েক পাল্লা কাপড় কাঁথাফোঁড়ে সেলাই করা হলেও এই ফোঁড় দেয়ার নৈপুণ্যের গুণে এতেই বিচিত্র বর্ণের নকশা, বর্ণিল তরঙ্গ

ও বয়নভঙ্গির প্রকাশ ঘটে। নকশার সাথে মানানোর জন্য বা নতুন নকশার জন্য কাঁথার ফোঁড় ছোট বা বড় করা হয় অর্থাৎ ফোঁড়ের দৈর্ঘ্য ছোট-বড় করে বৈচিত্র্য আনা হয়। উনিশ শতকের কিছু কাঁথায় কাঁথাফোঁড়ের উদ্ভাবনী প্রয়োগকে কুশলতার সাথে ব্যবহার করার ফলে উজ্জ্বল চিত্রযুক্ত নকশা দেখা যায়।কাঁথাফোঁড়ের বৈচিত্র্য আছে এবং সেই অনুযায়ী এর দুটি নাম আছেঃ পাটি বা চাটাই ফোঁড় এবং কাইত্যা ফোঁড়।

বেশিরভাগ গ্রামের নারী এই শিল্পে দক্ষ। সাধারণত গ্রামের মহিলারা তাদের অবসর সময় নকশি কাঁথা সেলাই করে থাকেন। এক একটি কাঁথা সেলাই করতে অনেক সময়, এমনকি ১ বছর সময়ও লেগে যায়। এক একটি কাঁথা সেলাইয়ের পিছনে অনেক হাসি-কান্নার কাহিনী থাকে। বিকেল বেলা বা রাতের খাবারের পর মহিলারা একসাথে বসে গল্প করতে করতে এক একটি কাঁথা সেলাই করেন। তাই বলা হয় নকশি কাঁথা এক একজনের মনের কথা বলে। এটি মূলত বর্ষাকালে সেলাই করা হয়। একটা প্রমাণ মাপের কাঁথা তৈরিতে ৫ থেকে ৭ টা শাড়ী দরকার হয়। আজকাল পুরাতন সামগ্রীর বদলে সূতির কাপর ব্যবহার করা হয়। ইদানীং কাঁথা তৈরিতে পুরাতন কাপড়ের ব্যবহার কমে গেছে।

মূলত নকশা করার পূর্বে কোন কিছু দিয়ে এঁকে নেওয়া হয়। তারপর সুঁই-সুতা দিয়ে ওই আঁকা বরাবর সেলাই করা হয়। কাঁথায় সাধারণত মধ্যের অংশের নকশা আগে করা হয় এবং ধীরে ধীরে চারপাশের নকশা করা হয়। আগে কিছু কাঁথার নকশা আঁকানোর জন্য কাঠের ব্লক ব্যবহার করা হত, এখন ট্রেসিং পেপার ব্যবহার করা হয়।

নকশি কাঁথা সেলাইয়ের কোনো নির্দিষ্ট নকশা নেই। যিনি সেলাই করেন তার মনে যা আসে তা-ই তিনি সেলাই করে যান। বলা যায় এটি হচ্ছে মনের ডাইরি। সূর্য, চাঁদ, গাছ, পাখি, মাছ, ফল, মানুষ, ময়ূরসহ বিভিন্ন নকশা করা হয় নকশি কাঁথায়।

প্রথম দিকে শুধু চলমান সেলাই কাঁথা প্রচলিত ছিল যা ফোড় নামেও পরিচিত। বর্তমানে চাটাই সেলাই, কাইত্যা সেলাই, যশুরে সেলাই, রিফু সেলাই, কাশ্মীরি সেলাই, শর সেলাই, ইত্যাদি সেলাই দিয়ে কাঁথা তৈরি হয়। মাঝে মধ্যে হেরিংবোন সেলাই, সাটিন সেলাই, ব্যাক সেলাই ও ক্রস সেলাই ব্যবহার করা হয়।

কাঁথা সাধারণত লেপের মতো মুড়ি দিয়ে ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন ধরনের কাঁথা গুলো হলোঃ

- **লেপ-কাঁথা** - ইহা আকারে বড় ও মোটা হয়।
- **শুজনি কাঁথা** – এই কাঁথা লেপ কাঁথার মত বড় আকারের, তবে এই কাঁথা পাতলা হয়।
- **রূমাল কাঁথা** – সাধারণত এই কাঁথা এক বর্গফুট আকারের কাঁথা।
- **আসন কাঁথা** – এটা বসার কাজে ব্যবহৃত হয়।
- **বস্তানি বা গাত্রি** - এরকম কাঁথা ভারী ও মূল্যবান জিনিসপত্র এবং কাপড় চোপড় ঢেকে রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়।
- **আর্শিলতা** - আর্শি (আরশি) বা আয়না, চিরুনি ইত্যাদি ঢেকে রাখার কাজে ব্যবহার হয় এই কাঁথা।
- **দস্তরখান** - মেঝেতে খাবার সময় পেতে তার উপরে খাবার দাবার ও বাসনপত্র রাখা হয়।
- **গিলাফ** - খাম আকারের এই কাঁথার মধ্যে কোরআন শরীফ রাখা হয়।

নকশা

নকশি কাঁথার নকশাগুলোতে ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংস্কৃতির গভীর প্রভাব রয়েছে। যদিও কোন নির্দিষ্ট নিয়ম মানা হয় না, তবে ধরে নেওয়া হয় প্রত্যেকটা ভালো সেলাইকৃত নকশি কাঁথার একটি কেন্দ্র থাকবে। বেশিরভাগ কাঁথার কেন্দ্র হলো পদ্ম ফুল এবং পদ্ম ফুলের আশে পাশে নানা রকম আঁকাবাঁকা লতার নকশা থাকে। কখনো শাড়ীর পাড় দিয়ে সীমানা তৈরি করা হয়। নকশাতে ফুল, পাতা, পাখি মাছ, প্রাণী, রান্না আসবাব, এমনকি টয়লেট সামগ্রীও থাকতে পারে। বেশির ভাগ কাঁথার প্রাথমিক কিছু নকশা একই রকম হলেও দুইটি কাঁথা একই রকম হয় না। সাধারণত কাঁথাতে একই নকশা বারবার ব্যবহৃত হয়। উল্লেখযোগ্য নকশাগুলো হলোঃ

পদ্ম নকশা

পদ্ম নকশা নকশি কাঁথাগুলোতে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। পদ্ম ফুল হিন্দুধর্মের দেবদেবীর সাথে যুক্ত, এই জন্যও এটি বেশ জনপ্রিয়। পদ্মফুল হলো স্বর্গীয় আসন। এটা অবশ্য মহাজাগতিক মিলন ও নারীর প্রয়োজনীয়তাকেও বোঝায়। পদ্ম শাশ্বত আদেশ এবং আকাশ, মাটি ও পানির ঐক্য হিসেবেও মূর্ত। এটি জলের জীবনদায়ক ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব করে এবং এছাড়াও পাপড়ির খোলা ও বন্ধ করা অবস্থাকে সূর্যের সাথে তুলনা করা হয়। এটি পবিত্রতার প্রতীক। এটি ধনসম্পদের দেবী লক্ষ্মীর প্রতীক। অষ্টদল থেকে শুরু করে শতদল বিভিন্ন ধরনের পদ্ম নকশা রয়েছে। পুরাতন প্রায় প্রত্যেকটা কাঁথাতে মাঝখানে একটি ফুটন্ত পদ্ম দেখতে পাওয়া যেত।

সূর্য নকশা

এই নকশা পদ্ম নকশার কাছাকাছি নকশা। কখনো কখনো এই দুই নকশা কাঁথার কেন্দ্রে একসাথে দেখা যায়। এটি সূর্যের জীবনদায়ক ক্ষমতার প্রকাশ করে। সূর্য হিন্দুদের ধর্মীয় ও বিবাহ উভয় আচারেই গুরত্ব বহন করে।

চন্দ্র নকশা

চন্দ্র নকশাতে মুসলমান ধর্মীয় প্রভাব রয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় নক্ষত্র সহযোগে একটি অর্ধচন্দ্রাকার নকশা। এই নকশা মূলত জায়নামাজ কাঁথায় দেখতে পাওয়া যায়।

চাকা নকশা

সাধারণত চাকা নকশা হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়েরই ভারতীয় কলার প্রতীক। এটি আদেশের প্রতীক। এটি অবশ্য বিশ্বকেও প্রতিনিধিত্ব করে। যদিও বেশির ভাগ কাঁথা নির্মাতা চাকার গুরুত্ব জানেনা, তবুও এটি বেশ জনপ্রিয়। এটি চাটাই ফোর এর তুলনায় সহজ। পূর্বে এটি বর্ক রেখা বেষ্টিত হলেও বর্তমানে এটি

স্বস্তিকা নকশা

সংস্কৃতিতে *সু অস্তি* মানে হলো *এটি ভাল*। এই নকশা সিন্ধু সভ্যতার সমসাময়িক। এটি ভালো ভাগ্যের প্রতীক। এটি *মিছরি* অথবা *গোলক ধাঁধা* হিসেবেও পরিচিত। সময়ের সাথে, মহেঞ্জোদাড়ো আমলের সোজা রেখা সংবলিত স্বস্তিকার চেয়ে বক্ররেখা বেষ্টিত স্বস্তিকা এখন বেশি ব্যবহৃত হয়। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন প্রত্যেকটা ধর্মে এই প্রতীকের গুরুত্ব রয়েছে।

জীবনবৃক্ষ নকশা

পিপল বৌদ্ধদের নিকট পবিত্র বৃক্ষ, কেননা বুদ্ধ এই গাছের ছায়াই বসেই বোধিপ্রাপ্ত হন। এটি প্রকৃতির সৃষ্টির ক্ষমতা প্রতিফলিত করে এবং বাংলাদেশে অনেক জনপ্রিয়। আঙ্গুরগাছ ও লতাপাতার কাঁথার নকশায় যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে এবং এতে জীবন বৃক্ষের মতো একই রকম প্রতীক বহন করে। পান পাতার লহরি রাজশাহীতে অনেক জনপ্রিয়।

কালকা নকশা

মুঘল আমল থেকে আজ পর্যন্ত এই নকশা ব্যবহার করা হয়।কালকা নকশার উৎপত্তি পারস্যে ও কাশ্মীর এবং এটি বর্তমানে উপমহাদেশের অবিচ্ছেদ্য নকশা।

বাংলার পটচিত্র

প্রাচীন বাংলার অন্যতম সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হল **পটচিত্র।** এটি পট বা বস্ত্রের উপর আঁকা একপ্রকার লোকচিত্র। প্রাচীনকালে যখন কোন রীতিসিদ্ধ শিল্পকলার অস্তিত্ব ছিলনা তখন এই পটশিল্পই বাংলার শিল্পকলার ঐতিহ্যের বাহক ছিল। যারা পটচিত্র অঙ্কন করেন তাদের পটুয়া বলা হয়।

পট শব্দের প্রকৃত অর্থ হল **কাপড়**। শব্দটি সংস্কৃত "পট্ট "থেকে এসেছে। বর্তমানে এই শব্দটিকে *ছবি, ছবি আঁকার মোটা কাপড় বা কাগজের খন্ড* ইত্যাদি অর্থেও ব্যবহার করা হয়। পটের উপর তুলির সাহায্যে রং লাগিয়ে বস্তুর রূপ ফুটিয়ে তোলাই পট চিত্রের মূলকথা। এতে কাহিনী ধারাবাহিক ভাবে চিত্রিত হতে থাকে । অন্তত আড়াই হাজার বছর ধরে পটচিত্র এ উপমহাদেশের শিল্প জনজীবনের আনন্দের উৎস, শিক্ষার উপকরণ এবং ধর্মীয় আচরণের অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। বাংলাদেশের পটচিত্রের মধ্যে **গাজীর পট** ও পশ্চিমবঙ্গের পটচিত্রের মধ্যে **কালীঘাটের পট** উল্লেখযোগ্য । পট মূলত দুই ধরনের রয়েছে। যথা:

- **জড়ানো পট:** এ ধরনের পট ১৫-৩০ ফুট লম্বা এবং ২-৩ ফুট চওড়া হয়।
- **চৌকা পট:** এগুলোর আকারে ছোট হয়।

কাপড়ের উপর গোবর ও আঠার প্রলেপ দিয়ে প্রথমে একটি জমিন তৈরি করা হয়। সেই জমিনের উপর তুলি দিয়ে বিভিন্ন চিত্র অঙ্কিত হয়।

পটের প্রকারভেদে

সাধারণভাবে পটকে ছয়ভাগে বিভক্ত করা যায়। সেগুলি হল - বিষয়নিরপেক্ষ, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, ধমীয়, সামাজিক এবং পরিবেশগত। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে বিষয়নিরপেক্ষ পটগুলির মধ্যে যে কোনও ধরনের নর ও নারীর ছবি অথবা শিল্পচিত্র দেখা যায় এবং সামাজিক পট বলতে বোঝায় সামজিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য যে পটচিত্র গুলি অঙ্কণ করা হয় সেইগুলি। যেমন পোলিও টীকাকরণ অভিযান, ম্যালেরিয়া দূরীকরণ, সাম্প্রদায়িক সম্পৃতী, বৃক্ষরোপন, এইডস সন্মন্ধীয় সচেতনতা বৃদ্ধি, মানবাধীকার ও নারীনিগ্রহ বিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধি সঙ্ক্রান্ত

পটচিত্রগুলি। আবার বিষয়বৈচিত্র অনুসারে সংগৃহীত পটগুলিকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়; যেমন-চকসুদন পট, যমপট, সাহেবপট, কালিঘাটপট, গাজিপট, সত্যপীরের পট, পাবুজীপট, হিন্দুপ্রান পট ইত্যাদি।

পটচিত্রের সমৃদ্ধ ইতিহাস আছে যা আজও বহমান। পশ্চিমবঙ্গে পটুয়া নামক এক সম্প্রদায় আছে, তার অর্থ যারা পট আঁকে। চটের উপর ছবি আঁকা এদেশে এক অতি প্রাচীন রীতি ছিল। আজ তা মোটা কাপড় এবং কোন কোন সময় হাতে তৈরী মোটা কাগজের উপর আঁকা হয়। প্রাচীনকালে এদেশে এক শ্রেণীর পট আঁকা হতো তাকে যমপট বলত, এককালে তা এদেশে প্রায় ঘরে ঘরে দেখানো হতো। তাদের যমপট বলবার কারণ এই যে মৃত্যুর পর যমপুরীতে গিয়ে কি যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়, তারই চিত্র এগুলোর মধ্যে দেখান হতো। আজ পর্যন্তও তার ধারা একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় নি। এখানকার বিভিন্ন পৌরাণিক বিষয় নিয়ে আঁকা পটগুলোতেও নরকে পাপীর যন্ত্রণাভোগের যে দু একটি ছবি থাকে, তা থেকে তা বুঝতে পারা যায়।

গ্রামীণ বাংলায় পটুয়ারাই দীর্ঘদিন যাবৎ পট তৈরী করে আসছেন। এই পটুয়ারা চিত্রশিল্পী জাতিভূক্ত। এই পটুয়ারা পেশাদার শিল্পী যারা তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য ছবি আঁকতেন ও সংগীত পরিবেশন করে থাকেন। সংগীতের বিষয়বস্তু পৌরাণিক, সমসাময়িক বা লোকজ বিষয়ের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। প্রজন্মান্তরে, গ্রাম থেকে গ্রামে এই পটুয়ারা তাঁদের পট নিয়ে গিয়ে কখনও মঙ্গলকাব্য বা বিষয়ানুগ অন্য কোন সংগীত পরীবেশন করেন খাদ্য বা অর্থের বিনিময়ে।পটুয়ারা নিম্নবর্গীয় সামাজিক স্তরে অবস্থান করেন। তারা হিন্দু কিংবা মুসলমান কোন সম্প্রদায়ের মধ্যেই গৃহীত হয় না। তারা প্রত্যক্ষভাবে কোন আদিবাসী সমাজভুক্ত, তাও মনে হয় না। এই ব্যবসায়ের লোকেরা নিজেরাই নিজস্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে বাস করে। তবে এ কথা সত্য, হিন্দু সম্প্রদায় অপেক্ষা মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গেই তাদের বেশী মিল দেখা যায়। তারা রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, মঙ্গলকাব্য কিংবা কোন লৌকিক দেবদেবীর কাহিনী নিয়ে ছবি আঁকে এবং তাদের কাহিনী নিয়ে গান রচনা করে গৃহস্থের বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরে দেখিয়ে তা থেকেই জীবিকা নির্বাহ করে। তারা প্রায় তিন ফুট চওড়া এবং চল্লিশ ফুট লম্বা চটের উপর ছবি আঁকে। তারা একটির নীচে আর একটি করে বিভিন্ন ঘটনার বিষয় আঁকে। যখন পট দেখানোর প্রয়োজন হয়, তখন একটি একটি করে ছবি খুলে দেখায়, দেখানোর সঙ্গে সুরচিত সঙ্গীতে নিজেদের মত করে বিষয়টি বুঝিয়ে দেয়। এই উদ্দেশ্যে যে চট ব্যবহার হয়, তা বিশেষ ভাবে তৈরী করে নেওয়া হয়। কাদার সঙ্গে গোবর মিশিয়ে চটের যে দিকটাতে ছবি আঁকা হবে তা লেপে নিয়ে মসৃণ করা হয়, তারপর তার উপর ছবি আঁকা হয়। পাঁচটি প্রাথমিক রঙ, যেমন সাদা, হলদে, ধূসর, সবুজ, কার্বনের মত কালো এবং লাল এগুলোই প্রধানতঃ ব্যবহার করা হয়। কচিৎ সোনালী রঙের পাতা এবং সোনালী রঙের গুঁড়ো, রুপালী পাতা এবং রুপালী গুঁড়োও রঙ হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তেঁতুল বীচি জলে সিদ্ধ করে যখন কাদার মত হয়, তখন তার সঙ্গে নানা রঙের গুঁড়ো মিশিয়ে ছবি আঁকবার জন্য বিভিন্ন রঙ তৈরী হয়। কতখানি করে গুঁড়ো রঙ কার সঙ্গে মিশালে কি রঙ পাওয়া যাবে, তা চিত্রকরেরা ভাল জানে; তারপর কি ভাবে তাদের ছবির ঔজ্জ্বল্য বাড়ে এবং রঙ দীর্ঘস্থায়ী হয়, সেই বিষয়েও তারা অভিজ্ঞ। চিত্রগুলো বলিষ্ঠ, প্রাণপূর্ণ এবং স্বতঃস্ফূর্ত। কোন কোন সময় বন, গাছপালা অথবা প্রবহমান নদনদীর চিত্র সঙ্কেত চিহ্নে সাহায্যে স্পষ্ট আঁকা হয়। চিত্রের রেখাগুলো চওড়া হয়, এবং তাতে গাঁঢ় করে রঙ দেওয়া হয়।

যাদু পটুয়া- এক শ্রেণীর পটুয়াকে যাদু পটুয়া বলে। যাদু শব্দের অর্থ ইন্দ্রজাল। এই শ্রেণীর চিত্রকর যাদু যা ঐন্দ্রজালিক বিদা জানে এই বিশ্বাস থেকেই তাদের এই নামকরণ হয়েছে। মূলতঃ তারা আদিবাসী মানবগোষ্ঠী থেকে এসেছে। তারা বাংলার পশ্চিম-সীমান্ত অঞ্চলে বাস করত এবং নিজেদের জীবিকা নির্বাহের জন্য আদিবাসী জীবনের উপর ভিত্তি করে চিত্র আঁকত। বর্তমানে অবশ্য এখন তারা নানা হিন্দু পৌরাণিক বিষয়ের উপরও চিত্র আঁকতে আরম্ভ করেছে। অনেক আগে যখন কোন আদিবাসী পরিবারের কোন ব্যক্তির মৃত্যু হতো তখন তারা মৃত ব্যক্তির চিত্র এঁকে তার পরিবারস্থ লোকের কাছে উপস্থিত হতো। চিত্রটি সবদিক থেকে পূর্ণ থাকলেও তার চোখের মণিটি থাকত না। মৃতের আত্মীয় স্বজনকে তার চিত্রকর জানাত যে মৃত ব্যক্তির আত্মা লক্ষ্যহীন হয়ে শূন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার চোখের মণিটি নেই বলে কোথায় কি ভাবে কি করে যেতে হবে, তা সে বুঝতে পারছে না। সুতরাং যদি উপযুক্ত অর্থ এবং পারিতোষিক তাকে দেওয়া হয়, তবে সে তার অঙ্কিত চিত্রের মধ্যে চোখের মণিটি বসিয়ে দিতে পারে, তবেই মৃতের আত্মার অনায়াসে তার নিজের পথে নিজের স্থানে যেতে পারবে। আদিবাসীরা পটায়ার এই কাহিনীটি বিশ্বাস করত এবং তাকে তাদের সাধ্যমত অর্থ এবং পারিতোষিক দিত; তা হাতে পেয়ে যাদু পটায়া তাঁর আঁকা চিত্রের মধ্যে চোখের মণি এবং আর কিছু বাকি থাকলে তা এঁকে মৃতের চিত্রটি পূর্ণ করে দিত। যাদু পটায়ারা পটে পশুপক্ষী, পশুপক্ষীর বাহন সহ নানা লৌকিক দেবদেবীর চিত্র আঁকে। পশুর চিত্রগুলো উল্লেখযোগ্য, কারণ, তাদের মধ্যে সে সম্পর্কে এখনো আদিম জাতির বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। সেগুলো প্রাণপূর্ণ সহজ সরল এবং প্রত্যক্ষ, সঙ্কেত-ধর্মিতা কিংবা রূপকার্য থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

কালীঘাট পটুয়া-কলকাতায় কালীঘাটের কালীমন্দিরের কাছাকাছি বাস করে বলে বাংলার আর এক বিশিষ্ট শ্রেণীর চিত্রকরকে কালীঘাটের পটুয়া বলে। তারা যাদু পট য়াদের মত জড়ানো পটের উপর ছবি আঁকে না। তারা একই পটে পর পর বিভিন্ন ছবি আঁকবার পরিবর্তে আলাদা আলাদা ছোট কাগজে আলাদা আলাদা ছোট চিত্র আঁকে। এরা চিত্রাঙ্গনে আরো দক্ষ; তুলির এক একটি সুস্পষ্ট সুপরিকল্পিত টানে এক একটি সুসমঞ্জস চিত্র ফুটিয়ে তোলে। এরা গতানুগতিক পৌরাণিক বিষয় বস্তু নিয়েও কোন ছবি আঁকে না; যদিও মধ্যে মধ্যে তারা পৌরাণিক দেবদেবীর ছবি আঁকেতথাপি সমসাময়িক এবং ধর্মনিরপেক্ষ বিষয় নিয়েই তাদের ছবি বেশী। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর , দৃষ্টিতে জীবনে-নাগরিক জীবনকে ব্যঙ্গ করা ছবিও এদের বেশী। তাদের জীবনর প্রতি বিশ্বাসহীনতা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার ভাবই প্রকাশ পায়।

মূলতঃ কালীঘাটের পট দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল-রাশী পট (রাশী অর্থে একত্র জমিয়ে রাখা, কারণ, তাদের রাষ্ট্র রাশী করে এক সঙ্গে সস্তা কাগজের উপর আঁকা হতো) ও রাজপট (অর্থাৎ রাজা বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহার্য পট)। রাজপট হাতে-ভৈরী দামী কাগজের উপর আঁকা হতো।

বাংলায় পটচিত্রের বিভিন্ন রূপকল্প দেখা যায়। যথা-

পৌরানিক পট

পৌরানিক বিভিন্ন গল্প ও গাথা এই পটের উপজীব্য। সেগুলি হল রাবন বধ, সিতা হরণ, রাজা হরিশ্চন্দ্র, কৃষ্ণলীলা, দুর্গালীলা, সাবিত্রী-সত্যবান, মনসা মঙ্গল, চন্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, আনন্দ মঙ্গল ইত্যাদি।

ঐতিহাসিক পট

ঐতিহাসিক পটের উপজীব্য যা এর নাম থেকেই প্রকাশিত তা হল ঐতিহাসিক ঘটনাবলী। যেমন- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, আজাদ্ হিন্দ্ বাহিনী ও নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, আণবিক বোমাবর্ষণ

আলপনা

আলপনা বা আচারমূলক চিত্র বাংলার লোকশিল্পের এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। স্ত্রী-সমাজেই তা সর্বতোভাবে সীমাবদ্ধ। মনে হয়, কোনো এক সময়ে এই চিত্রকলা বিকাশ লাভ করতে গিয়ে হিন্দু স্ত্রী-সমাজে অনুষ্ঠিত ব্রত পার্বণের অন্তর্নিদিষ্ট হয়ে পড়েছিল। তখন থেকেই তার মধ্যে একটি আচারগত মূল্য প্রকাশ পেতে আরম্ভ করেছিল আলপনাগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে আঁকবার আগে তার স্ত্রী-শিল্পীকে কতকগুলো আচার পালন করে নিতে হয়। আলপনা আঁকবার জন্য যে সামগ্রী ব্যবহার করা হয়, তা চালের গুঁড়ো। তাকে জলের সঙ্গে মিশিয়ে তা দিয়ে হাতের আঙুলের ডগায় আলপনা আঁকতে হয়। কোনো কোনো সময় তার মধ্যে নানা জিনিসের শুকনো গুঁড়োও বাবহার করবার প্রয়োজন হয়। কিন্তু সাদা রঙই আলপনার মূল রঙ, আতপ চাল গুঁড়ো করে জলের সঙ্গে মিশিয়ে তা তৈরী করতে হয়।

ঘরের মধ্যে মাটির মেঝের উপর অথবা ঘরের উন্মুক্ত আঙিনায় কোন পূজো পার্বণ উৎসব উপলক্ষে পরিবারের বিভিন্ন বয়সের মেয়েরা আলপনা এঁকে থাকে। মেয়েরা নিজেরাই যে পূজো পার্বণ করে তার নাম ব্রত। ব্রতে লৌকিক দেবদেবীরই আনুষ্ঠানিক পূজো হয়। পরিবারের বিবাহ উপলক্ষে বরের বসবার আসনের উপরও আলপনার ন্যূনায় চিত্র আঁকা হয়। কোনো কোনো লৌকিক দেবদেবীর পুজোর জন্য দেবতা বলে যে মাটির ঘট ব্যবহার করা হয়, তার বাইরের দিকটাতেও অনেক সময় আলপনা এঁকে দেওয়া একান্ত আবশ্যক। লৌকিক সূর্যদেবতার মেয়েলী ব্রতের নাম মাঘমণ্ডল ব্রত এবং নক্ষত্র ব্রতের তারাব্রত। এই দুই উপলক্ষেই বাড়ীর সারা উঠোন জুড়ে এঁকে যে বৃহৎ অলঙ্করণ করা হয়, তা অত্যন্ত এক বৃহৎ জটিল আলপনা। আলপনাকে সুদৃশ্য করবার জন্য তাতে বিচিত্র রঙ ব্যবহার করা হয়, তাতে তা অত্যন্ত আকর্ষনীয় হয়ে উঠে। সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসার বাৎসরিক পূজোর সময় যে ঘট ব্যবহার করা হয়, তার গায়ে এবং মেঝেতে সাপের নমুনায় যে সব আলপনা আঁকা হয়, তাদের মধ্যে বৈচিত্র্যের অন্ত নেই।

শোলাশিল্প

শোলাশিল্প বাংলার অন্যতম লোকজ শিল্প। শোলা বা শোলা জাতীয় উদ্ভিদ থেকে এগুলি তৈরি হয়। শোলাগাছ জলাশয়ে বিশেষত ধানক্ষেতে জন্মে। এর বৈজ্ঞানিক নাম Aeschymene aspera. বাংলার প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশে শোলাগাছের গুরুত্ব অনেক।

শোলাশিল্পের ব্যবহার সম্পর্কে একটি কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। কথিত হয় যে, স্বয়ং শিব হিমালয়কন্যা পার্বতীকে বিবাহ করার সময় শ্বেত মুকুট পরার ইচ্ছা পোষণ করেন। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা তখন মুকুট তৈরির উপাদানের কথা ভাবতেই শিবের ইচ্ছায় জলাশয়ে এক ধরণের উদ্ভিদ জন্মে, সেটাই শোলাগাছ। কিন্তু বিশ্বকর্মা শুধুমাত্র পাথর বা কাঠের মতো শক্ত দ্রব্যে কাজ করতে পারদর্শী, শোলার মতো নরম দ্রব্যে নয়। তখন শিবের ইচ্ছায় জলাশয়ে এক সুকুমার যুবকের আবির্ভাব ঘটে, যাকে আখ্যাত করা হয় মালাকার নামে। এখন যারা শোলাশিল্পের সঙ্গে জড়িত তারা মালাকার নামেই পরিচিত এবং হিন্দু সমাজভুক্ত। মালাকাররা বংশানুক্রমে শোলা দিয়ে বৈচিত্র্যময় টোপর, দেবদেবীর অলঙ্কার, চালচিত্র, পূজামন্ডপের অঙ্গসজ্জার দ্রব্যাদি, মালা, গহনা, খেলনা ও গৃহসজ্জার নানা দ্রব্য তৈরি করে।

সূত্রধর ও কর্মকাররা বিশ্বকর্মার উপাসক হলেও মালাকাররা শিবের উপাসক। এদের ধারণা শিবের ইচ্ছায় তাদের আবির্ভাব ঘটেছে, তাই শিবই তাদের উপাস্য দেবতা।

শোলা একটি কান্ডসর্বস্ব গাছ। কান্ডের বাইরের আবরণটা মেটে রঙের, কিন্তু ভেতরটা সাদা। শোলাগাছ সাধারণত ৫-৬ ফুট লম্বা হয় এবং কান্ডের ব্যাস হয় দুই থেকে তিন ইঞ্চি। বাংলাদেশে দুই প্রকার শোলা জন্মে: কাঠ (kath) শোলা ও ভাট (bhat) শোলা। কাঠশোলা অপেক্ষাকৃত শক্ত, কিন্তু ভাটশোলা হালকা ও নরম।

শোলার শিল্পকর্ম সৃষ্টিতে তেমন কোনো যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় না। একটি ধারাল ছুরি ও এক খন্ড পাথর বা কাঠই যথেষ্ট। প্রথমে ধারাল ছুরির সাহায্যে শোলাকে প্রয়োজনমতো টুকরা করা হয়। পরে ছুরি দিয়ে পাতলা করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটি লম্বা পাতের মতো করা হয়। এই পাতকে জড়িয়ে জড়িয়ে পুনরায় কান্ডের মতো করে দড়ি দিয়ে বেঁধে এবং ছুরির সাহায্যে নানা আকারের পাপড়ি কেটে বেলি, কদম ইত্যাদি ফুল তৈরি করা হয়। টোপর, পশুপাখি, অলঙ্কার, চালচিত্র, পটচিত্র প্রভৃতি তৈরিতে পাতলা করে কাটা শোলাকে আঠার সাহায্যে সংযুক্ত করা হয়। পরে প্রয়োজন অনুসারে তাকে বিভিন্ন আকার দেওয়া হয়। শোলাকে সংযুক্ত করতে সাধারণত নিজেরাই তেঁতুলবিচির আঠা তৈরি করে নেয়। বর্তমানে অবশ্য বাজারের আঠাও ব্যবহার করা হয়।

সাপের পুজোয় বাংলার কোন কোন অঞ্চলে একটি বিচিত্র সামগ্রী পূজাচারের মধ্যে স্থান পেয়ে থাকে, তার নাম করণ্ডী। তার অর্থ একটি দেড় হাতের মত উঁচু শোলায় তৈরী একটি ঘরের নমুনা; তার ঢালু চাল এবং তিন কোনা ছাদ। সবই শোলায় তৈরী। তার একদিককার ছাদ ও দেয়ালে সাপের রঙিন চিত্র আঁকা থাকে, অনেক সময় চিত্রগুলো আঁকবার মধ্যে উচ্চ দক্ষতার পরিচয় প্রকাশ পায়। খুব খুঁটিয়ে দেখলে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় তাদের নমুনার মধ্যে সামান্ত পার্থক্য দেখা যেতে পারে, তা নয় ত তারা সর্বত্রই প্রায় এক। হয়ত আগেকার দিনে ঘরের নমুনাটির চারদিক ঘিরেই চিত্র আঁকা হতো, এখন শুধু একদিকেই হয়। মনে হয়, 'ঘরটি' চাঁদ সওদাগরের নির্মিত লোহার বাসর বুঝায়।

বাংলার সর্পদেবীর মাহাত্ম্যসূচক কাহিনীতে চাঁদ সওদাগরের নাম আছে। শোলা বর্ষাকালে বাংলাদেশে জলের উপর প্রচুর জন্মায়। এক এক সময় এই জলজ উদ্ভিদের ব্যাস প্রায় ছয় ইঞ্চির মত হয়ে থাকে। তা থেকে কাগজের মত টুকরো কেটে বার করা যায়। ছোট ছোট টুকরো একত্র করে প্রয়োজন মত বড় বড় টুকরো তৈরী করা যায়। করণ্ডীর তিন কোনা ঢালু ছাত ও বাইরের দেয়াল এই রকম শোলার টুকরো দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। তার উপর

তুলি দিয়ে গ্রাম্য শিল্পী রঙিন চিত্র আঁকে। দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রীর প্রতিমায় দেবীর যে নানা প্রকার অলঙ্কার এবং বিশাল মুকুট পরানো হয়, তা সবই শোলার তৈরী; একশ্রেণীর শিল্পী এগুলো তৈরী কার, তাদের মালাকার বলে।

শোলার শিল্পকর্মকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য মালাকাররা রং, জরির সুতা, চুমকি ইত্যাদি ব্যবহার করে। শাঁখারি বাজারে সম্পূর্ণ শোলা দিয়ে তৈরি একটি বিয়ের টোপর চারশ থেকে পাঁচশ টাকায় বিক্রয় হয়। এ ধরণের টোপর সাধারণত উচ্চমধ্যবিত্ত হিন্দুরা ব্যবহার করেন। এ ছাড়া শোলার তৈরি কুচিমালাও হিন্দু বিয়েতে প্রয়োজন হয়। ধর্মীয় উৎসবে শোলা দিয়ে ক্যানভাসের মতো তৈরি করে তাতে বিভিন্ন দেবদেবীর চিত্র অংকিত হয়। এ ধরণের চিত্র ঘটচিত্র, করন্ডিচিত্র, মুখচিত্র ইত্যাদি নামে পরিচিত। এ ছাড়া অনেক সময় গণেশ, শীতলা, মনসা, কার্তিক ও চামুন্ডার চিত্রও অংকিত হয়।

বাংলার সনাতন শিল্পধারায় শোলার দুটি শিল্পরূপ দেখতে পাওয়া যায়। একটি হল চিত্রিত রূপ এবং অপরটি মণ্ডিত রূপ। শোলার উপর রং খুব ভাল ধরে তাই এর উপর রঙের কাজও হয় চমৎকার। অন্যদিকে, নরম শোলাকে কেটে অসাধারণ সূক্ষ্ম নৈপুণ্যে নানা কারুকাজ ফুটিয়ে তোলা হয় ও বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী তৈরি করা হয়। ব্যবহারের দিক থেকেও শোলার কাজ নানা ভাগে বিভক্ত। যেমন— চাঁদমালা, শোলার মালা, লক্ষ্মীঝারা, কদমফুল ইত্যাদি দ্রব্যগুলি ধর্মীয় কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত। আবার বরের টোপর, কনের সিঁথি মুকুট ইত্যাদি দ্রব্যগুলি বিয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। তবে বিয়েতে পরম্পরাগতভাবে শোলার টোপরের ব্যবহার ছাড়াও একসময় রণক্ষেত্রেও শোলার টোপরের ব্যবহার বিষয়ে জানা যাচ্ছে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য থেকে। 'শোলার টোপর শিরে ঘন সিংহনাদ পুরে বাঁশে বান্দে চামর নিশান...।'

অন্যদিকে, ইংরেজ আমল ও তার পরবর্তী সময়কালে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে শোলার প্যাকেজিং দ্রব্য এবং টুপির উল্লেখ করতেই হবে। এ-ছাড়া, সজ্জাদ্রব্য হিসাবে দেব-দেবীর অলংকার, শোলার মুখোশ, শোলার ফুল, শোলার খেলনা, পুতুল ও উপহার সামগ্রীও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এমনকী, জন্ম ও বিয়ের সময় নানা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে শোলার 'শীতল পট' ব্যবহার (মূলত রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে) এবং মৃত্যু সম্পর্কিত তথা পারলৌকিক ক্রিয়াকলাপে শোলার 'ফুলঘর-রথঘর'-এর ব্যবহার একসময় যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। আসলে, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রায় সমস্ত পর্যায়েই কোনও-না-কোনওভাবে যেন জড়িয়ে ছিল, কোনও-না-কোনও শোলা শিল্পজাত সামগ্রী!

অবশ্য শোলা শিল্পের সেই দিন আর নেই, তবে আজও বাংলায় একরকম বংশ পরম্পরায় বয়ে চলেছে এই অনন্য শিল্প ধারাটি। যত সূক্ষ্ম কাজ, তত তা সময় সাপেক্ষ। গোটা এক একটি পরিবার নিযুক্ত থাকে শিল্পকর্মে। সবাই যে যার মতো এক একটি অংশের কাজ করে। তবে প্রধান শিল্পীই সবচেয়ে জটিল কাজগুলো করে থাকে। আবার, বয়স্ক শিল্পীদের সাহায্যের সময় তরুণ শিল্পীদেরও একরকম প্রশিক্ষণ হয়ে যায় ঘরে বসেই। খুব সাধারণ যন্ত্রপাতি ও দেশীয় মালমশলা দিয়ে কী অসাধারণ সব মোটিফই (নকশা) না তৈরি হয়! নানা সম্প্রদায় মিলে রাজ্যে প্রায় ৭০০০ মানুষ এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। তবে শোলার কাজের যেমন সম্প্রদায়গত বিশেষীকরণ লক্ষ্য করা যায় তেমনি স্থানগত বিশেষীকরণও নজরে পড়ে। যেমন, বাংলার চাঁদমালা, ঝারা (শোলার ঘনকের প্রতিটি কোণ থেকে ঝোলানো একটি করে শোলার তারাফুল অথবা কদমফুল), শোলার মালা, কদমফুল ইত্যাদির বিশেষীকরণ

ঘটেছিল হুগলি জেলার সুন্দুরুসে। রাসরচনা ও রাসগাছ (শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রায় ব্যবহৃত শোলাসামগ্রীতৈরিতে (বিখ্যাত ছিল হাওড়ার রামেশ্বরপুর ও হুগলির সুন্দুরুস।

অন্যদিকে, ফুলঘর-রথঘর তৈরিতে নামডাক ছিল হাওড়ার ভান্ডেরগাছার। আর হাওড়ার বাণীবনের খ্যাতি ছড়িয়েছিল শোলার মডেল ও বিভিন্ন অলঙ্করণ সামগ্রী তৈরিতে। তবে হাওড়া-হুগলি ছাড়া বাংলার অন্যত্রও শোলা শিল্পকর্মের এরকম বেশ কিছু বিশেষীকরণ নজরে পড়ে। যেমন, কোচবিহারের দিনহাটার বিষহরি পট (মনসাপুজোয় ব্যবহৃত উপকরণ), দার্জিলিং-এর খড়িবাড়ির শীতল পট, নদিয়ার কৃষ্ণনগরের লক্ষ্মী মুখড়া (লক্ষ্মীপূজায় ব্যবহৃত সামগ্রী), মালদার ইংরেজবাজারের মাণ্ডুস (মনসাপুজোয় ব্যবহৃত উপকরণ), বর্ধমানের বনকাপাসি ও বীরভূমের কীর্ণাহারের দেব-দেবীর অলংকার, দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশপুর ও পুকুরিয়ার শোলার ফুল ইত্যাদি। যাই হোক, এমন নানা মূল্যবান তথ্য কিন্তু জানা যাচ্ছে অধ্যাপক কুন্দন ঘোষের 'শোলাপীঠ ক্র্যাফট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল: অ্যান ওভারভিউ'-শীর্ষক গবেষণা পত্রটি থেকে। প্রসঙ্গত, বাংলার বাইরে ওড়িশায় প্রভু জগন্নাথ দেবের সজ্জায়, রথযাত্রার সাজে (বৈতা বন্দনা) ও ওডিসি নৃত্যের মুকুটে, পরম্পরাগতভাবে ঝলমল করে শোলার কাজ। খুব স্বাভাবিক ভাবে বাংলার প্রতিবেশী রাজ্য ওড়িশায় তাই শোলার এই ধরনের কাজেরই বিশেষীকরণ লক্ষ্য করা যায়।

বর্তমানে মালাকাররা বিয়ের টোপর ও মালা ছাড়াও সমাজের চাহিদা অনুযায়ী নানা ধরণের খেলনা, পাখি, ফুল, পুতুল ইত্যাদিও তৈরি করে। শোলাশিল্প সংরক্ষণ করা কষ্টকর, কারণ শোলার স্থায়িত্ব কম।একটা সময়, শোলা-চাষি ও শোলা-শিল্পীদের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, শোলা-শিল্পীদের মূল কারিগর মালাকার সম্প্রদায়ের শক্তপোক্ত সামাজিক ভিত্তি, হালকা শোলার সহজ পরিবহণযোগ্যতা ইত্যাদি শোলা-শিল্পের উন্নতিতে সহায়ক হয়েছিল। তবে গৌরবোজ্জ্বল অতীত, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আজ অনেকটা ফিকে হয়ে গেলেও, পরম্পরাগত সামাজিক রীতিনীতি ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে শোলা-শিল্প অনেকাংশে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে, নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও শোলা শিল্প কিন্তু আজও টিকে আছে। আবার, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শোলার কাজের একটা বিশ্ব-বাজারও (গ্লোবাল মার্কেট) তৈরি হয়েছে। এটাও শোলা-শিল্পকে যে কিছুটা অক্সিজেন দিচ্ছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু চাহিদা অনুযায়ী শোলাশিল্পজাত সামগ্রীর যুগোপযোগী বৈচিত্র্ করণ সম্ভব না হলে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী শোলাশিল্পীদের পাশে দাঁড়াতে না পারলে এই গৌরবময় শিল্পের ভবিষ্যৎ যথেষ্ট প্রশ্নচিহ্নের মুখে পড়তে পারে।

পুতুল, টেরাকোটা, **শঙ্খ শিল্প, ডোকরা** ঃ-

পুতুল

পুতুল কী? এ সম্পর্কে সামান্য দৃষ্টি দেওয়া যাক। বলা হয়, ল্যাটিন Pupa (Pupa/Doll) থেকে Puppet শব্দের উৎপত্তি, যার অর্থ পুতুল। এই পাপেট বা পুতুল হলো একটি সুস্পষ্ট অঙ্গবিশিষ্ট পুতুল, যাকে বাহ্যিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বেশির ভাগ পুতুলই মানুষ বা জীবজন্তুর আদলে গড়া। অনেক সময়, পুতুলগুলো বাস্তব কোনো জড়বস্তু

বা বিমূর্ত কোনো ভাবনার প্রতিনিধিত্ব করে। একটি পুতুল পূর্ণ আকৃতির হলেও মানুষ বা পুতুল নিয়ন্ত্রকের তুলনায় এরা ক্ষুদ্র। অর্থাৎ 'সাধারণ অর্থে ক্ষুদ্রায়তন মূর্তিকেই আমরা পুতুল বলি'।

সারা পৃথিবীর দেশে দেশে নানা ধরনের পুতুল পাওয়া যায়। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতেও বহু রকম পুতুল রয়েছে। বিশেষ করে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে ছয় ধরনের পুতুল দেখা যায়। যেমন- ক্ষুদ্রায়তন দেবমূর্তি, মনুষ্য মূর্তি, পশু মূর্তি, যো-পুতুল, নাচিয়ে পুতুল ও গৃহসজ্জার পুতুল।

বাংলাদেশেও বহু রকমের পুতুল রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মতো এখানেও বিভিন্ন দেব-দেবী যেমন-রাধা-কৃষ্ণ, লক্ষ্মী-মহাদেব। পশুপাখি যেমন- হাতি-ঘোড়া, বাঘ-হরিণ, হাঁস-টিয়া-কবুতর। মানুষ যেমন: মা ও শিশু, তৈরি হয় পুতুলনাচের কাহিনি ও চরিত্রকে কেন্দ্র করে এ ছাড়া গৃহসজ্জারও নানা রকমের পুতুল রয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর মানুষেরাও নানা রকম পুতুল তৈরি করে থাকেন।

বাংলাদেশে পুতুল নির্মাণের উপকরণ হিসেবে মাটিই প্রধান। পোড়ামাটির বিভিন্ন ধরনের পুতুল বাংলাদেশের পুতুলশিল্পের প্রতিনিধিত্ব করছে। এ ছাড়া কাঠের পুতুল, পিতল বা ধাতুর পুতুল, কাপড়ের পুতুল, শোলার পুতুল, কাগজের পুতুল, ঘাসের পুতুল, গোবরের পুতুল, পাথরের পুতুল, পিটলির পুতুল, সরের পুতুল, ননীর পুতুল ইত্যাদি পুতুলের প্রচলন রয়েছে। আজকাল বিভিন্ন কারখানায় প্লাস্টিক, সেলুলয়েড, চীনামাটি ও কাচের নানা শ্রেণির পুতুলও তৈরি হতে দেখা যায়।

কৃষ্ণনগরের পুতুল বা **কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল** পশ্চিমবঙ্গ-এর নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরের এক জগৎ বিখ্যাত মৃৎ শিল্প এবং এটি পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রধান কুটির শিল্প।কৃষ্ণনগরের পুতুল প্রধানত তৈরি হয় কৃষ্ণনগরের পার্শবর্তী অঞ্চল ঘূর্নীতে।

ইতিহাস

এক সময় নদীয়া রাজা ছিলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র। বিদ্যোৎসাহী, সংস্কৃতিবান হিসেবে তার খ্যাতি ছিল। তাঁর সময় মাটির মূর্তি নির্মাণের জন্য নাটোর (অধুনা বাংলাদেশ) থেকে শিল্পীরা আসতেন। এরপর রাজপৃষ্ঠপোষকতায় এই শিল্পীরা ঘুর্নী এলাকায় বসতি গড়ে তোলে। ক্রমশ কৃষ্ণনগরের পুতুল প্রসিদ্ধি পেতে থাকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে। বর্তমানে কৃষ্ণনগরে প্রায় ৪০০ মৃৎ শিল্পী পরিবার আছে এর মধ্যে শুধু ঘূর্নীতে আছে ২০০ পরিবার।

কৃষ্ণনগরের পুতুল প্রধানত মাটির দ্বারা তৈরি করা হয়। জলঙ্গী নদীর পাড় থেকে মূর্তি বা পুতুল নির্মাণের বিশেষ মাটি সংগ্রহ করা হয়। এরপর এই মাটি পুতুল নির্মাণের উপযোগী করে তোলা হয়। এই মাটি থেকে শিল্পী তার নিজের হাতের কারুকার্যে পুতুল নির্মাণ করে। প্রথমে পুতুলটি রৌদে শুকিয়ে নেওয়া হয় তারপর রং করে বিভিন্ন দোকানে বিক্রয় করা হয়।

চাহিদা

কৃষ্ণনগরের পুতুলের চাহিদা বিশ্বজোড়া। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এই পুতুল রপ্তানি করা হয়। দেশের বাইরে প্রধানত ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকাতে পুতুল রপ্তানি করা হয়। তবে সরকারি তরফ থেকে এর প্রচার কম। ফলে এর বিপণন কম হচ্ছে। শিল্পীরা আর্থিক সহযোগীতা না পেয়ে বা উপযুক্ত প্রচারের অভাবে মার খাচ্ছেন' এছাড়া অনেক সময় নিম্নমানের মাটির পুতুল "কৃষ্ণনগরের পুতুল" বলে চালিয়ে দেয় অসৎ ব্যবসায়ীরা।

টেরাকোটা শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'টেরা কোটা' থেকে এসেছে, যার অর্থ 'বেকড আর্থ'। টেরাকোটা মানব ইতিহাসে মানুষের কল্পনার অন্যতম প্রধান শারীরিক প্রকাশ। দেবতা, দেবী, নৃত্যরত বালিকা, প্রাণী, টাইলস এবং খেলনাগুলির মূর্তি দ্বারা চিহ্নিত এই প্রাচীন শিল্পটি প্রাচীন কাল থেকেই বিশ্বব্যাপী প্ল্যাটফর্মে ভারতীয় হস্তশিল্প শিল্পের বৈশিষ্ট্য।
আনুমানিক 7000 খ্রিস্টপূর্বাব্দের পোড়ামাটির নিদর্শনগুলি সিন্ধু সভ্যতার বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান যেমন মহেঞ্জোদারো, বিরহানা, মেহরগড় থেকে উন্মোচিত হয়েছে।

বাংলার এ অববহিকায়, হাজার বছরের পুরানো শিল্প টেরাকোটা। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটেও, টেরাকোটার ইতিহাস বহু বছরের পুরনো। লাতিন শব্দ টেরা ও কোটা থেকেই এসেছে টেরাকোটা শব্দটি, যার অর্থ যথাক্রমে মাটি ও পোড়ানো। অর্থাৎ, মাটি পুড়িয়ে যা তৈরি হয়, তার সবই আসলে টেরাকোটা। পৃথিবীর বিভিন্ন আদি সভ্যতায় তো বটেই, বাংলা অঞ্চলেও মৌর্য, গুপ্ত, পাল, সেন আমলের নানা নিদর্শনেও দেখা মেলে টেরাকোটা। এমনকি মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির সৌন্দর্য দেখে মধ্যযুগের মুসলিম শাসকেরাও তা গ্রহণ করেছিলেন, নিজেদের মতন করে।
দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাংলা রাজ্য সবসময়ই অগ্রগণ্য এবং পোড়ামাটির শিল্পও এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলায় পোড়ামাটির শিল্পের প্রাচীনতম প্রমাণ মৌর্য যুগ থেকে 324 থেকে 187 খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে। পরবর্তীকালে খননকালে বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং বাংলার অন্যান্য গ্রামীণ স্থানে টেরাকোটা শিল্পের অবশেষ পাওয়া যায়।
আজও বেশিরভাগ বাঙালি বাড়িতে আট ফুট উঁচু ভাস্কর্যের আকারে বা বসার ঘরে ক্ষুদ্রাকৃতির বৈশিষ্ট্যযুক্ত 'বাঁকুড়া ঘোড়া' পাওয়া খুবই সাধারণ।

প্রাচীন বাংলায় টেরাকোটা
বিশ্বের বৃহত্তম এই ব-দ্বীপে, মাটি সহজলভ্য বলেই এখানে মৃৎ শিল্পের চর্চার শুরুটা সেই প্রাচীনকাল থেকেই। সেসময়ে, বিভিন্ন সাংসরিক পণ্য যেমন: মাটির ফলক, পুতুল, কলসি-হাঁড়ি ইত্যাদি তৈরি হতো পোড়ামাটিতে। কেবল তৈজসপত্রই নয়, এই অঞ্চলে পাথরের স্বল্পতার কারণে ইট পুড়িয়ে ভবন, মূর্তি ও ভাস্কর্য নির্মাণও বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। টেরাকোটার ইতিহাস থেকে বাংলা ভূখন্ডে পাওয়া সবচেয়ে পুরোনো নিদর্শনটি রয়েছে উয়ারী-বটেশ্বর ও মহাস্থানগড়সহ তার আশপাশের এলাকায়। যা নির্মিত হয়েছে আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে। পাহাড়পুরেও পাল-পূর্ব যুগের বেশ কিছু টেরাকোটার নিদর্শন পাওয়া গেছে যা কিনা আলাদা আলাদা সময়কালের আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য বহন করে চলছে। যেমনঃ উয়ারী-বটেশ্বর এলাকার আদি মাতৃদেবীর যে প্রতিকৃতি পাওয়া গেছে, তাতে পশ্চিম এশিয়া ও সিন্ধু সভ্যতার মাতৃদেবীর মিল রয়েছে।

মৌর্যযুগের টেরাকোটার ইতিহাস ঘাটলেও দেখা যায়, এদেশীয় পোড়ামাটির শিল্পে ছিল গ্রিক-পারস্য প্রভাব। তবে এই সময়ে হাতের পাশাপাশি ছাঁচের ব্যবহার শুরু হয়। ছাঁচে মুখাবয়ব তৈরি হতো, আর শারীরিক গড়ন দেওয়া হতো হাতে। তবে ছাঁচ থেকে বেরোনোর পর সেই মুখাবয়বকে দক্ষ হাতের স্পর্শে আরো নিখুঁত করে তুলতো কুমারেরা। সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর শালবন বিহারের চিত্রফলকগুলোর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। টেরাকোটার ইতিহাসে, পাল আমলের সবচেয়ে বড় কীর্তিটি হচ্ছে সোমপুর মহাবিহার। সেখানকার কেন্দ্রীয় মন্দিরের গায়ে প্রায় দুই হাজার টেরাকোটা ছিল। আশপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল আরও ৮০০ টেরাকোটা। সেন আমলেও অসংখ্য মন্দিরের গায়ে টেরাকোটার আস্তর পড়েছে, ইট হয়েছে কারুকার্যময়। মোট কথা, লৌকিক ধর্ম কিংবা আচার থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে কালে কালে এই বাংলাতেই টেরাকোটা শিল্প বিবর্তিত হয়েছে নানাভাবে।

মধ্যযুগে টেরাকোটা

মধ্যযুগের একদম শুরুতে বাংলার মসজিদগুলো ছিল একদমই সাদামাটা। তবে পরবর্তীতে মসজিদের মিহরাব ও বাইরের দেয়ালে এবং কবরের আচ্ছাদনে টেরাকোটার নকশার আদলে পাথরে খোদাই করা নকশার দেখা মেলে। তবে, পাথরের অপর্যাপ্ততার কারণে এই বাংলায় মসজিদের গায়েও তখন পোড়ামাটির শিল্পের বহুল ব্যবহার শুরু হয়। ইসলাম ধর্মে যেহেতু জীবজন্তু আঁকা মানা, তাই গাছ, লতাপাতা, ঘণ্টা, শিকল, পদ্ম, গোলাপের নকশা হতে থাকে মসজিদের মিহরাবে ও দেয়ালে। স্বাধীন সুলতানি আমলের (১৩৩৮-১৫৭৬) বেশির ভাগ মসজিদেই দেখা যায় এসব পোড়ামাটির কারুকাজ আর নকশা করা ইট। কিন্তু মুঘল আমলে লাইম-প্লাস্টারের আগমন টেরাকোটার শিল্পকে কিছুটা স্তিমিত করে দেয়।

অষ্টাদশ শতকে টেরাকোটা

অষ্টাদশ শতাব্দীতে আবারও টেরাকোটার আবির্ভাব ঘটে বাংলাদেশের মন্দিরগুলোতে। অষ্টাদশ শতকের বাংলার দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনাসহ গোটা উত্তরবঙ্গজুড়ে তখন চলছে টেরাকোটার শিল্পচর্চা। এ সময়ের সেরাগুলো কাজ দেখা যায় দিনাজপুরের কান্তজির মন্দির এবং রাজশাহী জেলায় অবস্থিত পুঠিয়ার মন্দিরগুলোতে। ১৭৫২ সাল নাগাদ তৈরি দিনাজপুরের কান্তজির মন্দিরের মতো এত সূক্ষ্ম ও জটিল কাজ সে সময়ের আর কোনো মন্দিরে দেখা যায় না। রামায়ণ, মহাভারত এবং বিভিন্ন পুরাণের উল্লেখযোগ্য কাহিনি এখানে ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। নিচ থেকে শুরু করে ছাদ পর্যন্ত, পুরো মন্দিরটি প্রায় ১৫ হাজার টেরাকোটার ফলকে মোড়া।

বাংলার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের ঐতিহ্য: চৈতন্য পূর্ব যুগে বাংলার বিভিন্ন স্থানে যে টেরাকোটার অসংখ্য মন্দির তৈরি হয়েছিল স্থাপত্যগত বৈচিত্র্য ও শিল্পচর্চায় সেগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। শুধুমাত্র ধর্ম চর্চা নয়, এগুলি ছিল দক্ষ শিল্পীদের শিল্পচর্চার সার্থক উদাহরণ। ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির মিলন বা সমন্বয় বাংলার মন্দির-স্থাপত্যের নীতি ও শৈলীর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

পশ্চিমবাংলায় রেখা, চালা, মঞ্চ, রত্ন, সমতল ছাদ প্রভৃতি রীতির মন্দির-স্থাপত্য আমাদের চোখে পড়ে। অভ্রভেদী শিখর বা বাংলার খড়ের ঘরের অনুকরণে খর্বাকৃতি চালা রূপের বহু বিচিত্র ভঙ্গিমা, মন্দিরগুলির গায়ে পোড়া মাটির সুন্দর সুন্দর মূর্তি, যা আজও বিস্ময় হয়ে রয়েছে। এগুলি কতকাল আগে তা আমাদের দেশীয় কারিগরদের দ্বারা তৈরি হয়েছিল যা সম্পর্কে আজও আমরা অজ্ঞ হয়ে রয়েছি। শুধুমাত্র ধর্মচর্চার স্থান হিসাবেই নয় বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের মন্দিরগুলি থেকে এই অঞ্চলের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের মৌলিক উপাদান সংগৃহীত হতে

পারে। তাই অন্যান্য পুরাবস্তুর তুলনায় আমাদের এই মন্দিরগুলির বয়স খুব বেশি না হলেও অন্তত চার পাঁচশ বছর আগের সামাজিক ও সংস্কৃতির ইতিহাস এই শেষ মধ্যযুগীয় মন্দিরগুলি থেকে সংগৃহীত হতে পারে, যার গুরুত্ব দেশের সামগ্রিক ইতিহাসের চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়।

পশ্চিমবাংলার মন্দিরগুলিকে মূলত চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়ঃ চালা, রত্ন, দেউল এবং চাঁদনি দালান।চালার মধ্যে একটি চালযুক্ত মন্দিরকে 'একচাল' বা 'একচালা', দুটি চাল হলে 'দোচালা', যাকে একবাংলাও বলা হয়। আবার দুটি দোচালাকে সামনে পিছনে যুক্ত করে তৈরি হয় জোড়বাংলা। এছাড়া চারদিকে চারটি চাল সংযুক্ত করলে হয় 'চারচালা'। এইভাবে 'বারচালা' পর্যন্ত মন্দির দেখা যায়। এই চালা' মন্দিরের ধারণাটি এসেছিল বাঙালির অতি পরিচিত খড়ের চালা ঘর থেকে। 'চালা' মন্দিরের সঙ্গে 'চাঁদনি', 'দালান' প্রভৃতি শৈলীর মন্দিরের কিছুটা সাদৃশ্য থাকলেও 'চাঁদনি' ও 'দালানের' ছাদ সমতল, কিন্তু চালার চাল চালু। চাঁদনির ক্ষেত্রে দালানের পার্থক্য স্পষ্ট আয়তনের দিক থেকে। আবার এক হলেও আয়তন হয়েছে বিশাল এবং রয়েছে অনেকগুলি প্রবেশ পথ। উল্লেখ করা যেতে পারে চালা, চাঁদনি ও দালানের মধ্যে সরল সাদামাটা স্থাপত্য চিন্তাই বেশি করে প্রতিফলিত হয়েছে, যা ছিল বাংলার একান্ত নিজস্ব স্থাপত্য রীতি। সুপ্রাচীন কাল থেকে বাংলায় এই রীতির বাসগৃহ তৈরি হয়ে এসেছে। রত্নশৈলীর মন্দিরের মধ্যে বাংলার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের যে উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনা তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। রত্ন শৈলীর মন্দিরের মধ্যে বাংলার চালা, চাঁদনী বা দালানের ছাদে ছোট আকারের দেউলকে চূড়া বা বাহু রূপে বসিয়ে নতুন আলাদা এক শৈলী বা রীতি সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু চূড়া বা রত্ন বসাবার একটা শৃঙ্খলা ছিল। এর ফলে উদ্ভব হল এই রত্ন স্থাপত্যেরই কয়েকটি শ্রেণি, যেমন- 'একরত্ন', 'পঞ্চরত্ন', 'নবরত্ন', 'ত্রয়োদশরত্ন','সপ্তদশরত্ন', 'একবিংশতিরত্ন' ও 'পঞ্চবিংশতিরত্ন'। সর্বোচ্চ চারটি তলেই পঁচিশটি চূড়া বসানো হতো। 'দেউল'রীতির যে অজস্র মন্দির দেখা যায়, সেগুলি প্রাচীন 'রেখা' ও 'শিখর' দেউলের রূপান্তরিত ও সরলীকৃত অপেক্ষায় ক্ষুদ্রায়তন দেউল মন্দির, যা গ্রাম গঞ্জের সর্বত্রই আমাদের চোখে পড়ে।'

নদীমাতৃক বাংলার পলিমাটিতে গড়া অঞ্চলগুলিতে ইটের মন্দির ও তার টেরাকোটার অলংকরণ অনন্য। বিশেষ করে বাংলার মধ্যে রাঢ় বাংলার এই টেরাকোটা কারুকার্যখচিত মন্দিরের সংখ্যা সর্বাধিক। তাই রাঢ় বাংলাকে 'মন্দিরের হৃদয়ভূমি' বলা হয়। এইসব মন্দির-স্থাপত্যগুলি বাঙালি সংস্কৃতির এক উন্নত আলোকাভাসিত চিত্র আমাদের সামনে উপস্থিত করে। ইঁটের মন্দিরগুলিতে বহুক্ষেত্রে রামায়ণ, মহাভারত, পৌরাণিক কাহিনি এবং সাধারণ মানুষের জীবনধারার যে জ্বলন্ত ছবি রূপায়িত হয়েছে তার ফলে টেরাকোটা মন্দিরগুলির মধ্যে ইতিহাসের উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যের আর্বিভাবের কিছুকালের মধ্যেই এই শিল্পের অভাবনীয় বিকাশ ঘটে, যাকে কেউ কেউ লোকায়ত শিল্প বলে মনে করেন। মূর্তিফলকগুলিতে গ্রামীণ সমাজজীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে, যেমন সাজ তেমনই মূর্তিগুলির বেশভূষা ও আকারে রয়েছে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার বিচিত্র প্রকাশ। বাংলার ঐতিহ্যময় টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যগুলি অনন্য ও গৌরবময়। মন্দির-স্থাপত্যের গঠন-রীতি, স্থাপত্য শৈলী ও অলংকরণের অসাধারণ নৈপূণ্য এখানকার মন্দিরগুলিতে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যেহেতু বাংলায় টেরাকোটা মন্দিরের সংখ্যা সর্বাধিক এবং পাথরের মন্দিরের সংখ্যা সেতুলনায় নগণ্য, সেজন্য নদীমাতৃক এই বাংলায় পলিমাটিতে গড়া অঞ্চলগুলিতে টেরাকোটার অলংকরণ অনন্যতার দাবী রাখে। নিতান্ত অনাদৃত ও অবহেলিত বঙ্গসংস্কৃতির এই অমূল্য নিদর্শনগুলি বহু বিদেশী পর্যটক ও গবেষকদের কাছে আকর্ষণীয় বলে মনে হলেও এদেশীয়দের কাছে তা

নিতান্তই অবহেলা ও অবজ্ঞার বিষয় বলে মনে হত। তবে এখন এ-বিষয়ে সচেতনতা পূর্বের থেকে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

আধুনিক যুগে টেরাকোটা

টেরাকোটার ইতিহাস সমৃদ্ধ হলেও, এতে ফাটল ধরেছিল ইংরেজ শাসনামলে। জমিদার ও অভিজাতরা তখন ইউরোপীয় সংস্কৃতির দিকে আকৃষ্ট হতে থয়। ফলে, সেসময়ে বেশিরভাগ ঘরবাড়ি ও ইমারত নির্মাণেও দেখা যায় পাশ্চাত্য ডিজাইনের প্রভাব এবং হারিয়ে যেতে শুরু করে পোড়ামাটির ফলকের ব্যবহার। তবে, আধুনিক যুগে, আদির সেই টেরাকোটাই ধীরে ধীরে বিবর্তিত হয়ে ফিরে এসেছে নতুন আঙ্গিকে। ভবন নির্মাণে ইটের ব্যবহার তো আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। এইবার, ভবন নির্মাণ কাজে যুক্ত হয় পোড়ামাটির তৈরি আধুনিক উপকরণ টাইলস। মেঝে থেকে শুরু করে বাহারি দেয়াল, সর্বত্র বৃদ্ধি পায় টাইলসের ব্যবহার। আর আধুনিক ইন্টেরিয়র ডিজাইন তো টেরাকোটা কে গ্রহণ করেছে আলাদা একটি থিম হিসেবে।

বাঁকুড়ার হাটগ্রামের শঙ্খ শিল্প

বাংলার প্রাচীনতম আঙ্গিকগুলির মধ্যে অন্যতম হল শঙ্খ শিল্প। আর এই শিল্প জগতে অনাতম নাম হাটগ্রাম। বাঁকুড়া জেলার ইন্দপুর ব্লকের অখ্যাত এই গ্রামটি আজ শঙ্খ শিল্পের হাত ধরে গোটা দেশের নজর কেড়েছে। শুধুমাত্র শাখা নয়, শস্ত্র দিয়ে যে কত রকমের হস্ত শিল্প বা ঘর সাজাবার জিনিষ তৈরি করা যায় তা এখানে না এলে বোঝা যাবে না। বাজাবার শঙ্খ তো রয়েছেই, তাছাড়া ধুপদানি, কাজলদানি, চুলের ক্লিপ, গলার হার ও শঙ্খ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের শোপিস তৈরি করেন এখানকার শঙ্খ শিল্পীরা। গোটা রাজোর বেশিরভাগ শাঁখা ও শঙ্খজাত পণ্যের অধিকাংশের যোগান যায় এই হাটগ্রাম থেকেই। আর সবচেয়ে যে বিষয়টা উল্লেখ না করলেই নয় এই হাটগ্রামে এমন কয়েকজন শঙ্খ শিল্পী রয়েছেন যারা শঙ্খের উপর সূক্ষুন্ন কারুকার্য করে হিন্দু পুরানের নানান দেবদেবী ও রামায়ণ-মহভারতের নানান আখ্যান ফুটয়ে তুলেছেন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে। আর এই কাজের জন্য অনেকেই জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। আর গোটা দেশ জুড়ে জনপ্রিয়তা বেড়েছে হাটগ্রামের।

হাটগ্রামের শঙ্খ শিল্পের ইতিহাস বেশ পুরাতন। কেউ কেউ মনে করেন মা রাজাদের সময়কাল থেকেই বিষ্ণুপুরের সাথে সাথে এই হাটগ্রামেও শঙ্খের নানান কাজ হতে শুরু করে। আর পরবর্তীতে চাহিদা বাড়তে থাকায় এখানে শঙ্খ শিল্প অন্যতম প্রধান শিল্পে পরিণত হয়। এই শিল্পের প্রধান কাঁচামাল শঙ্খের জোগানদার তামিলনাড়ু। মূলত চেন্নাই থেকে কলকাতা হয়ে বিভিন্ন ধরণের শঙ্খ এখানে আসে। বাঁকুড়া তথা পশ্চিমবঙ্গের শঙ্খ শিল্পের পীঠস্থান এই হাটগ্রামে এই কাজে প্রায় ৩০০ জন শিল্পী যুক্ত রয়েছেন। বর্তমানে বিষ্ণুপুরে শঙ্খ শিল্পের পরিস্থিতি অত্যন্ত করুণ হলেও হাটগ্রামে এই কাজ এখনও বেশ ভালো রকম চলছে। এই গ্রামে কোন কোন পরিবারের সকলেই এই কাজের সাথে যুক্ত। কারণ একক ভাবে এই কাজ সম্ভব নয়। প্রথমেই যেসব শঙ্খ আসে সেগুলিকে ঝাড়াই বাছাই করে বিভিন্ন সাইজের শঙ্খগুলিকে আলাদা আলাদা করে নেওয়া হয়। এরপর মেশিনে শঙ্খ কাটিং করার জন্য

রয়েছেন একদল শিল্পী। আবার পালিশিং আর হাতে পরার শাঁখার নকশা তোলার জন্য রয়েছে আবার আলাদা আলাদা শিল্পী।

এখানকার বেশিরভাগ শিল্পী মূলত মহিলাদের হাতে পরার শাঁখা তৈরি করেন। আবার বেশ কয়েক জন রয়েছেন যারা শঙ্খ দিয়ে বিভিন্ন শো পিস, ঘর সাজাবার জিনিষ, ধূপদানি, কাজলদানি, মাথার ক্লিপ, কানের দুল বা গলার হার তৈরি করেন। এরা সাধারণত বংশপরম্পরায় এই কাজ করে আসছেন। কিন্তু এই হাটগ্রামে এমন কয়েকজন শিল্পী রয়েছেন যাদের হাতের কাজে জাদু রয়েছে। অসীম দক্ষতা আর শৈল্পিক নৈপুণ্যে তারা শঙ্খয়ের উপরে ফুটিয়ে তোলেন হিন্দু পুরাণের নানান দেবদেবী বা রামায়ণ-মহাভারতের নানান ঘটনাবলির নিখুঁত প্রতিরূপ। ৬-৭ ইঞ্চি একটা শঙ্খে। এই ধরণের একটি কাজ করতে একজন শিল্পীর প্রায় দেড়-দুই মাস সময় লাগে। অসীম ধৈর্য আর বিচক্ষণতার পরিচয় লাগে এই সব কাজে। শঙ্খের অন্যান্য কাজের চেয়ে এই ধরণের কাজের মূল্য বেশ অনেকটাই বেশি। একটা ৬ ইঞ্চির কারুকার্য করা শঙ্খের মূল্য শুরু হয় ৬/৮ হাজার টাকা থেকে। তবে দেশ বিদেশের শিল্প রসিকদের কাছে এই ধরণের কাজের চাহিদা আকাশ ছোঁয়া। এই কাজের জন্য এই গ্রাম থেকে অনেকেই রাজ্য ও রাষ্ট্রীয় স্তরে পুরষ্কার পেয়েছেন।

ডোকরা

ডোকরা হল "হারানো মোম ঢালাই" পদ্ধতিতে তৈরি একটি শিল্প কর্ম। এই শিল্পের ইতিহাস প্রায় ৪০০০ হাজার বছরের পূরানো। সিন্ধু সভ্যতার শহর মহেঞ্জদোড়োতে প্রাপ্ত "ড্যান্সিং গার্ল" বা "নৃত্যরত নারী মূর্তি" হল ডোকরা শিল্পের নিদর্শন। ভারত ছাড়াও চীন,মালয়েশিয়া,জাপান প্রভৃতি দেশে এই শিল্প কর্ম পাওয়া যায়। এটি একটি প্রাচীন শিল্প কর্ম।

মনে করা হয় মধ্যপ্রদেশ এর বস্তার ও ছত্তিসগড়ে এই শিল্পের উদ্ভব হয়। পরে ঝাড়খণ্ড ও বিহার-এ ছড়িয়ে পড়ে। আরও পরে পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশা রাজ্যে এর প্রসার ঘটে। বর্তমানে ডোকরা শিল্পে পশ্চিমবঙ্গ অন্যতম নাম।

পদ্ধতি

ডোকরা শিল্প পদ্ধতি একটি জটিল ও সময় সাপেক্ষ, সূক্ষ্য শিল্প কর্ম। প্রথমে শিল্পীরা পুকুর থেকে লাল বা সাদা মাটি সংগ্রহ করে ও মাটির মণ্ড তৈরি করে; এর পর মাটি দিয়ে হাতে করে একটি অবয়ব তৈরি করে। অবয়বটির উপর মোম, তেল এর প্রলেপ দেওয়া হয় । শেষে নরম মাটির প্রলেপ দেওয়া হয়। এর পর এটিকে পোড়ানো হয়। ফলে মোম গলে একটি ছিদ্র দিয়ে বাইড়ে বেরিয়ে আসে ।এর পর ওই ছিদ্র দিয়ে গলানো পিতল ঢালা হয় এবং শক্ত হলে মূর্তিটি সংগ্রহ করা হয়। মূর্তিটি এর পর শিরিষ কাগজ দ্বারা ঘষে উজ্জ্বল করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গে ডোকরা শিল্পের প্রসার ঘটে আজ থেকে কয়েকশো বছর পূর্বে। প্রধানত ঝাড়খণ্ড থেকে এই শিল্প পুরুলিয়া হয়ে এই শিল্প রাজ্যের পশ্চিম প্রান্তের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। সেগুলির মধ্যে অন্যতম জেলাগুলো হল- বাঁকুড়া, বর্ধমান, পুরুলিয়া ও পশ্চিম মেদিনীপুর। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলা-বিকনা, খাতডার লক্ষীসাগর, লাদনা,ছাতনা, শববেড়িয়া। বর্ধমান-গুসকরার দরিয়াপুর ও পুরুলিয়ার নাডিহায় ডোকার শিল্পের প্রধান কেন্দ্র গুলি অবস্থিত। এর মধ্যে বাঁকুড়ার বিকনা ও বর্ধমানের দরিয়াপুর উল্লেখযোগ্য। এই দুই জায়গার ডোকরা শিল্পের প্রসিদ্ধি জগৎজোড়া।

এই শিল্প কর্মের জন্য ১৯৬৬ সালে শুম্ভ কর্মকার, ১৯৬৮ সালে দরিয়াপুর এর হারাধন কর্মকার, ১৯৮৮ সালে মটর কর্মকার, ২০১২ সালে পাত্রসায়ের এর নিতাই কর্মকার রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পান।

বর্তমানে এই শিল্পের অবস্থা খুব ভাল না। বিভিন্ন কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি এর মূল কারণ। এছাড়া সরকারি প্রচার কম। অনেক যায়গায় শিল্পির অভাব দেখা যাচ্ছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ডোকরা শিল্প প্রসারের জন্য কাজ করছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

[https://bn.banglapedia.org/index.php/%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA]

https://jagobangla.in/traditional-shola-art-of-bengal/

https://www.bproperty.com/blog/bn/%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%87%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8/

Tanaya Mukherjee, Dr. Sujay Kumar Mondal, Banglar Terracota Mandir Sthapotyo Chorcha: Ekti Porjalochona

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

Tanaya Mukherjee, Dr. Sujay Kumar Mondal, Banglar Terracota Mandir Sthapotyo Chorcha: Ekti Porjalochona

Shila Basak, Banglar Nakshi Kantha

Prodyot Ghosh, Kalighat Pot

সম্ভাব্য প্রশ্নাবলীঃ

১) Discuss the Patachitra art as an important folk art of Rural Bengal.

২) What is the significance of terracotta temple art of Bengal?

৩) Write a short note on Alpana and Dokra.

8) Discuss briefly on different varities of folk art of rural Bengal.

পর্যায়- ৬

একক- ১৫-১৬

উদ্দেশ্যঃ বর্তমান পর্যায় টির অনুশীলন করে ছাত্র- ছাত্রীরা ঔপনিবেশিক ও তার পরবর্তী যুগে লোক-সংস্কৃতির ওপর কি প্রভাব পড়েছিল সেটা জানতে পারবে।

লোক-সংস্কৃতির ওপর ঔপনিবেশিক প্রভাবঃ

মুগল সাম্রাজ্যের পতনের পর বৃটিশরা ভারতবর্ষের ক্ষমতায় আসে। তখন আরেকটি পরির্তন দেখতে পাই আমাদের লোক-সংস্কৃতিতে। ব্রিটিশ রাজ (১৮৫৮-১৯৪৭) স্থানীয় সমাজে নিজস্ব রীতিনীতি চালু করতে শুরু করে ধীরে ধীরে। এই সময়ে বাংলাদেশ সহ পুরো ভরতবর্ষের লেখালেখিতে ইংরেজি সাহিত্যের ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল। ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে পুতুল থিয়েটার এবং ঘোড়ার দৌড়ের মতো বিনোদনের কিছু ঐতিহ্যবাহী রূপও আবির্ভূত এবং সংযোজিত হয়েছিল। খ্রিস্টধর্মের প্রভাবে সারা দেশের গীর্জাগুলিতে ব্যবহারের জন্য বাংলা ভাষায় ধর্মীয় স্তবক রচনা করা হয়।

স্যার মেটকাফ স্বনির্ভর বাংলার গ্রাম্যসমাজকে 'ছোট ছোট গণরাষ্ট্র' বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর অভিমত- 'তাদের যা প্রয়োজন সবই তারা নিজেরাই সরবরাহ করে, বাইরের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে হয় না। তারা সম্পূর্ণ স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তা বিশিষ্ট। রাজ্য ভাঙে গড়ে, বিপ্লবের পর বিপ্লব আসে, হিন্দু, পাঠান, মোগল, ইংরেজ সকলের প্রস্তুত্ব একে একে প্রতিষ্ঠিত হয়, চারিদিকেই পরিবর্তনের স্রোত বয়ে যায়, কিন্তু গ্রাম্য সমাজের কোন পরিবর্তনই হয় না।' কার্ল মার্কস্ এশিয়ার সমাজের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সাধারণভাবে যে মন্তব্য করেছেন, বাংলার গ্রাম্যসমাজ সম্বন্ধে ও তা সম্পূর্ণ খাটে। তিনি লিখেছেন- 'ভেঙ্গে গেলেও এই গ্রাম্যসমাজ আবার ঠিক একই জায়গায় একই বৈশিষ্ট্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে।

ইংরেজ প্রভুত্ব সম্বন্ধে বিনয় ঘোষ বলেছেন, ভারতীয় সভ্যতার তুলনায় ইউরোপীয় সভ্যতার মান উন্নত ছিল বলে এযুগে বাঙালীৰ আর্থনীতিক ও সামাজিক জীবনে পরিবর্তন এসেছিল। কিন্তু এটি আংশিক সত্য, সমগ্র বাংলার গ্রাসজীবন ও সমাজের ক্ষেত্রে সত্য নয়। কারণ ইংরেজের অপরিমিত শোষণনীতির ফলে গ্রামশিল্পের এবং কৃষিজীবনের মারাত্মক ক্ষতি হয়েছিল। রাজধানী ও কতিপয় শিল্পকেন্দ্র ছাড়া দেশের সর্বত্র শোচনীয় দুরবস্থা অব্যাহত ছিল। ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাব কৃষক সমাজের প্রতিনিধি হাশেম শেখ ও রানা কৈবর্তের যে নগ্ন চিত্র তুলে ধরেছেন, তার একশো বছব পরেও তাদের বংশধরের যে বেশী পরিবর্তন হয়নি তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। হাঁটু অবধি কাদামাটিতে হীনবল দুটি গরু নিয়ে হিন্দু নমঃশূদ্র ও মুসলমান কৃষক আজও লাঙল ঠেলে শস্য ফলায়, কিন্তু দুবেলা পেট ভরে খেতে পায় না। গ্রাম্যচাধীর কৃষিপদ্ধতিতেও বড় রকমের পরিবর্তন সাধিত হয়নি। অধুনা সার, সেচের ব্যবস্থা হয়েছে বটে, কিন্তু তার সুযোগ দেশের ক'জনে পায়। অধিকাংশ স্কুলে আগের

নিয়মেই চাষাবাদ চলে আসছে। বাংলার কুটীরশিল্প বা হস্তশিল্প ছিল নিজস্ব প্রয়োজনের জন্য। কুটীর শিল্পী বলতে যাদের বুঝায় অর্থাৎ তাঁতী, জোলা, কামার, কুমার, ছুতার, চাঁমার, সেকরা প্রভৃতি সকলেই সরাসরি কুষকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। চাষী ক্ষেতের তুলা দিয়ে জোলার কাছ থেকে বস্ত্র নিয়েছে, ফসলের বিনিময়ে কামারের কাছ থেকে চাষের যন্ত্রপাতি, কুমারের কাছে হাঁড়িপাতিল, ছুতারের কাছে গাড়ি-পাস্কি, সেকরার কাছে গহনাপত্র নিয়েছে। এক কথায়, তারা পরস্পর পরস্পরের উৎপাদন বিনিময়ে জীবন নির্বাহ করত। এর ফলে গ্রামজীবনের সীমানা প্রায় নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল, যার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং আত্মকেন্দ্রিকতা।

অন্যান্য পেশাজীবীর মধ্যে আছে মাঝিমাল্লা, জেলে, জোলা, কামার, কুমার, সুতার, সেকরা, কাঁসারী, চুনারী, তেলী, মালী, গোয়ালা, ময়রা, কাহার, কাঠুরে, ঘরামী, পটুয়া, বারুই, বেদে, দজি, কবিরাজ, কসাই, ধোপা, নাপিত, ডোম, চামার ইত্যাদি। এরা নিজ নিজ ভূমিকা পালন করে সমস্ত সমাজদেহকে সজীব ও সচল করে রেখেছে। এদের সকলের জীবনের মান, রুচি, ভাব-ভাবনা, আচার-আচরণ এক নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে বেশ পার্থক্য আছে। বিশেষতঃ সাংস্কৃতিক জীবনে পার্থক্য রেখাটি বেশ স্পষ্ট। সকলের সামাজিক মর্যাদা সমান নয়। বৈবাহিক সম্পর্কে তার। বিচ্ছিন্ন। কৃষক-মজুর ক্ষেতে কাজ করতে করতে যে সারি গায়, তার সুরু ও ভাব এবং মাঝিমাল্লা দাঁড টানার সময় যে সারি গায়, তার সুর ও ভাক এক নয়। অথচ উভয়ই কর্মসংগীত। গাড়োয়ানের ভাওয়াইয়ার সুর ও ভাব এবং দৌকা-মাঝির ভাটিয়ালীর সুর ও ভাব এক নয়। গাড়োয়ান তাটিয়ালী গায় না, মাঝি ভাওয়াইয়া গায় না। বৈষ্ণব বৈবাগীর ভজনগান, মুসলমান ফকিরের মারফতী গান, বাউলের মরমীগান এক শ্রেণীর নয়। অথচ তার। সবাই ভিক্ষোপজীবী। জেলের যন্ত্রপাতি-সাজসরঞ্জাম ও জোলার যন্ত্রপাতি-সাজসরঞ্জাম এক নয়। তাদের তুলনায় কৃষকের ব্যবহারিক যন্ত্র- পাতি ও সাজসরঞ্জাম আবার সম্পূর্ণ ভিন্ন। তেলীর সমস্যা ও মালীর সমস্যা এক নয়। সুতরাং জীবিকার এক এক ধারা অনুযায়ী সংস্কৃতির ভিন্ন ভিন্ন উপাদান। অবশ্য গ্রামবাংলায় সামাজিক জীবনে এ বিভেদ থাকলেও কোথাও বিরোধ নেই। ব্যবহারিক জীবনে তারা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে জড়িত, স্বার্থসংশ্লিষ্ট। একের আনন্দ সমাজের আনন্দ, একের অভাব সমাজের অভাব। সমন্বয়ের ধর্ম বাংলার লোকজীবন ও লোক-সংস্কৃতির ধর্ম। দেশের জীবন, জীবিকা ও জলবায়ুতে এ সমন্বয় ও স্বচ্ছন্দতার গুণ আছে। ব্রিটিশ শাসনে গ্রাম জীবনে যে ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছিল তার প্রভাব পড়েছিল লোক- সংস্কৃতির জীবনে। পূর্বোক্ত গ্রাম- সমাজ ও তার চিরাচরিত কাঠামোটি ভেঙ্গে পড়তে শুরু করেছিল। একাধারে নদী- অরণ্য ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর ঔপনিবেশিক আধিপত্য স্থাপিত হয়, আবার কৃষি সংকটের পরিস্থিতিতে ও নগরায়নের ফলে অনেকে শহরে কর্মসূত্রে চলে আসতে থাকেন। এর ফলে গ্রামীণ সমাজ কাঠামো ও লোক- সংস্কৃতির ধারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

উপরের আলোচনা থেকে এটাই দাঁড়ায় যে, আমাদের সমাজ- সংস্কৃতির নিরূপক ও নিয়ামক যে সব দিক আছে তার কতকগুলিতে কিছু হেরফের হয়েছে, আবার কতকগুলিতে বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। বিশেষ করে, গ্রামবাংলাব আর্থনৈতিক ভিত্তিটি প্রায় অভিন্ন। উৎপাদন উপকরণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং উৎপাদন সম্পর্ক- এই ত্রিবিধ বিষয় একটি জাতির সমাজ-সংস্কৃতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। আমাদের কৃষি ভিত্তিক উৎপাদনে, উৎপাদন প্রক্রিয়ায়

এবং উৎপাদন সম্পর্কে তেমন পার্থক্য সৃষ্টি হয়নি বলে কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তনও দেখা যায়নি। শ্রমবিমুখতা, দৈবনির্ভরতা, ভোগবাদ ইত্যাদি কারণে ধর্ম, কর্ম, চিন্তা ও শিক্ষার ক্ষেত্রেও অধিক পরিবর্তন সাধিত হয়নি। দেশের ভূমি, সম্পদ, প্রকৃতি, আবহাওয়ার সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করে বাংলার সংস্কৃতি একটা স্থিতিস্থাপক গুণ অর্জন করেছে এবং স্বাভাবিক ধারার সৃষ্টি করেছে।

উত্তর ঔপনিবেশিক যুগে লোক- সংস্কৃতিঃ

ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি প্রবহমান নদীর মতো। জাতি, কাল, ভাষা, ধর্মভেদে ঐতিহ্য সংস্কৃতি ভিন্ন হয়ে থাকে। বাংলার লোকজ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি মূলত গ্রামীণ মানুষের আচার-আচরণ, বিশ্বাস, মনন-রুচি, ধ্যান-ধারণার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। বাংলার লোকজ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বৈচিত্র্যমণ্ডিত ও বর্ধমান। লোকসংস্কৃতির মাধ্যমেই অতীতকালের মানুষের সুখ-দুঃখ, চিন্তাধারা, নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, জাতিগত উপাদান প্রকাশ পায়। কিন্তু কালের পরিক্রমায় আমরা আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। আধুনিকতার ছোঁয়া আমাদের সমাজ ও পরিবেশকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। নগরায়ন, প্রযুক্তিনির্ভরতায় হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের হাজার বছরের গড়ে ওঠা লোকজ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। নগরায়নের ফলে গ্রামীণ মানুষ নগরকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছে। ফলে খুব সহজেই তারা নগর সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। ইংরেজ শাসনের মধ্য দিয়ে বাংলার মানুষ আধুনিকতার ছোঁয়া পেতে শুরু করলেও মানুষ লোকজ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি চর্চা করত। কিন্তু বিশ্বায়নের ফলে যে আধুনিক সমাজ তৈরি হচ্ছে তার সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে লোকজ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

১৯৪৭ সালে বৃটিশদের কাছ থেকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পর থেকে, বাংলাদেশী লোককাহিনী সংস্কৃতিতে একটি চলমান বিবর্তন শুরু হয়। যদিও প্রাক-ঔপনিবেশিক দিন থেকে অনেক কিছুই অপরিবর্তিত থাকে এবং শক্তিশালী মৌখিক ঐতিহ্যের কারণে লোকসংস্কৃতির অনেক কিছুই আজও চর্চা করা হচ্ছে। ঐতিহ্যবাহী উৎসব, যেমন পহেলা বৈশাখ, পৌষ সংক্রান্তির মেলা, নবান্নের উৎসব, বসন্ত উৎসব এখনও প্রতিবছর উদযাপিত হয়। এখনো লোকগীতি গ্রামীণ ও শহুরে উভয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে সমানভাবে জনপ্রিয়, যদিও বিশ্বায়ন, তথ্য-প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্মেষ আর সোশ্যাল মিডিয়ার দৌরাত্মের কারনে লোককাহিনী ভিত্তিক গল্প শোনা বা লোকগীতে আগ্রহী মানুষেরা সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে।

সময় যত গড়িয়েছে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে লোকজ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির উপাদানগুলোও হারাচ্ছে। সেখানে জায়গা করে নিচ্ছে আধুনিক সব সাজসজ্জা ও জীবনযাত্রা। আমরা অতীতের সঙ্গে বর্তমানকে তুলনা করলেই বুঝতে পারি এর ব্যাপকতা। এককালে বাংলা ছিল লোকজ সাহিত্যে পরিপূর্ণ। বাংলায় ধাঁধা, মন্ত্র, প্রবাদ-প্রবচন, লোকগাথা, লোকসংগীত, লোককাহিনির প্রচলন ছিল। আর এসব তৈরি হতো গ্রামীণ মানুষের সুখ-দুঃখ, ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাসের ওপর। প্রযুক্তির ব্যবহার লোকজ সাহিত্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করছে। গ্রামীণ অঞ্চলে লোকসংগীতের প্রচলন ছিল। যা অঞ্চলভেদে ভিন্নতা দেখা গেলেও এগুলোতে মিশে আছে বাংলার প্রকৃতি, মানবপ্রেম, সরলতা, সুখ-দুঃখের

কথা। জারি, সারি, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, মুর্শিদী, মারফতি, বাউল, গম্ভীরা, কীর্তন, ধামালি প্রভৃতি গান। এখন এসব গানের জায়গায় স্থান করে নিচ্ছে আধুনিক রক, হিন্দি, ইংরেজি গান।

লোকজ খেলাধুলা বৈচিত্র্যময়। লাঠিখেলা, বউচি, টোপাভাতি, কানামাছি, কাবাডি, কুতকুত, গোল-াছুট, ষাঁড়ের লড়াই, নৌকাবাইচ, পুতুলখেলা, মার্বেল খেলা প্রভৃতি। এসব জায়গায় স্থান পেয়েছে ক্রিকেট, ফুটবল, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন। উন্নত প্রযুক্তির ফলে শিশু-কিশোররা নানা রকম মোবাইল গেমে (পাবজি, ফ্রি-ফায়ার) আসক্ত হয়ে পড়ছে। আধুনিকতায় সাজ পোশাকে এসেছে আমূল পরিবর্তন। গ্রামীণ মেয়েদের প্রধান পোশাক ছিল শাড়ি আর পুরুষরা লুঙ্গি, ধুতি পরত। আর এই শাড়ি, লুঙ্গিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল তাঁতশিল্প। বর্তমানে ছেলেমেয়েরা ওয়েস্টার্ন পোশাকে বেশি স্বাচ্ছন্দবোধ করে। শাড়ি-লুঙ্গির বদলে স্থান করে নিয়েছে টপস, জিন্স, গেঞ্জির মতো পোশাক।

গ্রামবাংলায় আবহমান কাল থেকেই নানা রকম আনন্দ অনুষ্ঠান ও উৎসব পালিত হয়। আর এই উৎসব বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরে। বাংলার গ্রামীণ জনগোষ্ঠী নানা আয়োজনের মাধ্যমে বরণ করে বাংলা মাসের প্রথম দিন। পহেলা বৈশাখ মানেই মেলা। মেলার ইতিহাস বেশ প্রাচীন। আর এই মেলাগুলোতে ছিল লোকজ সংস্কৃতির বিশাল সমাহার। মেলায় থাকত আকর্ষণীয় সব জিনিস আর খাবার। থাকত নানা খেলার আয়োজন। মাটির তৈজসপত্র, মুড়ি-মুড়কি, মণ্ডা-মিঠাই, টেপাপুতুল ছিল মেলার প্রধান আকর্ষণ। কুমারদের হাতে বানানো শখের হাঁড়ি মেলার সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে তোলে। বর্তমানেও মেলার আয়োজন করা হয় এবং হাজির করা হয় লোকজ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। কিন্তু আগের গ্রামীণ মেলার মতো জৌলুস নেই। কিছুটা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মতো। লোকসংস্কৃতির অনেক উপাদানই বিলুপ্তপ্রায়। শখের হাঁড়ি, দারুশিল্প, নকশিকাঁথা, শীতলপাটির মতো আরো অনেক জিনিসের জায়গায় আধুনিক সব দ্রব্য।

তবে তথ্য-প্রযুক্তির বেশ কিছু সুবিধাজনক দিকও আছে আমাদের লোকসংস্কৃতির প্রচার এবং প্রসারের ক্ষেত্রে। আধুনিক প্রযুক্তির কারনে এই ঐতিহ্যগুলিকে আগের চেয়ে আরও ব্যাপকভাবে দর্শকদের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে, স্ট্রিমিং পরিষেবা সম্প্রচার এবং সোশ্যাল মিডিয়াকে সঠিকভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে লোক সংস্কৃতি সংরক্ষণকে বৃদ্ধি করা এখন খুব সহজ। সামাজিক মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলি মানুষকে তাদের নিজস্ব সৃষ্টিগুলিকে আশেপাশের সমমনা ব্যক্তিদের সাথে ভাগ করার সুযোগ করে দেয় অতি সহজে এবং যার ফলে সৃষ্টি হচ্ছে এক নতুন তথ্য নির্ভর সমাজব্যাবস্থা। লোককাহিনী সংস্কৃতি আজও বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বসবাসকারী অনেক লোকের পরিচয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা তাদের চারপাশে ঘটে চলা দ্রুত আধুনিকায়নের মধ্যে স্থিতিশীলতার অনুভূতি প্রদান করে। যদিও এটি বছরের পর বছর ধরে বিবর্তিত হয়ে আসছে, তদুপরি এর মূল বার্তাটি এখনো অনেকটাই অক্ষত রয়েছে অনেক ক্ষেত্রে এবং এই একবিংশ শতাব্দীর নিরন্তর পরিবর্তিত বিশ্বের

সাথে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে। বর্তমান ধারা চলতে থাকলে, এটি নিশ্চিত যে শতো বাধা বিপত্তি থাকা সত্বেও আগামী আরও বহু শতাব্দীর জন্য বাংলাদেশের সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে থাকবে এই লোকসংস্কৃতি। লোককাহিনী বাংলাদেশীদের জীবনে অনেকভাবে প্রভাব ফেলেছে। আমাদের প্রাত্যাহিক জীবনের সাথে বাংলার বাতাসের মতোই আষ্টে-পিষ্ঠে লেপ্টে আছে। আমাদের ভাবনায় এবং চেতনায়। আমাদের আত্মপরিচয়ে। বাঙলীত্বের অবয়বে। লোকসংস্কৃতি শিক্ষার পাশাপাশি বিনোদনের একটি প্রধান উৎসও বটে। বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা, প্রতিকূলতার মুখে সাহস এবং নিজের পরিবারের প্রতি দায়িত্বের মতো মূল্যবোধগুলি শেখায়। এটি গল্পগাঁথায় এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সম্প্রদায়কে একত্রিত করতেও কাজ করে। লোকসংগীত সম্ভবত বাংলাদেশে পাওয়া লোকসাহিত্যের অন্যতম প্রধান রূপ। এতে "লোকগীতি" নামক ঐতিহ্যবাহী বাংলা গান রয়েছে যা প্রেম এবং ভালোবাসার গল্প বলে। দারিদ্র্য বা অবিচারের মতো বিষয়গুলিতে সামাজিক মন্তব্য প্রদান করে। অন্যান্য ধারার মধ্যে রয়েছে লোকনৃত্যের শৈলী যেমন বাউল (বাংলার সাথে যুক্ত ভক্তিমূলক সঙ্গীতের একটি রূপ), যাত্রা (একটি থিয়েটার-শৈলীর পারফরম্যান্স), বা কীর্তন (ধর্মীয় গান)।

লোকজ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি আমাদের পরিচয়, আমাদের অহংকার। এই ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি যেন হারিয়ে না যায়। লোকজ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ছাড়া বাঙালি শিকড়হীন পরগাছার মতো। নতুন প্রজন্মকে আমাদের লোকজ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। তাদের মাধ্যমেই যেন আমরা আমাদের লোকজ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি নতুন মাত্রা যোগ করে বিশ্বদরবারে আমাদের স্থায়ী অস্তিত্ব জানান দিতে পারি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

https://prdatta.com/blog_details&id=110

https://www.ittefaq.com.bd/279905/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A6%9C-%E0%A6%90%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%93-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A6%BF

Dr. Wakil Ahmed, Banglar Lok- Songoskriti

Md Abu Nasim, Disappearance of Traditional games by the imitation of Colonial Culture through the Historical parameters of Cultural Colonialism
Sarmistha De Basu, The colonial and post-colonial context of bengali folktale in the worldwide platform

সম্ভাব্য প্রশ্নাবলীঃ

১) Discuss the colonial impact on folk tradition.

২) What is the present situation of Bengal-folk in the post colonial era?